https://web.facebook.com/groups/blbookd/

মাসুদ রানা

(তিনখণ্ড একত্রে)

কালকূট

কাজী আনোয়ার হোসেন

আতঙ্কিত টুরিস্টিরা মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, এক একজনের মাংস খুঁটে খাবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বিশ-পঁচিশ বা তারও বেশি ঘৃণ্য পিশাচ।

সুমার টিম নিয়ে মাসুদ রানা এবার হিংস্র একদল নরখাদকের পাল্লায় পড়েছে। ড-এর প্লেন হাইজ্যাক করা হলো; সোনার খনিতে ক্রীতদাসদের সঙ্গে কাজ করতে পাঠানো হলো বিজ্ঞানী আর গবেষকদের; ধনকুবের সাওয়র পামাকলোর হাউজবোট থেকে পালাল রানা, সঙ্গে মুরল্যান্ড। প্রাচীন একটা নদীর শুকনো তলা ধরে অবশেষে পাসফিনের সোলার ডিটোক্সিফিকেশন প্রজেক্টে পৌঁছুল ওরা, এবং ধরা পড়ে গেল। মালির স্বেচ্ছাচারী শাসক জেনারেল পিয়েত্রো ভিনসেন্ট দুর্গ আক্রমণ করলেন। মাসুদ রানাকে নিয়ে ইউএন টিমের সদস্য সংখ্যা তিনজনও নয়। অসুস্থ ও নিরস্ত্র একদল মহিলা ও শিশুকে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে ওরা। পরাজয় যখন অবধারিত হয়ে উঠল, আত্মসমর্পণের জন্য তৈরি হলো রানা; যদিও শেষ পর্যন্ত রানা বাঁচল, বাঁচল সিলভিয়াও। কিন্তু কীভাবে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
KALKOOT
Part I, II & III
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৪৯/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৪২/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৪৪/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪১/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৩৭/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৩১/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৩২/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৩৩/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	২৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৩৫/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৩৪/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	২৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৩৫/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	২৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৪১/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৪৮/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৪৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২.(একত্রে)	৩৮/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	৬৩/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৪২/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৪১/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)'	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-

কালকূট-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

এক

অ্যাসেলার মরুভূমি, মালি, আফ্রিকা। ৫ মে, ১৯৯৫।

মরুভূমি, তা সে যতই বিশাল হোক, দিনের পর দিন মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এলে কোন প্রাণী চোখে পড়বে না, দেখা হবে না কোন মানুষের সঙ্গে, এমন কি সভ্যতার কোন নমুনা পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না, এ প্রায় একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারই বলতে হবে। অথচ গত ছ'দিন ঠিক তাই ঘটছে।

পাঁচটা ল্যাণ্ড রোভারে এগারোজন ট্যুরিস্ট, ড্রাইভার আর গাইড মিলিয়ে আরও পাঁচজন। গরমে রীতিমত সেদ্ধ হচ্ছেন সবাই, লু হাওয়ার বালি গায়ে দ্বিতীয় চামড়ার মত সেঁটে আছে, গোসল করার বা পরিষ্কার হবার কোন উপায় নেই। তার ওপর মানুষজন বা অন্য কোন প্রাণীর অনুপস্থিতি নার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ছ'দিন পেরিয়ে আজ সাত দিন এই অবস্থা চলছে, ফলে ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন ওঁরা।

ভ্রমণের নাম দেয়া হয়েছিল 'অ্যাডভেঞ্চারাস ট্যুর: সাহারা সাফারি'। সাত দিনের দিন সবার মনেই একটা ভয় জাগছে থেকে থেকে, অ্যাডভেঞ্চারে এসে অজানা কোন বিপদে পড়ে পৈত্রিক প্রাণটা না হারাতে হয়! ঠিক এরকম অবস্থায় একটা গ্রাম চোখে পড়লে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এমন হৈ-চৈ শুরু করলেন ওঁরা যেন নতুন একটা গ্রহ আবিষ্কার করেছেন। এক নিমেষে সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল। অকস্মাৎ স্বস্তি বোধ করায় বেসুরো গলায় হাসছেন ওঁরা। ভাবছেন কতদিন পর গোসল করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

সেন্ট্রাল সাহারায় রয়েছেন ওঁরা, দেশটার নাম মালি। এদিকের মরুভূমি প্রাচীন অ্যাসেলার শহরের নামে পরিচিত। গোটা মরুভূমি প্রায় জনম্যানবশূন্যই বলা যায়। দূর থেকে দেখা গেল এক জায়গায় গায়ে গায়ে ঠেকে আছে কয়েকটা মাটির কুঁড়েঘর, মাঝখানে একটা কুয়া– কুয়াটা শুকনো একটা নদীর তলায়। সন্দেহ নেই, নদীটার অস্তিত্ব ছিল অতি প্রাচীন কালে। দাঁড়িয়ে আছে অল্প কয়েকটা ঘর, যদিও আশপাশে অনেক ঘর-বাড়িব ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছে– একশো বা তারও বেশি হবে। ওগুলোর সামনে নিচু একটা পাড় দেখা যাচ্ছে, ওখান থেকে মরুভূমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের সমতল ভূমিতে। দূর থেকে গ্রামটা কোন রকমে ঝাপসা দেখা গেল, রঙবিহীন অনুর্বর প্রকৃতির সঙ্গে ঘরগুলো এমনভাবেই এক হয়ে মিশে আছে।

'শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল!' হাত লম্বা করে দেখালেন সাফারি লীডার মেজর সিডনি কামার। ল্যাণ্ড রোভার থেকে নেমে তাঁর চারপাশে জড়ো হলো ট্যুরিস্টরা। 'দেখে ভাবা যায়, এই অ্যাসেলারই এক সময় পশ্চিম আফ্রিকান বিভিন্ন কালচারের সেতুবন্ধ ছিল? পাঁচশো বছর ধরে পানির গুরুত্বপূর্ণ একটা উৎস ছিল

অ্যাসেলার, এই পথ দিয়েই বাণিজ্য বহর আর পেভ ক্যারাভান উত্তর আর পুব আফ্রিকায় আসা-যাওয়া করত।'

'তাহলে কি কারণে আজ এই দুরবস্থা?' জানতে চাইলেন শান্ত চেহারার এক কানাডিয়ান মহিলা, সাদা সিল্ক টি-শার্ট আর জিনসের খুদে শর্টস পরে আছেন।

'অনেক কারণ। ফরাসী আর মুরদের হামলা, ক্রীতদাস ব্যবসা বন্ধ; তবে সবচেয়ে বড় কারণ ট্রেড রুট দক্ষিণ ও পশ্চিমের সাগর এলাকায় সরে গেছে। শেষ আঘাতটা আসে প্রায় চল্লিশ বছর আগে, কুয়াগুলো শুকাতে শুরু করায়। এখন একটাই কুয়া গোটা শহরের চাহিদা মেটাচ্ছে, প্রায় পঞ্চাশ মিটার গভীর করা হয়েছে ওটা।'

'তারমানে আমরা কোন মেট্রোপলিটান প্যারাডাইস আবিষ্কার করিনি,' শক্ত-সমর্থ এক ভদ্রলোক বললেন, উচ্চারণে স্প্যানিশ টান স্পষ্ট।

জোর করে হাসলেন লম্বা, একহারা, রয়্যাল মেরিন-এর সাবেক অফিসার মেজর সিডনি কামার। একটা ফিল্টার সিগারেট ধরালেন তিনি। মুখস্থ বুলির মত বলে গেলেন, 'এখন শুধু অ্যাসেলারে কয়েকটা টুয়ারেগ পরিবার থাকে, যাযাবর স্বভাব ভুলে গিয়ে থিতু হয়েছে এখানে। দু'পাঁচটা ছাগল পালে, কুয়ার পানি তুলে বালি মেশানো মাটিতে সামান্য ফসল ফলায়, মরুভূমি থেকে কুড়িয়ে পাওয়া জেমস্টোন পালিস করে গাও শহরে নিয়ে যায় বেচার জন্যে।'

মাথায় হেলমেট, পরনে সাফারি সুট, ভদ্রলোক লণ্ডনের একজন ব্যারিস্টার। হাতের ছড়িটা গ্রামের দিকে তাক করে বললেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে পরিত্যক্ত। অথচ মনে পড়ছে আপনার ব্রোশিও-তে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে ডেজার্ট মিউজিকের রোমান্স উপভোগ করার সুযোগ হবে অ্যাসেলারে, ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে স্থানীয় লোকদের নাচ দেখা যাবে।'

'আমাদের অ্যাডভান্সড স্কাউট সব রকম আরাম-আয়েশের আয়োজন করে রেখেছে, আমি নিশ্চিত,' আশ্বাস দিলেন মেজর কামার। দৃষ্টি খানিক তুলে অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকালেন একবার। 'সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই, তাড়াতাড়ি গ্রামে পৌঁছুনো উচিত আমাদের।'

'ওখানে কি কোন হোটেল আছে?' কানাডিয়ান ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন।

আহত দেখাল মেজর কামারকে। 'না, মিসেস ভ্যালিকা। শহরের পিছনে, ভাঙাচোরা ঘরগুলোর মধ্যে ক্যাম্প ফেলব আমরা।'

সবাই হতাশ হলো, দু'একটা বিরূপ মন্তব্যও শোনা গেল। আশা ছিল নরম বিছানা, প্রাইভেট বাথরুম ইত্যাদি পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে অ্যাসেলারে এ-সব বিলাসিতার সুযোগ নেই।

আবার গাড়িতে উঠে বসলেন সবাই, নদীর ঢালু পাড় পেরিয়ে মূল রাস্তায় উঠে এল ল্যাণ্ড রোভার। রাস্তাটা গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। দূরত্ব যত কমল, অতীত গৌরব কল্পনা করা ততই কঠিন মনে হলো। পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে বিধ্বস্ত ও মৃত একটা নগরীর মত লাগছে। সূর্য ডুবে গেছে, তবু কোথাও কোন আলো জ্বলছে না বা কোন কুকুর ডাকছে না। মাটির ঘরগুলোয় প্রাণের কোন সাড়া নেই। যেন সহায়-সম্বল যা ছিল সব সহ গায়েব হয়ে

গেছে এখানকার মানুষজন।

অস্বস্তিবোধ করছেন কামার। নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে। তাঁর অ্যাডভান্সড স্কাউটেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। চারপেয়ে কোন প্রাণীকে একটা দোরগোড়ায় মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেলেন তিনি, পরক্ষণে ভাবলেন চোখের ভুল, সম্ভবত সচল ল্যাণ্ড রোভারের ছায়া পড়েছিল।

আজ রাতে তাঁর হাসিখুশি মক্কেলরা মুখ হাঁড়ি করে থাকবেন, ভাবলেন কামার। মনে মনে বিজ্ঞাপনদাতাদের চোদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করলেন তিনি, মরুভূমির লোভনীয় হাতছানি সম্পর্কে সরস ও মিথ্যে বর্ণনা দিয়ে মানুষকে বোকা বানায়। এখন তিনি বাজি ধরে বলতে পারেন যারা এই বিজ্ঞাপন দিয়েছিল তারা জীবনে কখনও মরুভূমি দেখেইনি।

ট্র্যান্স-সাহারা মোটর ট্র্যাক থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার, আর নাইজার নদীর তীরে গড়ে ওঠা গাও শহর থেকে দু'শো চল্লিশ কিলোমিটার দূরে রয়েছেন তাঁরা। ভ্রমণের বাকি দিনগুলোর জন্যে প্রয়োজনীয় খাবার, পানি ও ফুয়েল সঙ্গে আছে। কামার ভাবলেন, অপ্রত্যাশিত কোন কিছু দেখলে বা ঘটলে অ্যাসেলারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবেন তিনি, থামবেন না। ওয়ার্ল্ডওয়াইড এক্সপিডিশন-এর মক্কেলদের নিরাপত্তার প্রশ্নটাই প্রথমে বিবেচ্য। এই কোম্পানি চব্বিশ বছর ট্যুরিজম ব্যবসায় রয়েছে, আজ পর্যন্ত তেমন কোন দুর্ঘটনায় পড়েনি। একবার শুধু এক আমেরিকান ট্যুরিস্ট বোকার মত একটা উটকে বিরক্ত করায় লাথি খেয়েছিল মাথায়।

কামার ভাবলেন, কোন উট বা ছাগল দেখা যাচ্ছে না কেন! বালি ঢাকা পথে পায়ের কোন ছাপও তো নেই। কিন্তু ওগুলো কি? ছাপ, তবে পায়ের ছাপ নয়। দেখে মনে হবে থাবার - ছাপ। অদ্ভুত ব্যাপার। বালির ওপর থাবার চিহ্ন, সেই সঙ্গে সমান্তরাল একজোড়া দাগ– যেন দুটো গাছের লম্বা কাণ্ড টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আদিবাসীদের বাড়িগুলো, পাথরের তৈরি, ওপরে কাদার আবরণ, আগের চেয়ে ভাঙাচোরা ও বিবর্ণ দেখাল। শেষ সাফারিতে এসে, মাত্র দু'মাস আগের কথা, এখানে তিনি কি দেখে গিয়েছিলেন, আর এখন কি দেখছেন!

কোন কারণে গ্রামবাসীরা যদি এলাকা ছেড়ে চলে গিয়ে থাকে, তাঁর অ্যাডভান্স স্কাউটের উচিত ছিল খানিকটা এগিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করা। বহু বছর ধরে সাহারায় ঘোরাফেরা করেছেন দু'জন, ইবনে কাসেম কখনও কোন ব্যাপারে তাঁকে হতাশ করেনি। কামার সিদ্ধান্ত নিলেন গ্রামের কুয়ার কাছে ট্যুরিস্টদের কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার অনুমতি দেবেন তিনি, তারপর খানিক দূর এগিয়ে ক্যাম্প ফেলবেন। দুই সীটের মাঝখানের ফাঁক থেকে একটা সাবমেশিন গান তুলে দুই হাঁটুর মাঝখানে রাখলেন, ভাবছেন বিশ্রাম নেয়ার সময় চারদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। অস্ত্রের মাজলে সাইলেন্সার আঁটলেন।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস ভ্যালিকা। 'ভাবছেন বিপদ হতে পারে?'

থাকা অসতর্ক ট্যুরিস্টদের। হিংস্র প্রাণীর বিশাল স্রোতটা প্রথমেই ঢেকে ফেলল ড্রাইভারদের, তারা এমন কি চিৎকার করারও সুযোগ পায়নি। হাঁটু আর কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক শিয়ালের মত এল ওরা, নিরস্ত্র ট্যুরিস্টদের টেনে-হিঁচড়ে শুইয়ে ফেলল, দাঁত দিয়ে কামড় বসাল উন্মুক্ত চামড়ায়।

রোমহর্ষক দুঃস্বপ্নটা ল্যাণ্ড রোভারের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকল। আতঙ্কিত ট্যুরিস্টরা মৃত্যুযন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, এক একজনের মাংস লুঠ করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিশ-পঁচিশজন বা তারও বেশি ঘৃণ্য পিশাচ। তীক্ষ্মস্বরে চিৎকার করলেন মিসেস ভ্যালিকা, পরমুহূর্তে তাঁর উন্মুক্ত গলায় কামড় বসানো হলো, বিশ-পঁচিশজন নরখাদকের একটা দলের নিচে চাপা পড়ে গেলেন। তাঁর স্বামী একটা ল্যাণ্ড রোভারের হুডে চড়ে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করলেন, টেনে-হিঁচড়ে ধুলোয় নামানো হলো তাঁকে, কামড় দিয়ে জ্যান্ত খেয়ে ফেলছে।

ব্যারিস্টার ভদ্রলোক ছড়িটা খাপ মুক্ত করলেন, দেখা গেল ওটা আসলে একটা তলোয়ার। নিজের চারপাশে বন বন করে ঘোরালেন ওটা, অন্তত কিছুক্ষণ প্রতিপক্ষকে দূরে সরে থাকতে বাধ্য করলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেন ভয় কাকে বলে জানে না, এক সময় তাঁকেও ধরাশায়ী করা হলো।

এক স্প্যানিশ ভদ্রলোক বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে কুয়ার কিনারায় উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লাফ দিলেন নিচে। তার সারা শরীরে কামড়ের দাগ, একটা চোখ নেই। লাফ দিয়ে কুয়ার ভেতর পড়লেন তিনি, তাঁর পিছু নিয়ে চারজন প্রতিপক্ষও লাফ দিল।

ছুটে এলেন কামার, সামনের দিকে ঝুঁকে হামলাকারীদের ওপর গুলি করলেন, খেয়াল রাখছেন ট্যুরিস্টদের কারও গায়ে যেন বুলেট না লাগে। গুলির শব্দ হচ্ছে না, তবে সঙ্গীরা অপ্রত্যাশিতভাবে ঢলে পড়ছে মৃত্যুর কোলে, তবু সেদিকে কোন খেয়াল নেই শত্রুপক্ষের।

অল্প কিছুক্ষণ গুলি করে প্রায় ত্রিশজনকে মেরে ফেললেন কামার। সাবমেশিন গানের শেষ শেলটাও বেরিয়ে গেছে। অসহায় দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি, কিছুই তাঁর করার নেই। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল, তেমনি হঠাৎই খুন ও আহার পর্ব শেষ হলো। 'ওহ্ গড!' ধরা গলায় বিড়বিড় করলেন কামার, দেখলেন তাঁর ড্রাইভার আর মক্কেলদের হাড় থেকে এখনও মাংস ছাড়াবার চেষ্টা করছে ওরা।

শত্রুপক্ষ এতেও যেন সন্তুষ্ট হতে পারল না, এবার তারা গাড়িগুলোর ওপর হামলা চালাল। পাথর ছুঁড়ে জানালার কাঁচ ভাঙল, ভেতর থেকে ছিঁড়ে আনল সীট কাভার, স্টিয়ারিং হুইল ভাঙল, কিছুই বাদ দিচ্ছে না।

দেয়ালের আড়ালে রয়েছেন কামার, আরও কয়েক ইঞ্চি পিছিয়ে এলেন। অসুস্থ বোধ করছেন তিনি, এতগুলো লোকের মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী ভাবছেন। ওদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ছিল তাঁর দায়িত্ব, সেটা পালনে শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। ওদের সঙ্গে মারা যাননি বলে নিজেকে কাপুরুষ বলে গাল দিতেও ছাড়লেন না।

সরু রাস্তা ধরে ছুটতে শুরু করলেন কামার। মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়াই এখন বাঁচার একমাত্র পথ। কারও সঙ্গে দেখা হলে সাবধান করে দিতে হবে,

বিপদের কথাটা পৌঁছে দিতে হবে দূর-দূরান্তে।

প্রথম কথা, নিজেকে তাঁর বাঁচতে হবে। কাছাকাছি গ্রামটা দক্ষিণে, কিন্তু পানি ছাড়া সেখানে পৌঁছুনো সম্ভব নয়। কাজেই ওদিকে না গিয়ে পুব দিকে ছুটলেন তিনি। পুবে মোটর ট্র্যাক আছে, মনে আশা পানির তেষ্টা বা সূর্যের প্রবল অত্যাচারে মারা যাবার আগে সরকারী টহল বা প্রাইভেট কোন কার প্যাসেঞ্জারের চোখে পড়ে যাবেন।

দুই

নির্জন সৈকতের নরম বালি সিলভিয়ার পায়ের তলায় ডেবে যাচ্ছে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভূমধ্যসাগর দেখছে সে। গভীর জলের রঙ কোবাল্ট ব্লু, যেখানে অগভীর সেখানে পান্না সবুজ, আর ঢেউয়ের মাথায় ফেনাগুলো তুষার শুভ্র।

সাগর দেখার জন্যে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে রেন্টাল কার নিয়ে একশো দশ কিলোমিটার ছুটে এসেছে সিলভিয়া। সৈকতটা নির্জন দেখে গাড়ি থামিয়েছে, সঙ্গে ম্যাপ থাকায় জানে এল আলামিন শহরটা এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়। বিখ্যাত শহর আলামিন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ওখানে প্রচণ্ড একটা লড়াই হয়েছিল। কোস্টাল হাইওয়ের পাশে গাড়ি থামিয়ে শুধু টোট ব্যাগটা নিয়ে নেমে এসেছে সে, নিচু কয়েকটা বালিয়াড়ি পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ফাঁকা সৈকতে।

তার পরনে এক প্রস্থ কোরাল জার্সি বেদিং সুট, গায়ের সঙ্গে দ্বিতীয় চামড়ার মত সেঁটে আছে। বাহু আর কাঁধ ম্যাচিং টপে আবৃত। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা দারুণ, মেয়েলি সৌন্দর্য ও আভিজাত্য প্রকাশ পায়। শরীরে কোথাও ঢিলে-ঢালা ভাব বা অসামঞ্জস্য নেই, একহারা লম্বা সে, সরু হাত-পা রোদে পুড়ে তামাটে-সোনালি রঙ পেয়েছে। চুলের রঙ লালচে-সোনালি, ফিতের সঙ্গে বাঁধা, কোমর পর্যন্ত লম্বা, রোদ লাগায় পালিশ করা তামার মত চকচক করছে। চোখ জোড়া নীল, মুখে কোন দাগ নেই, চেকবোন সামান্য উঁচ। বয়েস যাই হোক, কেউ তাকে পঁচিশের বেশি বলবে না। ভোগ ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে সিলভিয়া কোন দিন হয়তো ঠাঁই পাবে না, তবে পুরুষ যেধরনের মেয়েদের দেখে আকৃষ্ট বোধ করে, তাদের দলেই পড়ে সে।

সৈকতটা পুরোপুরি খালি মনে হলো। সিলভিয়া দাঁড়িয়ে আছে যেন ক্যামেরার সামনে পোজ দেয়ার ভঙ্গিতে, সাগর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিজের দু'পাশের সৈকতে যতদূর দেখা যায় দৃষ্টি বুলাল, চোখে হরিণীর সতর্কতা। মানুষজন সত্যি দেখা যাচ্ছে না, তবে একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। সবুজাভ-নীল রঙ ওটার, দরজার গায়ে লেখা নুমা, প্রায় একশো মিটার দূরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিজের গাড়ি থামানোর সময় ওটাকে দেখেছে সিলভিয়া, তবে ভেতরে কোন লোকজন দেখেনি।

সকালের রোদ এরইমধ্যে তাতিয়ে তুলেছে বালি; নগ্ন পায়ে গরম লাগল। লম্বা পা ফেলে পানির দিকে এগোল সে। পানির ঠিক কিনারায় থামল, একটা তোয়ালে বিছিয়ে বসে পড়ল ওখানেই। হাতঘড়িটা টোট ব্যাগে ভরার আগে সময় দেখে রাখল। দশটা বেজে দশ। উন্মুক্ত চামড়ায় সান স্ক্রীন লোশন লাগিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, চোখ বুজে রোদের তাপ উপভোগ করছে।

সান ফ্রান্সিসকো থেকে কায়রো, লম্বা জার্নি; ধকলটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি সিলভিয়া। কায়রোয় পৌঁছুনোর পরপরই বিরতিহীন চারঘণ্টা ইমার্জেন্সী মীটিং করতে হয়েছে একদল ফিজিশিয়ান ও বায়োলজিস্টের সঙ্গে। গোটা দক্ষিণ সাহারা মরুভূমি জুড়ে আশ্চর্য একটা নার্ভাস ডিজঅর্ডার দেখা দিয়েছে, সেটাই ছিল আলোচনার বিষয়। বিশাল মরুভূমি পেরিয়ে রিসার্চ মিশনে যেতে হবে তাকে, তার আগে যতটুকু পারা যায় বিশ্রাম নিয়ে ক্লান্তি দূর করার জন্যে এখানে চলে এসেছে সে। ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুম পাচ্ছে তার।

ঘুম ভাঙার পর আবার ঘড়ি দেখল সিলভিয়া। বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। উপুড় হয়ে শুলো, চোখ বুলাল সৈকতে। পানির কিনারা ধরে তার দিকেই এগিয়ে আসছে দু'জন লোক, পরনে হাফ-হাতা শার্ট আর খাকি শর্টস। আস্তে-ধীরে হাঁটছিল তারা, যে-ই দেখল তাদেরকে সে দেখছে, অমনি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর এমন অলস ভঙ্গিতে ঘুরল, যেন সচল কোন জাহাজকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে। লোকগুলো সিলভিয়ার কাছ থেকে প্রায় দু'শো মিটার দূরে রয়েছে। এরপর সে আর তাদের দিকে তাকায়নি।

হঠাৎ তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে কি যেন একটা তার চোখে পড়ল। কালো চুলে ঢাকা একটা মাথা পানির নিচে থেকে উঁচু হলো, ভাল করে দেখার জন্যে কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকাল সিলভিয়া। ডাইভ মাস্ক পরা এক লোক, ব্রেকারের ওপারের গভীর পানিতে একা একটা স্নরকেল নিয়ে সাঁতার কাটছে। মনে হলো যেন বর্শা দিয়ে মাছ ধরছে। সিলভিয়ার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল আবার, পানির নিচে এতক্ষণ থাকছে যে তার ভয় হলো লোকটা ডুবেই গেল কিনা। অবশ্য একটু পরই মাথাচাড়া দিল পানির ওপর, আপনমনে নিজের কাজ করে যাচ্ছে। বেশ কয়েক মিনিট পর তীরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল তাকে, দক্ষতার সঙ্গে একটা ঢেউয়ের গায়ে সওয়ার হলো, অগভীর পানিতে পৌঁছে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

লোকটার হাতে অদ্ভুতদর্শন একটা স্পিয়ার গান দেখল সিলভিয়া। কাঁটা লাগানো লম্বা একটা শ্যাফট, শেষ দুই প্রান্তে সার্জিক্যাল রাবার মোড়া। তার অপর হাতে কয়েকটা মাছ, কোনটারই ওজন তিন পাউণ্ডের বেশি হবে না। বেল্ট থেকে ঝুলছে স্টেনলেস স্টীলের একটা হুপ, প্রতিটি মাছের ফুলকার ভেতর ঢুকে আছে সেটা।

গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে হলেও, চেহারা দেখে লোকটাকে আরব বলে মনে হলো না। লোনা পানি লেগে খুলির সঙ্গে সেঁটে আছে কালো চুল। রোদ লাগায় চকচক করছে বুকের ঘন লোম। পেশীগুলো স্পষ্ট, চওড়া কাঁধ, কোথাও এতটুকু মেদ নেই, আর খুব লম্বাও। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কাড়ল হাঁটার ভঙ্গিটা—

প্রতিটি পদক্ষেপ দৃঢ় ও মাপা, অথচ আশ্চর্য একটা অলস ছন্দ আছে যা সাধারণত কোন পুরুষের মধ্যে দেখা যায় না।

পাশ কাটানোর সময় নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সিলভিয়ার দিকে একবার তাকাল সে। এত কাছ থেকে বলেই চোখ দুটো পরিষ্কার দেখতে পেল সিলভিয়া। ধক করে উঠল তার বুক, হার্টবিট বেড়ে গেল। কোন পুরুষের চোখে এত মায়া, তাকানোর মধ্যে এমন গভীরতা থাকতে পারে! চোখের মণি অন্ধকার রাতের মত গাঢ়, আর বাকি অংশ দুধ সাদা। ওই একবারই তাকাল, আর তাতেই যেন সিলভিয়ার অন্তরের গভীর পর্যন্ত নাগাল পেয়ে গেল, সেই সঙ্গে সম্মোহিত করে ফেলল তাকে। তার মনের একটা অংশ ভয় পেল লোকটা দাঁড়িয়ে কিছু হয়তো বলবে, আরেক অংশ ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছে কিছু বলুক তাকে। কিন্তু না, লোকটা শুধু হাসল। এমন আকর্ষণীয় হাসি, এমন জাদু জীবনে কখনও দেখেনি সিলভিয়া; তার সারা শরীরে অনাস্বাদিত এক শিহরণের ঢেউ খেলে গেল। হাসার সময় ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল লোকটা, স্রেফ ভদ্রতা বশত, তারপর তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল হাইওয়ের দিকে।

যতক্ষণ দেখা গেল তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া। বালিয়াড়ির আড়ালে হারিয়ে গেল সে, অমনি মূল্যবান কি যেন একটা হারাবার ব্যথা অনুভব করল মেয়েটা। সে লক্ষ করেছে, নুমা লেখা জীপটার দিকে গেল লোকটা। তারপর সিলভিয়া ভাবল, কি হয়েছে আমার? আর কিছু না হোক, পাল্টা একটু হেসে ভদ্রতা দেখানো উচিত ছিল না কি? অবশ্য একটু পরই ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করল সে, ভাবল চেষ্টা করলেও হয়তো কথা বলা যেত না, কারণ লোকটা সম্ভবত ইংরেজি জানে না। খানিকটা অস্বস্তি বোধ করল সিলভিয়া, উপলব্ধি করল চেষ্টা করলেও লোকটার মায়া ভরা চোখ দুটোর কথা সে ভুলতে পারছে না, ভুলতে পারছে না হাসির ঔজ্জ্বল্যটুকু। কে ও, প্রশ্ন জাগল মনে। একবার মাত্র তাকিয়ে একটু হেসেছে, তাতেই তার ভেতর এমন আলোড়ন উঠছে কেন?

সিলভিয়ার ইচ্ছে হলো পানিতে নেমে মাথাটা ঠাণ্ডা করে। কিন্তু আগের সেই লোক দু'জন তার আর অস্থির ফেনার মাঝখানের সৈকত লক্ষ্য করে হেঁটে আসছে দেখে সিদ্ধান্ত নিল, আগে ওরা চলে যাক। লোক দু'জনকে তার মিশরীয় বলে মনে হলো না, অত সুন্দর নয় মুখের গড়ন। নাক প্রায় চ্যাপ্টাই বলা যায়, গায়ের রঙও প্রায় কালো, খুলি কামড়ে ধরা কোঁকড়া চুল। সাধারণত দক্ষিণ সাহারায় এই চেহারার লোকজন দেখতে পাওয়া যায়।

দাঁড়াল তারা, ঘন ঘন সৈকতের এদিক ওদিক তাকাল; একটু যেন নার্ভাস। তারপর, হঠাৎ করে সিলভিয়ার একেবারে গায়ের কাছে চলে এল।

'কি চাও! সরো!' ভয় পেয়ে চিৎকার দিল সিলভিয়া। ইতিমধ্যে ওরা তাকে ধরে ফেলেছে। ধস্তাধস্তি শুরু করল সে। প্রথম লোকটা, ঠোঁটের নিচে সরু গোঁফ, নোংরা দাঁত বের করে হাসছে, সিলভিয়ার চুল ধরে টানতে শুরু করল, একটা হাত মুচড়ে পিঠের ওপর ঠেকাল। দ্বিতীয় লোকটা, চোখ দুটো কিসের যেন নেশায় চকচক করছে, হাঁটু গেড়ে সিলভিয়ার উরুর ওপর বসল। আতঙ্কে নীল হয়ে গেল

সিলভিয়া। ইঁদুর-মুখো প্রথম লোকটা বসল বুকের ওপর, দু'হাত দিয়ে বালির ওপর তার কব্জি চেপে ধরেছে। অসহায় হয়ে পড়ল সিলভিয়া, যেন একজোড়া পেরেক তাকে বালির সঙ্গে গেঁথে রেখেছে।

অদ্ভুত ব্যাপার, লোক দুটোর চোখে লালসার কোন ছাপ নেই। দু'জনের কেউই সিলভিয়ার সুইমস্যুট খোলার বা ছেঁড়ার কোন চেষ্টা করছে না। তাদের আচরণ দেখে মনে হলো না যে রেপ করতে চায়। আবার চিৎকার দিল সিলভিয়া। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দে চাপা পড়ে গেল আওয়াজটা। সৈকতে কেউ নেইও যে দেখতে পাবে কি ঘটছে এখানে।

তারপর ইঁদুর-মুখো লোকটা হাত দিয়ে সিলভিয়ার নাক আর মুখ চেপে ধরল। বুকের খাঁচার ওপর তার শরীরের চাপ পড়ায় ফুসফুস এমনিতেই খালি হয়ে গিয়েছিল, এখন সিলভিয়া শ্বাস টানতেও পারছে না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সে উপলব্ধি করল, তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। আবার চিৎকার করতে চাইল সে, ভোঁতা গোঙানির মত আওয়াজ বেরুল শুধু। তীব্র আতঙ্কে সব ব্যথা দূর হয়ে গেল, নার্ভগুলো অনুভূতি হারিয়ে অসাড় হয়ে যাচ্ছে।

সিলভিয়ার জগৎ অন্ধকার হয়ে আসছে। প্রাণপণ চেষ্টায় সচেতন থাকতে চাইছে সে, জানে জ্ঞান হারালে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মারা যাবে। চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল তার, দেখল উরুর ওপর বসা লোকটা তার সঙ্গীর কাঁধের ওপর দিয়ে দূরে একবার তাকাল। পরমুহূর্তে নেতিয়ে পড়ল সিলভিয়া, অবশ হয়ে আসছে শরীর, ধস্তাধস্তি করার শক্তি নেই। চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল, তবে এখনও সচেতন রয়েছে, ভাবছে বাস্তবে এ-সব কিছু ঘটছে না, সে আসলে একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর রয়েছে। এখন যদি একবার চোখ মেলে, দেখতে পাবে ঘুম ভেঙেছে তার, জেগে উঠেছে দুঃস্বপ্ন থেকে। বাস্তব জগৎটা শেষ একবার দেখার জন্যে বহু কষ্টে চোখ মেলল সিলভিয়া।

ব্যাপারটা সত্যিই তাহলে দুঃস্বপ্ন ছিল, প্রায় উল্লাস অনুভব করল সে। দ্বিতীয় লোকটার চোখ দুটো এখন আর খুনের নেশায় চকচক করছে না। সরু একটা মেটাল শ্যাফট দেখা যাচ্ছে তার কপালের দুই পাশে, একদিক থেকে ঢুকে আরেকদিকে বেরিয়েছে। লোকটা পিছন দিকে ঢলে পড়ল, সিলভিয়ার পায়ের ওপর পিঠ দিয়ে, হাত দুটো ছড়িয়ে পড়ল দু'দিকে।

ইঁদুর-মুখো প্রথম লোকটা সিলভিয়ার প্রাণবায়ু বের করতে এত ব্যস্ত যে লক্ষ্যই করল না তার সঙ্গীর পতন ঘটেছে। তারপর এক কি দু'সেকেণ্ডের জন্যে স্থির হয়ে গেল সে– কারণ একজোড়া বড় আকৃতির হাত ভোজবাজির মত কোত্থেকে এসে জড়িয়ে ধরল তার চিবুক আর মাথার ওপরের অংশ। সিলভিয়া অনুভব করল তার নাক আর মুখ থেকে হাত সরাল লোকটা, এখন সে নিজের চিবুক আর খুলি থেকে অন্য কারও হাত নামাতে চেষ্টা করছে।

শ্বাস টানতে এখনও কষ্ট হচ্ছে সিলভিয়ার, চোখ দুটো আপনা থেকে বন্ধ হয়ে আসছে। অদ্ভুত একটা আওয়াজ ঢুকল তার কানে, কেউ যেন শক্ত বরফের টুকরো দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে। সে তার খুনীর চোখ দুটো এক পলকের জন্যে দেখতে পেল– বিস্ফারিত হয়ে আছে, যেন কোটর ছেড়ে ছিটকে পড়বে, মাথাটা

মোচড় খেয়ে ঘুরে গেছে পুরোপুরি ৩৬০ ডিগ্রী।

জ্ঞান ফিরতে মুখে আফ্রিকার গরম রোদ অনুভব করল সিলভিয়া। চোখ মেলতেই মনে পড়ে গেল সব কথা, আতঙ্কে আবার নীল হয়ে গেল সে। অথচ চোখের সামনে দৃশ্যটা ভারি সুন্দর। তার খুনীরা চলে গেছে। সত্যি কি তাদের অস্তিত্ব ছিল? দৃষ্টিভ্রম বা মতিভ্রম কি যেন বলে··· সেরকম কিছু ঘটেনি তো?

'ওয়েলকাম ব্যাক,' ভারি একটা পুরুষ কণ্ঠ শোনা গেল। 'ভয় হচ্ছিল আপনি কোমায় চলে গেলেন কিনা।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সিলভিয়া। সেই স্পিয়ারফিশারম্যান, তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। 'ওরা কোথায়? ওরা···আমাকে যারা খুন করতে চাইছিল?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'ওরা জোয়ারের সঙ্গে ভেসে গেছে,' হালকা হাসির সুরে বলল আগন্তুক।

'ভেসে গেছে···জোয়ারের সঙ্গে?'

'আমাকে শেখানো হয়েছে সৈকতে কখনও আবর্জনা ছড়াতে নেই। পানির ওপর দিয়ে টেনে একটু দূরে রেখে আসি ওদেরকে, স্রোতের সঙ্গে এখন তারা গ্রীসের দিকে যাচ্ছে।'

তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া, শিরশির করে উঠল শরীর। 'আপনি ওদেরকে মেরে ফেলেছেন।'

'আপনি নিশ্চয়ই দুঃখ পাননি।' হাসল আবার আগন্তুক। 'অন্তত পাওয়া উচিত নয়। লোক ওরা ভাল ছিল না।'

'ওদেরকে আপনি মেরে ফেলেছেন!' ফ্যাকাসে হয়ে গেল সিলভিয়ার চেহারা, মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়ছে। 'আপনিও ওদের মত, কোল্ড-ব্লাডেড মার্ডারার।'

আগন্তুক বুঝতে পারছে, আঘাতটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি মেয়েটা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে বলল, 'আমি নাক না গলালে আপনি খুশি হতেন?'

একদৃষ্টে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া। ধীরে ধীরে রঙ ফিরে এল চেহারায়, উপলব্ধি করছে এই অচেনা পুরুষ তাকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। 'না, প্লীজ, মাফ করুন আমাকে। আমি বোকার মত কথা বলছি। কে আপনি? কে আমার প্রাণ বাঁচাল?'

'আমি মাসুদ রানা।'

'আমি সিলভিয়া ওয়াকম্যান।' সিলভিয়া অনুভব করল তার হাত ধরল আগন্তুক- মুখে হাসি আছে, তবে চোখের দৃষ্টিতে শুধুই উদ্বেগ। 'আপনি মিশরীয় নন,' বলল সে।

'না, বাংলাদেশী। আমি একটা মার্কিন সংস্থায় আছি– ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির প্রজেক্ট ডিরেক্টর। নীল নদে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে করছি আমরা।'

'ওরা হামলা করার আগে আমি ভেবেছিলাম আপনি চলে গেছেন।'

'চলেই যাচ্ছিলাম, তবে লোকগুলোকে দেখে আমার কৌতূহল হয়। কারণও ছিল। প্রায় এক কিলোমিটার দূরে গাড়ি রেখে সরাসরি আপনার দিকে হেঁটে আসে

ওরা। আড়ালে ছিলাম, লক্ষ রাখছিলাম।'

'আমার ভাগ্য যে আপনি সন্দেহপ্রবণ মানুষ।'

'কিছু আন্দাজ করতে পারেন, কেন ওরা আপনাকে খুন করতে চাইল?'

'নিশ্চয় পেশাদার খুনী হবে, ট্যুরিস্টদের খুন করে টাকা-পয়সা লুঠ করে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ডাকাতি করা ওদের উদ্দেশ্য ছিল না। ওদের কাছে আমি কোন অস্ত্র পাইনি। আপনাকে ওরা হাত দিয়ে খুন করতে চাইছিল। প্রফেশনাল খুনীও নয়, হলে আমরা দু'জনেই মারা যেতাম।'

'তাহলে…?'

'আমার ধারণা, কেউ ওদেরকে ভাড়া করেছিল। আপনার পিছু নিয়ে এখানে আসে ওরা। আপনি মারা গেলে আপনার নাক-মুখ দিয়ে লোনা পানি ঢোকাত, লাশটা ফেলে দিত পানিতে, দেখে যাতে মনে হয় আপনি ডুবে মারা গেছেন।'

'গোটা ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগছে,' বলল সিলভিয়া। 'আমি একজন বায়োকেমিস্ট, মানুষের শরীরের বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ। আমার কোন শত্রু নেই। তাহলে কেন কেউ আমাকে খুন করতে চাইবে?'

'মিশরে আপনি কতদিন হলো আছেন?'

'মাত্র অল্প ক'দিন।'

'নিশ্চয়ই কিছু করেছেন, যে কারণে আপনার ওপর কেউ খুব রেগে গেছে।'

'নর্থ আফ্রিকান কেউ হতে পারে না, কারণ এখানে আমি তাদের উপকার করতে এসেছি।'

'ও, তারমানে আপনি এখানে ছুটি কাটাতে আসেননি।' চিন্তিত দেখাল রানাকে।

মাথা নাড়ল সিলভিয়া। 'না, আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি। দক্ষিণ সাহারার যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত এক ফিজিকাল অ্যাবনরমালিটি ও সাইকোলজিকাল ডিজঅর্ডার ছড়িয়ে পড়েছে— হু অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের উদ্বেগ বোধ করার সেটাই কারণ। হু-র তরফ থেকে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটা টীম গঠন করা হয়, আমি সেই টীমের একজন সদস্য। আমাদের কাজ ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখা।'

'আপনার ধারণা মরুভূমির ওই প্লেগের জন্যে কোন টক্সিন দায়ী?'

'এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না, হাতে যথেষ্ট ডাটা নেই। এমনিতে মনে হয়েছে দূষিত কিছু থেকে অসুস্থতা ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু উৎসটা এখনও রহস্যময়। যে এলাকায় লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছে তার কয়েকশো কিলোমিটারের মধ্যে কোন কেমিকেল কোম্পানি বা ওয়েস্ট প্রসেসিং ফ্যাক্টরি নেই।'

'কতটা জায়গা জুড়ে সমস্যা?'

'গত দশ দিনে মালি আর নাইজারে আট হাজার রোগীর দেখা পাওয়া গেছে।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'এত অল্প দিনে এত বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছে? কি করে বুঝলেন ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস দায়ী নয়?'

'বললাম না, উৎসটা এখনও রহস্যময়।'

'অদ্ভুত ব্যাপার, নিউজ মিডিয়ায় ব্যাপারটা আসেনি।'

'হুর তরফ থেকে খবর প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে,' বলল সিলভিয়া, 'যতদিন না অসুস্থতার কারণটা জানা যায়। সম্ভবত আতঙ্ক ছড়াবার ভয়ে।'

খানিক পরপরই সৈকতের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে রানা। রাস্তার কাছাকাছি কয়েকটা নিচু বালিয়াড়ির ওদিক থেকে একটু নড়াচড়ার আভাস পেল একবার। 'আপনার প্ল্যানটা কি?'

'টীমের সঙ্গে কাল আমি সাহারায় যাচ্ছি, ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন শুরু করার জন্যে।'

'জানেন তো, মালির পরিবেশ অত্যন্ত বিপজ্জনক, যে-কোন দিন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে?'

গুরুত্ব না দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল সিলভিয়া। 'মালি সরকার কড়া গার্ডের ব্যবস্থা করবে বলে কথা দিয়েছে।' তার দৃষ্টিতে কৌতূহল ও প্রশ্ন জাগল। 'আপনি আমাকে এত সব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? শুনে মনে হচ্ছে আপনি একজন সিক্রেট এজেন্ট।'

হেসে উঠল রানা। 'আন্দাজে ছোঁড়া ঢিল, তাই না? আমাকে আপনি বহুরূপী বলতে পারেন, তবে শুভ অর্থে, যে কিনা সুন্দরী মেয়েদেরকে বিপদে পড়া থেকে বাঁচাতে চায়।' হঠাৎ খপ করে সিলভিয়ার একটা হাত ধরে টান দিল ও। 'চলুন, যাওয়া যাক।' তাকে নিয়ে সৈকত ধরে ছুটল ও।

'কি করছেন আপনি?' হোঁচট খেতে খেতে ছুটছে সিলভিয়া।

রানা জবাব দিল না। বালিয়াড়ির ওদিকে এখন কোন নড়াচড়া নেই, তবে ধোঁয়া বেরুতে দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে ও, আরও একজন খুনী সিলভিয়ার রেন্টাল কারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, ওদেরকে অচল করে দিতে চায়, যতক্ষণ না নিজেদের আরও লোকজন এসে পৌঁছায়।

এতক্ষণে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে। স্পিয়ারগানটা সঙ্গে নিয়ে এলে...না, ফায়ারআর্মসের বিরুদ্ধে ওটা কোন কাজে আসবে না। মনে ক্ষীণ একটু আশা জাগল, এ লোকটাও প্রথম দু'জনের মত নিরস্ত্র হবে, এবং হয়তো ওর জীপটাকে সে দেখতে পায়নি।

প্রথম আশাটা সত্যি হলো, দ্বিতীয়টা মিথ্যে। শেষ বালিয়াড়ির মাথায় উঠতেই কালো লোকটাকে দেখা গেল, হাতে গোলপাকানো খবরের কাগজ মশালের মত জ্বলছে। লাথি মেরে উইণ্ডশীল্ড ভাঙার চেষ্টা করছে সে, জীপের ভেতর আগুন দেবে। তার কাপড়চোপড় আগের দু'জন লোকের মত নয়। এর মাথায় জটিল পদ্ধতিতে জড়ানো সাদা হেডড্রেস বা পাগড়ি রয়েছে, তাতে মুখের প্রায় পুরোটাই ঢাকা পড়েছে, উন্মুক্ত শুধু চোখ দুটো। পরনে ঢোলা আলখেল্লা। তার খেয়াল নেই সিলভিয়াকে নিয়ে কাছে চলে এসেছে রানা। 'থামো!' হুঙ্কার ছাড়ল ও।

যেমন চেয়েছিল রানা, ঝট করে ঘুরে গেল লোকটা। আর ঠিক সেই মুহূর্তে খেপা ষাঁড়ের মত তার বুকে মাথা দিয়ে গুঁতো মারল ও। একই সঙ্গে ঘুসি চালাল

লোকটার তলপেটে।
ছিটকে পড়ল লোকটা, হাতের মশাল রানার মাথার ওপর দিয়ে পিছন দিকে উড়ে গেল। ডাইভ দিয়ে লোকটার গায়ের ওপর নামল রানা, দমাদম কয়েকটা ঘুসি মেরে কাবু করে ফেলল। লোকটা নিস্তেজ হয়ে গেছে দেখে তার পকেটগুলো হাতড়াল ও। কিছুই পাওয়া গেল না– না অস্ত্র, না আইডেনটিফিকেশন। হঠাৎ বিস্মিত হয়ে রানা দেখল লোকটা হাসছে। সাদা দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে, একটা দাঁত অবশ্য নেই। লোকটার চোয়াল ঝুলে পড়ল, তারপর মাথাটা ঢলে পড়ল একদিকে। একটু দেরিতে বুঝল রানা, লেদার রাবার কোটেট সায়ানাইড পিল গিলে আত্মহত্যা করেছে লোকটা। নকল দাঁতের ভেতর লুকানো ছিল।
লোকটার ঠোঁট থেকে ফেনা গড়াচ্ছে। ধীরে ধীরে তার পাশ সিধে হলো রানা। এগিয়ে এসে ওর একটা কাঁধ খামচে ধরল সিলভিয়া। 'মা-মারা গেছে নাকি?'
'হ্যাঁ।'
'কিন্তু কেন?' ফিসফিস করল সিলভিয়া। 'কথা বলানো হবে, এই ভয়ে?' তার গলায় অবিশ্বাস।
'নেতার প্রতি বিশ্বস্ত একজন ফ্যানাটিক,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'আমার ধারণা নিজে থেকে সায়ানাইড না খেলে অন্য কেউ তাকে মারত।'
'এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না...।'
'আপনার উচিত পরবর্তী প্লেন ধরে আমেরিকায় ফিরে যাওয়া।'
'না, অসম্ভব!' সিলভিয়াকে অসুস্থ দেখাল। 'আমি একজন বিজ্ঞানী, মানুষের সেবা করতে এসে পালিয়ে যেতে পারি না। বিশেষ করে যখন জানি যে হাজারে হাজারে মারা যাচ্ছে তারা।'
'একা শুধু আপনি নন, খুনীদের তালিকায় সম্ভবত আপনার কলিগরাও আছেন। কায়রোয় ফিরে ওদেরকে সাবধান করা দরকার। এই ঘটনার সঙ্গে যদি আপনাদের রিসার্চ আর ইনভেস্টিগেশনের সম্পর্ক থাকে, তাহলে তাঁরাও বিপদের মধ্যে আছেন।'
মরা লোকটার দিকে তাকাল সিলভিয়া। 'একে নিয়ে কি করবেন আপনি?'
কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সাগরে ভাসিয়ে দেব।' ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল ওর ঠোঁটে। 'ভাড়া করা লোকগুলো গায়েব হয়ে গেছে, অথচ আপনি দিব্যি হেসে-খেলে বেড়াচ্ছেন, এটা দেখে রিঙলীডারের কি অবস্থা হবে ভাবতে পারেন?'

ওয়ার্ল্ডওয়াইড এক্সপিডিশন-এর কায়রো অফিস খুব চিন্তায় পড়ে গেল, কারণ ডেজার্ট সাফারি গ্রুপ নির্দিষ্ট সময়ের চব্বিশ ঘণ্টা পরও টিমবাকটুতে পৌঁছায়নি। আগেই একটা প্লেন ভাড়া করা হয়েছিল, ট্যুরিস্টদের মরোক্কোয় নিয়ে যাবে, সেটার পাইলট একটা প্যাটার্ন ধরে উত্তর দিকটা সার্চ করল, কিন্তু ল্যাণ্ড রোভারগুলোর কোন হদিস পেল না। তিন দিন পর রিপোর্ট করা হলো মালি সরকারকে, সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল তারা। সামরিক কপ্টার ও ভেহিকেল পেট্রল পাঠানো হলো, মরুভূমির ওপর পরিচিত পথগুলো সার্চ করবে।

চারদিন পর হতাশ হয়ে পড়ল সবাই। এমনকি অ্যাসেলার পর্যন্ত কপ্টার পাঠিয়েও সাফারি গ্রুপের দেখা পাওয়া যায়নি, পাইলট ওখানে পরিত্যক্ত গ্রাম দেখে ফিরে এসেছে।

আরও সাতদিন পর এক ফরাসী তেল অনুসন্ধানী দল সিডনি কামারকে উদ্ধার করল। মরুভূমিতে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলেন তিনি, প্রায় মৃতই বলা যায়। ডিহাইড্রেশনে আক্রান্ত হয়েছেন, ঘাম জমাট বেঁধে যাওয়ায় গায়ে লবণের মিহি প্রলেপ পড়েছে। উদ্ধার পাবার চার ঘণ্টার মধ্যে দু'গ্যালন পানি খেলেন তিনি, তারপর অবিশ্বাস্য ও রোমহর্ষক গল্পটা শোনালেন। তেল কোম্পানির ভদ্রলোক দু'জন নাইজার নদীর তীরে গাও শহরে নিয়ে এলেন তাঁকে, ভর্তি করে দিলেন হাসপাতালে। তারপর তাঁরা মালিয়ান সিকিউরিটি ফোর্সকে খবর দিলেন। অফিসে বসিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট লিখতে বলা হলো, এই ফাঁকে এক কর্নেল তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন রাজধানী বামাকো-য়। তাঁদেরকে গ্রেফতার করা হবে শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন ফরাসী বিজ্ঞানীরা। প্রতিবাদ করেও কোন লাভ হলো না, যেতেই হলো হাজতে। পরদিন সকালে বামাকো থেকে একটা ইন্টারোগেশন টীম এল, দু'জনকে আলাদাভাবে জেরা করল তারা। ফরাসী ভদ্রলোকেরা নিজেদের কনসুলেটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁদের আবেদনে সাড়া পাওয়া গেল না। এরপর দুই জিওলজিস্ট সহযোগিতা করতে অস্বীকার করায় ইন্টারোগেশন হয়ে উঠল অকথ্য ও নিষ্ঠুর শারীরিক অত্যাচারের নামান্তর। এই ফরাসী ভদ্রলোকরাই প্রথম নন, এর আগেও শহরের সিকিউরিটি বিল্ডিঙে ঢোকার পর অনেক লোক আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। তেল কোম্পানির হেডকোয়ার্টার মার্সেইলেস থেকে জরুরী বার্তা এল, তাদের টীমের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না, দয়া করে যেন সার্চ করে দেখা হয় কোথায় কি অবস্থায় আছেন তাঁরা। মালিয়ান সিকিউরিটি ফোর্স লোক-দেখানো সার্চ করল, রিপোর্ট পাঠাল তেল কোম্পানির পরিত্যক্ত রেনোয়া ট্রাক ছাড়া আর কিছু পায়নি তারা। বিশাল মরুভূমিতে যারা চিরতরে হারিয়ে গেছে তাদের তালিকায় দুই ফরাসী জিওলজিস্ট ও ওয়ার্ল্ডওয়াইড এক্সপিডিশনের পাঠানো ট্যুরিস্টদের নাম যোগ হলো।

গাও হাসপাতালের সামনে, একটা ধাপের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন ড. আলফাস হামান। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে তাঁকে। কাছাকাছি মসজিদের মিনার থেকে মাগরেবের আজান শুরু হলো। সেদিকে তাকাতে মিনারের পাশে আধ খানা চাঁদ দেখতে পেলেন ড. হামান। চোখ নামিয়ে নাইজার নদীর ওপর দৃষ্টি বুলালেন তিনি। নদীর আগের সেই উচ্ছল যৌবন এখন আর নেই। খরার কারণে শুকিয়ে সরু হয়ে গেছে, স্রোত হয়ে পড়েছে মন্থর।

দীর্ঘদিন ফরাসীদের কলোনি ছিল মালি, স্বাধীনতার পরও তাদের সংখ্যা বা প্রভাব খুব একটা কমেনি। অনেক ফরাসীই স্থানীয় পরিবারে বিয়ে করে স্থায়ী হয়ে গেছে এখানে। কাজেই ফর্সা মালিয়ানের সংখ্যা খুব কম নয়। কুচকুচে কালো

আফ্রিকানরাও আছে। আর আছে তামাটে আরব বা মুর। ড. হামান আলকাতরার মত কালো, নিগ্রোদের মত চেহারা, নাকটা খুব চওড়া আর চ্যাপ্টা। শরীরটা বিশাল, ভুঁড়ি আছে, চৌকো মুখ, বয়েস হবে পঞ্চাশের কাছাকাছি।

হলুদ আলো ফেলে রোজ-ম্যাজেন্টা রঙের একটা গাড়ি ছুটে আসছে দেখে শক্ত হয়ে গেলেন তিনি। গাড়িটা অ্যান্টিকস, উনিশশো ছত্রিশ সালে তৈরি অ্যাভিয়নস ভয়সিন সিডান। কোচওয়ার্কের ডিজাইনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার অ্যারোডাইনামিক্স ও কিউবিস্ট আর্ট-এর প্রভাব লক্ষ করার মত। গাড়িটার আভিজাত্য দৃষ্টি কাড়ে, ভাঙাচোরা এই প্রাচীন শহরে ঠিক যেন মানায় না। ওটাকে শক্তি যোগায় সিক্স-সিলিণ্ডার পীভ-ভালভ এঞ্জিন। মালি যখন ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট আফ্রিকার অংশ ছিল তখন ওটা ব্যবহার করতেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল।

একা শুধু ড. হামান নন, মালি শহরের সবাই চেনে গাড়িটা, জানে কে ওটার মালিক। ওটাকে দেখামাত্র লোকজনের বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে, কিভাবে পালাবে ভেবে দিশেহারা বোধ করে। ড. হামান দেখলেন গাড়িটার পিছু নিয়ে একটা সামরিক অ্যাম্বুলেন্স আসছে। তার মানে কোন সমস্যা হয়েছে।

হাসপাতালের সামনের চত্বরে থামল গাড়িটা, ঠিক পিছনে থামল অ্যাম্বুলেন্স। বয়সিনের ব্যাক সীট থেকে বেরিয়ে এলেন উচ্চপদস্থ একজন সামরিক অফিসার, পরনে পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম, ভাঁজগুলো এত ধারাল যে মাখন কাটা যাবে। আফ্রিকান নেতারা ইউনিফর্মের সঙ্গে রঙবেরঙের অসংখ্য পদক আর মেডেল পরেন, তবে জেনারেল পিয়েত্রো ভিনসেন্ট আফ্রিকানও নন, পদক ও মেডেল পছন্দও করেন না– তিনি তাঁর আর্মি জ্যাকেটের ব্রেস্টে সবুজ আর সোনালি রিবন লাগিয়েছেন শুধু। তিনি ফরাসী, তাসত্ত্বেও মাথায় পাগড়ি বাঁধেন। যথেষ্ট লম্বা তিনি, তবে অস্বাভাবিক রোগা। লালচে গোঁফ আছে মুখে। গাড়ি থেকে নেমে কাঁধে টোকা দিলেন, যেন ময়লার কণা সরালেন, তারপর ড. হামানের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ছোট্ট করে। 'তাকে সরানোর সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন?' গলার আওয়াজ খুব ভারি।

'মেজর কামার এখন পুরোপুরি সুস্থ,' বললেন ড. হামান। 'তবে আপনার কথা মত ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।'

'হাসপাতালে ভর্তি করার পর কারও সঙ্গে কথা বলেনি তো?'

'আমি আর একজন নার্স ছাড়া কেউ তাঁর কেবিনে ঢোকেনি। নার্স ইংরেজি বা ফরাসী জানে না। তাঁকে রাখাও হয়েছে হাসপাতালের এক কোণে। তিনি যে এখানে আছেন বা ছিলেন, তার কোন রেকর্ড রাখা হয়নি– সব পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।'

জেনারেল ভিনসেন্টকে সন্তুষ্ট দেখাল। 'ধন্যবাদ, ডক্টর। আপনি সহযোগিতা করায় আমি খুশি।'

'জিজ্ঞেস করতে পারি, আপনি তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল জেনারেলের ঠোঁটে। 'তেবেজায়।'

'সর্বনাশ, কোন্ তেবেজায়?' আঁতকে উঠলেন হামান। 'তেবেজা পেনাল সেটেলমেন্টে? যেখানে গোল্ড মাইন আছে? কিন্তু ওখানে তো শুধু দেশদ্রোহী আর

খুনীদের মরতে পাঠানো হয়।'

'হয়,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললেন জেনারেল।

'কি তাঁর অপরাধ?'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন দৃষ্টিতে তাকালেন জেনারেল, ড. হামান যেন কুৎসিত একটা প্রাণী। 'কোন প্রশ্ন করবেন না,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন তিনি।

ভয়ে শিরশির করে উঠল গা, ড. হামান তারপরও প্রশ্ন করলেন, 'আর ফরাসী দু'জনকে নিয়ে কি করবেন, যারা মি. কামারকে এখানে নিয়ে এসেছেন?'

'ওদেরকেও ওখানে পাঠানো হচ্ছে।'

'কিন্তু জেনারেল! ওঁরা ফরাসী, আপনার দেশের মানুষ! ওঁদেরকে কেন খনিতে মরতে পাঠাবেন?'

'আমার দেশ ফ্রান্স নয়, আমি মালিয়ান,' জবাব দিলেন ভিনসেণ্ট। 'আমি ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিই না।'

'ওখানে তো ওঁরা কেউই বাঁচবেন না।'

'ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে মারার চেয়ে ভাল।' কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল। 'যে-ক'টা দিন বেঁচে থাকে কাজ করুক। খনির উৎপাদন বাড়লে আমাদের অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।'

ড. হামান বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন।

'আমার পরামর্শ শুনলে আপনার কোন বিপদ হবে না,' বললেন ভিনসেণ্ট। 'মেজর সিডনি কামারের কথা মন থেকে মুছে ফেলুন, স্রেফ ভুলে যান। দেশের নিরাপত্তার জন্যেই এটা জরুরী।'

'জ্বী, ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকালেন হামান। শহরে বিশাল একটা পরিবার আছে তাঁর, তিনি জানেন জেনারেলের পরামর্শ না শুনলে তার পরিবারের ওপর গজব নেমে আসবে।

কয়েক মিনিট পর জেনারেল ভিনসেণ্টের দু'জন সিকিউরিটি গার্ড অচেতন সিডনি কামারকে হাসপাতাল থেকে বের করে এনে অ্যাম্বুলেন্সে তুলল। ড. হামানকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে স্যালুট করে নিজের অ্যান্টিকস গাড়িতে চড়লেন ভিনসেণ্ট। চলে গেলেন।

নাইল শেরাটনের একটা স্যুইটে রয়েছেন ড. মাইকেল সুনারিল, সোফায় বসে মনোযোগ দিয়ে সিলভিয়ার কথা শুনছেন। কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে রয়েছেন মঈন জাহাঙ্গীর। চারতলা নিচের রাস্তা থেকে ব্যস্ত কায়রো ট্রাফিকের আওয়াজ ভেসে আসছে। সিলভিয়ার চেহারা দেখে মনে হলো মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাটা এখনও তাকে আতঙ্কিত করে রেখেছে।

'লোকগুলো তোমাকে খুন করতেই চেয়েছিল, এ-ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই।'

জাহাঙ্গীর বললেন, 'ওদের চেহারার যে বর্ণনা তুমি দিলে, তাতে বোঝা যাচ্ছে ওরা টুয়ারেগ।'

'টুয়ারেগ মানে?' জিজ্ঞেস করলেন ড. সুনারিল। ছ'ফুট লম্বা, হাসিখুশি

চেহারা। মেডিকেল টীমের লীডার তিনি, বাড়ি কানাডায়।

'টুয়ারেগ,' আবার বললেন মঈন জাহাঙ্গীর। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন টীমের কোঅর্ডিনেটর ও লজিস্টিক এক্সপার্ট তিনি, তুরস্কর রাজধানী আংকারা থেকে এলেও, তিনি একজন কুর্দী। 'যাযাবর হলেও, এক সময় মরুভূমির বীর যোদ্ধা ছিল ওরা, মুর আর ফরাসীদের সঙ্গে অনেক বড় বড় যুদ্ধে জিতেছে। আজকাল অবশ্য যুদ্ধ করে না, ছাগল চরায় বা সাহারার ছোট ছোট শহরগুলোতে ভিক্ষা করে। মাথায় খুব জটিল পদ্ধতিতে পাগড়ি বাঁধে ওরা, এক মিটারের বেশি লম্বা হয় ওগুলো। আলখেল্লা পরে।'

'কিন্তু যাযাবররা কেন সিলভিয়াকে মারতে চাইবে?' জিজ্ঞেস করলেন ড. সুনারিল।

'কেউ হয়তো ওদেরকে ভাড়া করেছে,' বললেন জাহাঙ্গীর। 'কেউ হয়তো চাইছে না দক্ষিণ-পশ্চিম মরুভূমিতে টক্সিক পয়জনিঙের কারণ তদন্ত করে দেখা হোক।'

'প্রজেক্টের এই পর্যায়ে আমরা এমনকি এও জানি না যে কনটামিনেশনই কালপ্রিট কিনা,' বললেন ড. সুনারিল। 'ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়াও দায়ী হতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল সিলভিয়া। 'মাসুদ রানাও তাই বললেন।'

'কে?'

'মাসুদ রানা, যিনি আমার প্রাণ বাঁচালেন। তিনি বললেন, কেউ সম্ভবত চাইছে না আমি আফ্রিকায় থাকি। তাঁর আরও ধারণা, খুনীদের তালিকায় তোমরাও আছ।'

'আরে ধ্যাত।' নাকচ করার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন জাহাঙ্গীর। 'উনি বললেন আর আমরা বিশ্বাস করলাম। আফ্রিকায় মাফিয়া আসবে কোত্থেকে!'

'ভাগ্যিস ভদ্রলোক কাছেপিঠে ছিলেন!' বললেন সুনারিল।

'পরিকল্পিত নয় তো?' পাইপে আগুন ধরালেন জাহাঙ্গীর।

রেগে গেল সিলভিয়া। 'তোমার ধারণা, গোটা ব্যাপারটা ভদ্রলোকের অভিনয়, বানানো? কিন্তু আমি যে নিজের চোখে দেখলাম তিনজন লোককে মেরে ফেললেন তিনি, তার কি ব্যাখ্যা দেবে?'

'হোটেলে পৌঁছে দেয়ার পর আর যোগাযোগ করেননি?'

'ফ্রন্ট ডেস্কে একটা মেসেজ রেখে গেছেন, বলেছেন আমাকে নিয়ে আজ সন্ধ্যায় ডিনার খেতে চান।'

সবজান্তার হাসি ফুটল জাহাঙ্গীরের ঠোঁটে। 'তুমি সুন্দর, তোমার মন জয় করার জন্যে অনেক কিছুই করতে চাইবে মানুষ।'

'তুমি থামবে!' ড. সুনারিলের দিকে ফিরল সিলভিয়া। 'উনি নুমায় আছেন বলে জানিয়েছেন আমাকে।'

জাহাঙ্গীর বলল, 'নুমায় আমার এক মেরিন বায়োলজিস্ট বন্ধু আছে, চেক করে দেখব।'

ড. সুনারিল বিড়বিড় করলেন, 'প্রশ্নটা কিন্তু এখনও থাকছে– হোয়াই?'

'ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়, কেউ হয়তো চাইছে মিশনটা আমরা বাতিল করে দিই।'

'কিন্তু সব মিলিয়ে পাঁচটা টীম আমরা, প্রতি টীমে ছ'জন করে সদস্য, সবাই দক্ষিণ মরুভূমিতে যাচ্ছি। সুদান থেকে মৌরিতানিয়া, পাঁচটা দেশে পৌঁছুব। ওদের ঘাড়ে কেউ আমাদেরকে চাপিয়ে দেয়নি। রহস্যময় রোগটা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করায় প্রতিটি দেশ থেকে জাতিসংঘের সাহায্য চাওয়া হয়েছে বলেই আমরা এসেছি। আমরা আমন্ত্রিত অতিথি, অবাঞ্ছিত শত্রু নই।'

'একটু ভুল হলো, মাইকেল। অন্তত একটা দেশের সরকার জাতিসংঘের সাহায্য চেয়ে কোন বার্তা পাঠায়নি।'

গম্ভীর হলেন ড. সুনারিল, মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ, মালির কথা মনে ছিল না। প্রেসিডেন্ট তাহির প্রথমে আমাদেরকে গ্রহণ করতে রাজি হননি, পরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হয়েছেন।'

'রাজি হননি আসলে জেনারেল পিয়েত্রো ভিনসেন্ট,' বললেন জাহাঙ্গীর। 'তাহির তো স্রেফ নামে মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান। আসল ক্ষমতা ভিনসেন্টের হাতে।'

'নিরীহ বায়োলজিস্টদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ থাকতে পারে তাঁর?'

কাঁধ ঝাঁকালেন জাহাঙ্গীর। 'কে বলবে।'

ড. সুনারিল বললেন, 'ব্যাপারটা আমার কিন্তু সিরিয়াসই মনে হচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে মরুভূমিতে বিদেশী ট্যুরিস্ট নিখোঁজ হবার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে। এই তো ক'দিন আগে গোটা একটা ট্যুরিস্ট সাফারি নিখোঁজ হওয়া নিয়ে খবরের কাগজে কত লেখালেখি হলো। সিলভিয়ার ওপর হামলার সঙ্গে এগুলোর সম্পর্ক আছে কিনা...'

'কিন্তু সম্পর্ক থাক বা না থাক, মিশনটা আমরা বাতিল করতে পারি না,' বলল সিলভিয়া। 'ভুলে গেলে চলবে না যে ওখানে মানুষ মারা যাচ্ছে।'

'আমি কিন্তু মিশন বাতিল করারই পক্ষে।'

মঈন জাহাঙ্গীরকে থামিয়ে দিয়ে সুনারিল বললেন, 'কাল আমরা রওনা হচ্ছি। রওনা হবার আগে আমি একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকব। সিলভিয়ার ওপর হামলা, আমাদের সন্দেহ, মালি সরকারের অদক্ষতা সম্পর্কে বিবৃতি দেব আমি। জেনারেল ভিনসেন্টের কোন খারাপ মতলব থাকলে, তিনি যাতে সাবধান হয়ে যান।'

'আচ্ছা, বলুন তো, নীলনদে ঠিক কি খুঁজছেন আপনারা?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

হিলটন হোটেলের একটা রেস্তোরাঁয় রিজার্ভ করা টেবিলে বসে রয়েছে ওরা। সিলভিয়াকে রানা সারারাত ধরে কায়রো শহর দেখাবার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু কাল সকালে প্লেন ধরতে হবে বলে রাজি হয়নি সিলভিয়া। রানা জবাব দিল, 'পানির তলায় প্রাচীন জাহাজ খুঁজছি। নির্দিষ্ট জাহাজ, একটা ফিউনারাল বার্জ।'

'দারুণ রোমাঞ্চকর লাগছে শুনতে। কার, আমি চিনব?'

'ওল্ড কিংডম-এর একজন ফারাও, মেনকুরা নামে পরিচিত– গ্রীক উচ্চারণে বলা হয় মাইসেরিনাস। চতুর্থ রাজবংশের আমলে শাসন করতেন, গিজার তিনটে পিরামিডের মধ্যে সবচেয়ে ছোটটা তাঁর তৈরি।'

অ্যাপিটাইজার শেষ করার পর মেইন কোর্সের অর্ডার দিল রানা। ওয়েটার চলে যেতে সিলভিয়া জিজ্ঞেস করল, 'কেন আপনারা ভাবছেন মেনকুরা নদীতে আছেন?'

'কিছুদিন আগে কায়রোর কাছে পুরানো এক খনিতে শিলালিপি পাওয়া গেছে, তা থেকে আর্কিওলজিস্টরা জানতে পেরেছেন যে গিজার পিরামিড আর প্রাচীন রাজধানী মেম্ফিসের মাঝখানে নদীর কোথাও আগুন লাগায় ডুবে যায় তাঁর বার্জ। প্রাচীন লিপিতে আভাস পাওয়া গেছে তাঁর মমি করা লাশ, বিপুল সোনা সহ, কোনদিনই উদ্ধার করা হয়নি।'

ডিনার পরিবেশন করা হলো। দামী ও সুস্বাদু খাবারে টেবিল ভরে যাচ্ছে দেখে খানিকটা আড়ষ্ট বোধ করল সিলভিয়া, ভাবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে তারই উচিত ছিল ভদ্রলোককে খাওয়ানো অথচ ঘটছে উল্টোটা। 'তো ধরুন বার্জটা পেলেন, তারপর কি হবে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'উদ্ধার করা সোনার ভাগ পাবেন আপনারা?'

হেসে ফেলল রানা। 'না। আমাদের ডিটেকশন ইনস্ট্রুমেন্ট প্রমিজিং টার্গেট পেলে, সাইটটা চিহ্নিত করব আমরা, মিশরীয় আর্কিওলজিস্টদের ডেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেব। ফাণ্ড যোগাড় করার পর পানি থেকে হয় গোটা জাহাজ নয়তো জাহাজের ভেতর থেকে আর্টিফ্যাক্ট তুলবে ওরা।'

টেবিলে বাচ্চা একটা ছাগল গোটাটাই রোস্ট করে পরিবেশন করা হয়েছে। অন্যান্য খাবার বাদ দিয়ে সেটা থেকেই নিজের প্লেটে মাংস তুলে নিচ্ছে সিলভিয়া। নারকেল, চাল, মটরশুটি ইত্যাদি দিয়ে রান্না করা খানিকটা ভাত তুলে দিল রানা তার প্লেটে। 'খেয়ে দেখুন, ভাল লাগবে। এটা আমাদের দেশেও এভাবে রান্না করা হয়। এবার আপনার কাজ সম্পর্কে বলুন। মরুভূমিতে গিয়ে কি দেখবেন বলে আশঙ্কা করছেন?'

'মালি আর নাইজেরিয়া থেকে যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে তা থেকে পরিষ্কার কিছু ধারণা করা কঠিন,' বলল সিলভিয়া। 'গুজব শুনে মনে হয়েছে সাধারণ টক্সিক পয়জনিং। অকাল গর্ভপাত, খিচুনি, কোমা, মৃত্যু। উদ্ভট আচরণ বা পাগলামির কথাও বলা হয়েছে। আপনাদের নারকেল-ভাত সত্যি দারুণ।'

'মিশরীয়রা এটাকে খালতা বলে। কি রকম পাগলামি?'

'নিজের চুল ধরে টানাটানি, দেয়ালে মাথা ঠোকা, আগুনে হাত ঢুকিয়ে দেয়া। কাপড়চোপড় খুলে ফেলে হামাগুড়ি দেয়ার কথাও শোনা গেছে, কেউ মারা গেলে তার মাংস খেয়ে ফেলার ঘটনাও নাকি ঘটেছে।'

'মানুষে মানুষ খাচ্ছে?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কি ধরনের টক্সিনে এরকম সিরিয়াস প্রতিক্রিয়া হতে পারে? আপনার তো জানার কথা।'

'কমন লেড পয়জনিঙেও মানুষ উদ্ভট পাগলামি করে থাকে। চোখের সাদা অংশ টকটকে লাল হয়ে যায়।'

'কফি না চা?' খাওয়া শেষ হতে জানতে চাইল রানা।

'আমেরিকান কফি।'

ওয়েটার চলে যেতে রানা বলল, 'বললেন কাল প্লেন ধরতে হবে, তাহলে সত্যি আপনি মালিতে যাচ্ছেন?'

'তারমানে এখনও আপনি আমার রক্ষকের ভূমিকায় থাকতে চাইছেন।' হাসল সিলভিয়া।

'মরুভূমিতে বিপদ কিন্তু একটা নয়। গরম ছাড়াও অনেক শত্রু আছে। ওখানে আপনাকে ও আপনার সঙ্গী ডু-গুডারদের খুন করার জন্যে অপেক্ষা করছে কেউ।'

'অথচ আমার রক্ষক মহাশয় আমাকে রক্ষা করার জন্যে ওখানে থাকবেন না,' খানিকটা বিদ্রূপই করল সিলভিয়া। 'জ্বী-না, আপনি আমাকে ভয় দেখাতে পারছেন না, মি. মাসুদ রানা। নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি।'

রানার চোখে বিষাদের ছায়া পড়ল। 'এ-কথা আগেও অনেক মেয়ে বলেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ঠাঁই হয়েছে মর্গে।'

সিলভিয়াকে তার হোটেল রুমে পৌঁছে দিতে এসেছে রানা। তালার ফুটোয় চাবি ঢুকিয়ে ইতস্তত করছে সিলভিয়া, নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে। ভদ্রলোককে কামরার ভেতর আমন্ত্রণ করার অজুহাত তো আছেই। ওঁর প্রতি কৃতজ্ঞ সে, তাছাড়াও ওঁকে তার খুব মনে ধরেছে। কিন্তু মেয়ে হিসেবে সে খুব রক্ষণশীল, কাউকে ভাল লেগে গেলেই লাফ দিয়ে তাকে নিয়ে বিছানায় উঠতে রাজি নয়। এমনকি সে তার প্রাণ বাঁচালেও না।

তাকিয়ে ছিল রানা, সিলভিয়ার মুখ লালচে হয়ে উঠতে দেখল। আলতোভাবে হাত রাখল সিলভিয়ার কাঁধে। 'ফ্লাইট বাতিল করে দিন,' ফিসফিস করে বলল ও।

মুখ লুকাল সিলভিয়া, রানার দিকে তাকাল না। 'তা সম্ভব নয়।'

'আমাদের আর হয়তো দেখা হবে না।'

'আমার কাজ আমাকে বেঁধে রেখেছে।'

'কিন্তু যখন ফ্রী হবেন?'

'ক্যালফোর্নিয়ায়, নিজের পরিবারে ফিরে যাব।'

'ওখানে আমারও একটা বাড়ি আছে।'

'কে জানে, তাহলে হয়তো আবার দেখা হতেও পারে।'

সিলভিয়াকে ঘোরাল রানা। হালকা একটা চুমো খেয়ে ছেড়ে দিল। 'বিপদ থেকে দূরে থাকবেন। আমি চাই না আপনি চিরকালের জন্যে হারিয়ে যান।'

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এলিভেটরের দিকে এগোল রানা। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া। মনটা তার খুব খারাপ লাগছে।

তিন

দিগন্তে সূর্য উঁকি দেয়া মাত্র জগতে যেন আগুন ধরে গেল। নীল নদের ওপর মৃদু বাতাস বইছে, মনে হলো অদৃশ্য চুলো গরম নিঃশ্বাস ফেলছে। পাল তোলা একটা নৌকা নুমার রিসার্চ বোটকে পাশ কাটাল, নৌকার কয়েকজন তরুণ আরোহী হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ইলেকট্রনিক গিয়ারে বোঝাই বোটটার দিকে, ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে। সাববটম প্রোফাইলার-এর ভিডিও স্ক্রীন থেকে চোখ তুলে বড়সড় পোর্ট-এর সামনে মুখ সরিয়ে এনে তরুণদের উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা। বাইরের উত্তাপ ওকে বিরক্ত করছে না, রিসার্চ ভেসেল শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। কম্পিউটরাইজড ডিটেকশন ইকুইপমেন্টের সামনে বসে আছে ও, বরফ দেয়া চায়ে চুমুক দিচ্ছে। আবার মনিটরের দিকে মনোযোগ দিল, রঙিন একটা উদ্ভট আকৃতি ফুটছে ওখানে। সচল পানির নিচে, পলির গভীরে, প্রোফাইলার-এর ভার্টিকাল স্ক্যান সেনসর একটা কনট্যাক্ট রেকর্ড করছে। প্রথমে চেনা না গেলেও, ধীরে ধীরে প্রাচীন এক জাহাজের আকৃতি পেল ওটা।

'টার্গেট কামিং আপ,' বলল রানা। 'মার্ক ইট নাম্বার নাইনটি-ফোর।'

নিজের কনসোলে কয়েকটা কোডে চাপ দিল ববি মুরল্যাণ্ড। অন-লাইন গ্রাফিকস ডিসপ্লেতে ফুটে উঠল নদীর সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত বৈশিষ্ট্য, মানুষের তৈরি আশপাশের ল্যাণ্ডমার্ক সহ। আরেকটা কোডে চাপ দিতেই স্যাটেলাইট লেযার-পজিশনিং সিস্টেম সদ্য আবিষ্কৃত আকৃতিটার সুনির্দিষ্ট অবস্থান জানিয়ে দিল, চারপাশের দৃশ্যাবলী সহ। 'নাম্বার নাইনটি-ফোর প্লটেড অ্যাণ্ড রেকর্ডেড।'

ববি মুরল্যাণ্ড সামান্য বেঁটে, গায়ে অসুরের শক্তি রাখে, ঠিক একটা ড্রামের মত গড়ন তার। রানা ও মুরল্যাণ্ড পুরানো বন্ধু, কে কতবার পরস্পরের প্রাণ বাঁচিয়েছে দু'জনের কারোই তা মনে নেই। রানার অনুরোধেই নুমায় তাকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, অস্থায়ী ভিত্তিতে– তাও আজ ন'বছর হয়ে গেছে।

সামনে ঝুঁকে একটা ডিজিটাল আইসোমেট্রিক স্ক্রীন আলোকিত করল রানা। থ্রী-ডাইমেনশনাল ইমেজটাকে ঘোরাতে শুরু করল কম্পিউটর, পলির নিচে চাপা পড়া জাহাজটার খুঁটিনাটি সব দেখিয়ে যাচ্ছে। ইমেজ ও ডাইমেশন রেকর্ড হয়ে গেল, পৌঁছে গেল ডাটা প্রসেসরে, ওখানে প্রাচীন মিশরীয় নাইল বোটগুলোর সঙ্গে তুলনা করা ও মেলানো হবে। স্ক্রীনে চোখ, রানা পড়ল, 'এখানে আমরা পেয়েছি সিক্সথ-ডাইন্যাস্টির একটা কার্গো ভেসেল। দু'হাজার থেকে দু'হাজার দু'শো বি. সি. -তে তৈরি।'

'অবস্থা?'

'বেশ ভালই,' জবাব দিল রানা। 'এর আগে যেগুলো পেয়েছি সেগুলোর মত এটাকেও রক্ষা করেছে পলি। খোল একদম অক্ষত। ডেকের ওপর মাস্তুল পড়ে

থাকতে দেখছি। ডেপথ?'

ডাটা পজিশনিং স্ক্রীনে চোখ বুলাল মুরল্যাণ্ড। 'দু'মিটার পানির মিটার পলির নিচে।'

'কোনও মেটাল?'

'মেশিনে ধরা পড়ছে না।'

'থাকলে তো ধরা পড়বে,' বলল রানা। 'দ্বাদশ শতাব্দীর আগে মিশরে লোহা আবিষ্কৃত হয়নি।'

'লক্ষ করেছ, রানা, ফার্স্ট ডাইন্যাস্টি থেকে শুরু করে থারটিনথ পর্যন্ত ওদের জাহাজের ডিজাইন প্রায় এক রকম? আর শুধু জাহাজের ডিজাইনই নয়, ওদের আর্টও বদলায়নি। আঁকা ছবিতে যে-সব চরিত্র বসে বা দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের বসা বা দাঁড়ানোর ভঙ্গিও সময়ের সঙ্গে বদলায়নি।'

'তুমি আবার মিশর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলে কবে থেকে।'

'এক-আধটু পড়াশোনা করি, কান পেতে থাকি,' সবিনয়ে বলল মুরল্যাণ্ড। বিয়ারের দুটো বোতল বের করল সে। 'বিশ্বাস করা কঠিন নদীর মাত্র দু'মাইল সার্ভে করে চুরানব্বুইটা ভাঙা জাহাজ পেয়েছি আমরা।'

'নীলনদে কত হাজার বছর ধরে জাহাজ ডুবছে সেটা একবার ভেবে দেখো,' লেকচার শুরু করল রানা। 'যে-কোন সভ্যতার জাহাজ গড়ে বিশ বছর টেকে— ঝড়, আগুন বা সংঘর্ষে আয়ু ফুরিয়ে যায়। পানির তলায় আরও চার হাজার বছর এই অবস্থায় থাকবে ওগুলো, পলিই রক্ষা করবে।'

রিসার্চ বোটের পাইলট, জোসেফ জোলার, একটা চোখ রেখেছে ইকো সাউণ্ডারে, আরেক চোখ রেখেছে নদীর সামনের অংশে। তার মাথায় সোনালি চুল, শুধু শর্টস আর স্যাণ্ডেল পরে আছে। মাথা একটু কাত করে ঠোঁটের কোণ থেকে কথা বলল সে, 'ভাটিতে আমাদের কাজ শেষ, মি. রানা।'

'ঠিক আছে, ফেরার সময় তীরের কাছাকাছি থাকো।'

বোট ঘুরিয়ে নিল জোলার, তীর থেকে পাঁচ কি ছয় মিটার দূরত্ব বজায় রেখে ফিরে চলল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জাহাজ পিক করল সেনসর। কম্পিউটর জানিয়ে দিল দু'হাজার চল্লিশ থেকে সতেরোশো ছিয়াশি বি. সি.-তে তৈরি ওটা, কোন অভিজাত লোকের ব্যক্তিগত জাহাজ ছিল। এরকম আরও আটটা জাহাজ দেখল ওরা। তারপর হঠাৎ বড় আকৃতির একটা ছাপ ফুটল স্ক্রীনে। চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'আমরা একটা রয়্যাল বার্জ পেয়ে গেছি!'

'মার্কিং পজিশন,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ঠিক তো, গায়ে ফারাও লেখা রয়েছে?'

'নিজেই দেখো।'

আকৃতিটা বড় হচ্ছে স্ক্রীনে, তাকিয়ে থাকল মুরল্যাণ্ড। 'কণ্ডিশন তো ভালই মনে হচ্ছে। মাস্তুলের কোন চিহ্ন নেই। এত বড়, রাজাদের কারও না হয়ে যায় না।'

খোলটা লম্বা, দুই প্রান্ত বাঁকা হয়ে আছে। পিছন দিকে কাঠের ওপর একটা খোদাইয়ের কাজ দেখা যাচ্ছে— বাজপাখি, মিশরীয় দেবতা হোরাস-এর প্রতিনিধিত্ব করে। তবে বো-র সামনের অংশটা নেই। কম্পিউটরে একটা রাজকীয়

কেবিন দেখা গেল, অলঙ্করণের বাহুল্য লক্ষ করার মত। খোল থেকে এখনও সারি সারি বেরিয়ে আছে বৈঠাগুলো। জাহাজের মাঝখানে চৌকো একটা আকৃতি দেখা গেল, সেটার গায়েও খোদাইয়ের কাজ রয়েছে। ছবিটা ধীরে ধীরে সরে গেল স্ক্রীন থেকে।

'মাঝখানে ওটা পাথরের কফিন!' রুদ্ধশ্বাসে বলল মুরল্যাণ্ড। 'স্ক্যানে দেখা যাচ্ছে কেবিনের ভেতর প্রচুর মেটাল আছে!'

বিড়বিড় করল রানা, 'ফারাও মেনকুরার সোনা।'

'সময়...?'

'দু'হাজার ছয়শো বি.সি.।' হাসছে রানা। 'সব মিলে যাচ্ছে। কম্পিউটর অ্যানালিসিসে দেখা যাচ্ছে সামনের দিকে পোড়া কাঠ আছে। পুড়ে গেছে বলেই বো নেই।'

'তাহলে আর কোন সন্দেহ নেই, মেনকুরার ফিউনারাল বার্জ পেয়ে গেছি আমরা।'

জোলার বোট থামিয়েই সতর্ক করল, 'ভিজিটরস। ঈজিপশিয়ান রিভার পেট্রল বোট আসছে।'

হতবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'কিভাবে খবর পেল ওরা?'

তাকে নিয়ে ডেকে বেরিয়ে এল রানা। দেখা গেল পেট্রল বোট হলেও, তাতে দু'জন ঈজিপশিয়ান নেভি অফিসারের সঙ্গে একজন সিভিলিয়ানও রয়েছে। বোট আরও কাছে আসতে সিভিলিয়ানকে চিনতে পারল ওরা। দু'জনই অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

রিসার্চ বোটের গায়ে ভিড়ল পেট্রল বোট। লাফ দিয়ে চলে এলেন জর্জ রেডক্লিফ, নুমার ডেপুটি ডিরেক্টর। রানা ও মুরল্যাণ্ড একযোগে জানতে চাইল, 'আপনি?'

'ওয়াশিংটন থেকে এলাম।' হাসলেন রেডক্লিফ। 'এক ঘণ্টাও হয়নি কায়রো এয়ারপোর্টে নেমেছি।'

'কিন্তু এখানে আপনি কি করছেন?'

'অ্যাডমিরাল ফোন করেছিলেন আপনার বস্ জেনারেল. রাহাত খানকে,' রানাকে বললেন রেডক্লিফ। 'প্রায় বিশ মিনিট কথা হলো। তারপর আমাকে ডেকে বললেন, রানা আর মুরল্যাণ্ডকে প্রজেক্ট থেকে ডেকে নাও। পোর্ট হার্টকোর্টে যাবার জন্যে নুমার একটা প্লেন দাঁড় করিয়ে রেখেছি, ওখানেই আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন অ্যাডমিরাল।'

রানা যে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম এজেন্ট, এ তথ্য নুমার প্রায় সব অফিসারই জানেন। রানা জানতে চাইল, 'পোর্ট হার্টকোর্ট কোথায়?' এখনও বিস্মিত দেখাচ্ছে ওকে।

'নাইজেরিয়ায়, নাইজার নদীর অববাহিকায় একটা সী পোর্ট।'

'আপনাকে এভাবে পাঠানো হলো কেন? আমাদেরকে অ্যালার্ট করার জন্যে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ব্যবহার করা যেত।'

অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন রেডক্লিফ। 'তা বলতে পারব না। অ্যাডমিরাল আমাকে কিছুই বলেননি।'

'অ্যাডমিরাল আমার বসকে কেন ফোন করেছিলেন তা-ও আপনি জানেন না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সত্যি জানি না,' বললেন রেডক্লিফ।

'ভাল সময়েই এসেছেন,' বলল রানা। 'ভেতরে আসুন, দেখে যান।'

ভেতরে ঢুকে স্ক্রীনের দিকে তাকালেন রেডক্লিফ, কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মাই গড! ফারাওয়ের ফিউনারাল বার্জ! আপনারা পেয়ে গেছেন!'

'ভাগ্যের জোরে,' বলল রানা। 'কাজ শুরু করার পরদিনই।'

'কোথায়...কোথায় পেলেন?'

'আপনার সরাসরি পায়ের তলায়, খোলের নয় মিটার নিচে।'

মুরল্যাণ্ড বলল, 'শুধু ওই একটা নয়, আরও একশো জাহাজ পেয়েছি আমরা।'

'কংগ্রাচুলেশন্‌স্‌,' বললেন রেডক্লিফ। 'আপনাদের সাফল্য অবিশ্বাস্য। ইতিহাসে ঠাঁই পাবার মত কাজ। মিশর সরকার আপনাদের পদক দেবে।'

'পদকের নিকুচি করি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমি জানতে চাই এরকম একটা একসাইটিং প্রজেক্ট থেকে সরিয়ে নিয়ে নতুন কি গছাতে চান অ্যাডমিরাল?'

'নিশ্চয়ই পচা কোন কাজ, সন্দেহ করছি আমি,' গম্ভীর সুরে বললেন রেডক্লিফ।

'তিনি কোন আভাসও দেননি?'

কথা না বলে মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ।

স্যাভয় এণ্টারপ্রাইজেস-এর পাইলট রাজধানী বামাকো থেকে হেলিকপ্টার নিয়ে রওনা হলো, যাচ্ছে উত্তর আর পুব দিকে। একটানা আড়াই ঘণ্টা ধু-ধু মরুভূমি ছাড়া কিছুই তার চোখে পড়ল না। রওনা হবার দু'ঘণ্টা পর কিছু একটায় রোদ লেগে ঝিক করে ওঠায় দিক বদল করে সে, কাছাকাছি এসে ইস্পাতের রেললাইনটা দেখতে পায়। সেই থেকে ওটাকে অনুসরণ করছে।

রেললাইনটা মাত্র গতমাসে সম্পূর্ণ হয়েছে। মালিয়ান মরুভূমির ঠিক মাঝখানে বিশাল এক সোলার ওয়েস্ট ডিটক্সিফিকেশন প্রজেক্টে এসে শেষ হয়েছে ওটা। কয়েক মাইল দূরে বহুকাল আগে পরিত্যক্ত ফ্রেঞ্চ ফরেন লীজান-এর একটা দুর্গ আছে, সেটার নামানুসারে এই ফ্যাসিলিটির নাম রাখা হয়েছে ফোর্ট ফরো। প্রজেক্ট সাইট থেকে রেললাইনটা সরল একটা পথ ধরে এক হাজার ছয়শো কিলোমিটার এগিয়েছে, সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে মৌরিতানিয়ায়, তারপর পৌঁচেছে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে বন্দর নগরী কেপ টাফারিট-এ।

এক্সিকিউটিভ হেলিকপ্টারের আরামদায়ক সীট থেকে জানালা দিয়ে নিচে তাকালেন জেনারেল পিয়েত্রো ভিনসেণ্ট। লম্বা একটা ট্রেনের ওপর দিয়ে ছুটছে কপ্টার। ট্রেনটাকে একজোড়া ডিজেল লোকোমটিভ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। খোলা

কার-এ সারি সারি সাজানো রয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক ওয়েস্ট কন্টেইনার, প্রতিটির মুখ সীল করা। মৌরিতানিয়ায় যাচ্ছে ট্রেনটা, মারাত্মক কার্গো খালি করে ফিরে আসবে আবার। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে স্টুয়ার্ডের দিকে তাকালেন জেনারেল, লোকটা আবার তাঁর শ্যাম্পেনের গ্লাসটা ভরে দিচ্ছে।

আত্মতৃপ্তির হাসি ফুটল জেনারেলের ঠোঁটে। মালি স্বাধীন হয়েছে উনিশশো ষাট সালে, তা হোক, দেশটার অর্থনীতি ও সামরিক ক্ষমতা এখনও ফরাসীদের হাতে রয়ে গেছে। সামরিক বাহিনীতে তিনি নিজে সবার মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, আর অর্থনীতিতে নিজস্ব বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন তাঁর বন্ধু স্যাভয় গাসকিল। মালির খনিজ সম্পদ, পরিবহন, হেভি ইণ্ডাস্ট্রি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সবই ফরাসীদের কব্জায়। তবে সাহারা মরুভূমি থেকে স্যাভয় গাসকিল যেমন টাকা কামাচ্ছেন, তার সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা চলে না।

স্যাভয় গাসকিলের ব্যবসায়িক জীবন শুরু হয় ফ্রান্সে। সেখানে জাদু দেখাবার পর মালিতে পুঁজি বিনিয়োগ শুরু করেন তিনি। প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরিয়ে দেয়ার নিজস্ব পদ্ধতি আছে তাঁর, যে-কোন ব্যবসা একচেটিয়া করতে পছন্দ করেন। ঠিকাদারি কাজ পাবার জন্যে মালিতে পেশীশক্তির ব্যবহার তাঁর দ্বারাই শুরু হয়। গুজব শোনা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কমাবার জন্যে মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করেন না। তাঁর ধন-সম্পদের পরিমাণ আন্দাজ করা হয় দুই থেকে তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সাহারার ফোর্ট ফরোতে বিপজ্জনক ওয়েস্ট ডিজপোজাল প্রজেক্ট তাঁর সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ।

সোলার ডিটক্সিফিকেশন কমপ্লেক্সে পৌঁছে গেল কপ্টার। বহু দূর থেকেই বিশাল এলাকা জুড়ে প্যারাবলিক মিররগুলো দেখা গেল, ওগুলো সোলার এনার্জি সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দেয় কনসেনট্রেটিং রিসিভারে, সৃষ্টি হয় অবিশ্বাস্য ৫০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হাই টেম্পারেচার। সুপারহিটেড ফোটন এনার্জি তারপর পাঠানো হয় ফটো-কেমিক্যাল রিয়্যাক্টরে, রিয়্যাক্টরগুলো বিপজ্জনক কেমিকেলের মলিকিউল ধ্বংস করে ফেলে।

প্রজেক্ট সাইটে কয়েকবারই এসেছেন জেনারেল ভিনসেন্ট, এই মুহূর্তে সেদিকে তেমন মন না দিয়ে শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতেই ভাল লাগছে তাঁর। এক সময় কপ্টার থেকে নামলেন তিনি, গাসকিলের পার্সোনাল এইড জ্যাঁ ককরুকে স্যালুট করলেন। লোকটা রোদে দাঁড়িয়ে ঘামছে দেখে হাসলেন জেনারেল। 'খুশি হলাম তুমি নিজে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছ দেখে।'

জ্যাঁ ককরুর মাথা কামানো, বয়েস হবে ত্রিশ, লম্বা একহারা চেহারা। জেনারেল ভিনসেন্ট তাকে এত সম্মান আর খাতির করে বলে সব সময় অস্বস্তি বোধ করে সে। এতদিনে সে বুঝে নিয়েছে, জেনারেলের এই আচরণ এক ধরনের পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। 'স্যার, মশিয়ে গাসকিল আপনার জন্যে তাঁর এক্সিকিউটিভ স্যুইটে অপেক্ষা করছেন।'

ঢাকা একটা ওয়াকওয়ে ধরে ককরুর পিছু নিয়ে এগোলেন জেনারেল। ওয়াকওয়েটা শেষ হয়েছে তিনতলা একটা বিল্ডিঙের গেটে। কালো সোলার গ্লাস দিয়ে মোড়া বিল্ডিংটা, কিনারাগুলো গোল। ভেতরে ঢুকে একটা মার্বেল লবি

পেরুল ওরা, লোকজন বলতে শুধু নিঃসঙ্গ একজন সিকিউরিটি গার্ডকে দেখা গেল। এলিভেটরে চড়ে ওপরে উঠল ওরা, বেরিয়ে এল টিক-প্যানেল দিয়ে ঘেরা এন্ট্রি হলে, সেখান থেকে মেইন সেলুনে– এখানেই বসবাস করেন স্যাভয় গাসকিল, তাঁর অফিসও এখানে।

‘প্লীজ, স্যার, আপনি একটু বসুন,’ বলল ককরু। ‘মশিয়ে গাসকিল এখুনি এসে পড়বেন...।’

‘আমি এসে গেছি, ককরু,’ উল্টোদিকের দরজা থেকে ভারি একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। এগিয়ে এসে জেনারেল ভিনসেন্টকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন গাসকিল। ‘পিয়েত্রো, বন্ধু আমার, আবার তুমি কষ্ট করে আসায় আমি কৃতজ্ঞ।’

স্যাভয় গাসকিলের চোখ নীল, ভুরু কালো, চুল লালচে। তাঁর নাকটা সরু, চোয়াল চৌকো। শরীরে মেদ নেই, সরু কোমর, তবে সামান্য ভুঁড়ি আছে। তাঁর শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো একটার সঙ্গে অপরটা একেবারেই মেলে না। যদিও স্রেফ তাঁর উপস্থিতি পরিবেশে টান টান উত্তেজনার একটা ভাব এনে দেয়, যেন একটা ঝাঁকি খেয়ে সজাগ হয়ে ওঠে সবাই।

একবার তাকাতেই কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল ককরু। দেরি না করে কাজের কথা পাড়লেন গাসকিল, ‘শুনলাম তোমার এজেন্টরা হু-র লোকজনকে ভয় দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলাম, মালিতে তারা যেন আসতে না পারে।’

‘খুবই দুঃখজনক ঘটনা,’ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল ভিনসেন্ট। ‘কারণটা অস্পষ্ট, তদন্ত চলছে।’

জেনারেলের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন গাসকিল। ‘আরও শুনলাম, ড. সিলভিয়া ওয়াকম্যানকেও তোমার লোকেরা খুন করতে পারেনি। নিজেরাই নাকি নিখোঁজ হয়ে গেছে।’

‘ব্যর্থতার সাজা তারা পায়নি, এ অভিযোগ তুমি করতে পারবে না, গাসকিল।’

‘তুমি তাদের খুন করেছ?’

‘তুমি তো জানোই, ব্যর্থতা আমি ক্ষমা করি না,’ মিথ্যে কথা বললেন জেনারেল। তাঁর পাঠানো আততায়ীরা নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন তিনি, রহস্যটা এখনও বুঝতে পারছেন না।

‘এখন থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে ওয়ার্ল্ড হেলথ টীমের কনটামিনেশন এক্সপার্টরা গাওতে ল্যাণ্ড করবে,’ বললেন গাসকিল। ‘এর তাৎপর্য বুঝতে পারছ, ভিনসেন্ট? ব্যাপারটাকে তুমি হালকাভাবে দেখো না...’

‘বালি ছাড়া কিছুই তারা দেখতে পাবে না,’ বাধা দিয়ে বললেন ভিনসেন্ট। ‘আমার চেয়ে ভালভাবে জানো তুমি, নাইজারের কাছে যে অদ্ভুত রোগটা ছড়িয়েছে তার উৎস ফোর্ট ফরো হতে পারে না। এখান থেকে কয়েকশো কিলোমিটার পুবে আর দক্ষিণে পরিবেশ দূষিত হলে তোমার প্রজেক্টকে কিভাবে দায়ী করা সম্ভব!’

‘তা সত্যি,’ চিন্তিত সুরে বললেন গাসকিল। ‘প্রকাশ্যে যে-টুকু ওয়েস্ট আমরা পোড়াচ্ছি, আমাদের মনিটরিং সিস্টেমে দেখা যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল পলিসি

স্ট্যাণ্ডার্ড-এর বেঁধে দেয়া মাত্রার ভেতরই থাকছে তা।'

'কাজেই চিন্তার কিছু নেই।' কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল। 'ইউএন রিসার্চ টীমকে আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

'তবে এখানে পৌঁছে গেলে ওদেরকে না ঘাঁটানোই ভাল।'

'মরুভূমিই ওদের ব্যবস্থা করবে।'

'কিন্তু ওরা খুন হয়ে গেলে স্যাভয় এণ্টারপ্রাইজকে সন্দেহ করা হবে। ওদের লীডার আর কোঅর্ডিনেটর ড. সুনারিল ও মঈন জাহাঙ্গীর কায়রোয় প্রেস কনফারেন্স ডেকে অভিযোগ করেছে তোমাদের সরকার সহযোগিতা করছে না। সন্দেহ প্রকাশ করেছে, মালিতে তাদের বিপদ হতে পারে। কাজেই সাবধান।'

'কিন্তু ড. সিলভিয়া খুন হয়নি বলে এইমাত্র তুমি রাগ দেখালে।'

'মিশরে মারা গেলে কেউ আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারত না।'

'মরুভূমিতে পিকনিক করতে গিয়ে তোমার বিশ-পঁচিশজন এঞ্জিনিয়ার আর তাদের স্ত্রীরা যে নিখোঁজ হয়ে গেল, সেটা কি?'

'আমাদের অপারেশনের দ্বিতীয় পর্বের জন্যে ওদের নিখোঁজ হওয়াটা জরুরী ছিল,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন গাসকিল।

'আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, এত বড় একটা খবর প্যারিসের কোন কাগজে ছাপা হতে দিইনি। আমি কলকাঠি নেড়েছিলাম বলেই ফ্রেঞ্চ সরকার তদন্ত করার জন্যে লোক পাঠায়নি, ভুলে গেলে?'

'কিছুই ভুলিনি। তোমার মেধা ছাড়া এই ব্যবসা চালানো যেত না।' গাসকিল মনে মনে বললেন, তুমিও ভুলো না যে প্রতি মাসে আমার কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার ডলার পাচ্ছ।

আর জেনারেল ভিনসেণ্ট ভাবছেন, আমাকে মাসে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে নিজে তো কামাচ্ছ দৈনিক দু'লাখ। 'তাহলে ড. সুনারিল আর তার স্টাফকে কিভাবে সামলাতে বলো তুমি?'

'এ-সব ব্যাপারে তুমিই এক্সপার্ট, তুমি যা ভাল বোঝো করো।'

হাসলেন জেনারেল। 'আমি এরই মধ্যে আমার পার্সোনাল ব্রিগেড পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা ঘেরাও করবে, গুলি করবে, তারপর বালির নিচে পুঁতে ফেলবে।' গাসকিল কিছু বলতে যাচ্ছেন দেখে হাত তুলে থামিয়ে দিলেন তাঁকে। 'ইউএন টীমকে নয়। যারা কনটামিনেশন সিকনেসে আক্রান্ত হয়েছে।'

'এত লোককে মেরে ফেলবে?'

'মালি আমার দেশ। দেশকে আমি ভালবাসি। একজন দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব হলো প্লেগটাকে সারা দেশে ছড়াতে না দেয়া।' হাসছেন জেনারেল।

'যা করার সাবধানে করো, পিয়েত্রো। এখানে আমরা কি করছি তা যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়, ইণ্টারন্যাশনাল ট্রাইবুনাল আমাদের দু'জনকেই ফাঁসিতে ঝোলাবে।'

'প্রমাণ ও সাক্ষী ছাড়া দায়ী করা সম্ভব নয়।'

'অ্যাসেলারে সাফারি গ্রুপটাকে যারা মেরে ফেলল, তাদের কি ব্যবস্থা করেছ?' জানতে চাইলেন গাসকিল।

'কিছুই করতে হয়নি,' জবাব দিলেন জেনারেল। 'তারা নিজেরাই নিজেদেরকে খেয়ে ফেলে। তবে এই একই উন্মত্ততার শিকার হয়েছে আরও কয়েকটা গ্রাম।'

গাসকিলের মাথায় একটা আইডিয়া খেলল। 'কেমন হয়, ইউএন টীম যদি ওই মানুষখেকোদের সামনে পড়ে যায়?'

'বিনা খরচে শত্রু নিপাত!' হো হো করে হেসে উঠলেন জেনারেল ভিনসেন্ট। 'দারুণ আইডিয়া!'

প্রাচীন শহর টিমবাকটুতে প্লেন থেকে নামল সিলভিয়া। ইতিহাসটা জানা আছে তার– ঘানা, মালিংক আর সংঘাই, এই তিন সাম্রাজ্যের ক্যারাভান মার্কেট ছিল টিমবাকটু, বাস করত এক লাখ মানুষ। যীশুর জন্ম হতে তখনও এক হাজার একশো বছর বাকি, যাযাবররা তাঁবু ফেলে এই শহরের পত্তন ঘটিয়েছিল। এক সময় পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে বড় বাজারে পরিণত হয় টিমবাকটু।

অতীতের সেই গৌরব এখন আর নেই, তবে প্রাচীন তিনটে মসজিদ এখনও অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। শহরটাকে অবশ্য পরিত্যক্ত আর মৃত নগরীর মত লাগল, গলিগুলো সরু আর আঁকাবাঁকা, কোত্থেকে কোথায় চলে গেছে ঠাহর করা মুশকিল।

প্লেন থেকে নামতেই ইউনিফর্ম পরা এক অফিসার ড. সুনারিলের সামনে এসে স্যালুট দিল, ইংরেজিতে কথা বললেও ফরাসী টান কানে বাজল, 'মি. সুনারিল?'

ড. সুনারিল মাথা ঝাঁকালেন।

'আমি ক্যাপটেন ফয়সল,' বলল লোকটা। 'আমার সঙ্গে আসুন, প্লীজ।'

টার্মিনাল ভবনে ঢুকে তাকে একটা অফিসে নিয়ে এল ক্যাপটেন। ভেতরে ফার্নিচার বলতে একটা টেবিল, খান কতক চেয়ার। টেবিলের পিছনে ফয়সলের বস্ বসে আছেন, পরনে ইউনিফর্ম। কোন কারণ নেই, চোখ গরম করে তাকিয়ে আছেন তিনি। 'আমি কর্নেল সাদিক জেবরিল। আপনাদের পাসপোর্ট বের করুন।'

তৈরি হয়েই এসেছেন ড. সুনারিল, পকেট থেকে ছ'টা পাসপোর্ট বের করে টেবিলে রাখলেন। সবগুলোর পাতা উল্টে দেখলেন কর্নেল, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'মালিতে আপনারা কেন এসেছেন?'

'আমার ধারণা আপনি তা জানেন,' সংক্ষেপে জবাব দিলেন ড. সুনারিল। ফরমালিটিজ তিনি পছন্দ করেন না।

'আপনাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।'

'জাতিসংঘের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অর্থাৎ হু-র সদস্য আমরা, টক্সিক অসুস্থতায় আক্রান্ত লোকজনকে পরীক্ষা করে রিপোর্ট পাঠাব।'

'কিন্তু এখানে তো কেউ টক্সিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়নি,' কঠিন সুরে বললেন কর্নেল।

'সেক্ষেত্রে আমরা নাইজার নদীর পানির নমুনা সংগ্রহ করব, বিভিন্ন শহর

থেকে বাতাস নেব,' বললেন ড. সুনারিল।

'বিদেশীরা এসে আমাদের ওপর খবরদারি করবে, এটা আমরা পছন্দ করি না।'

'আমরা এখানে মানুষের প্রাণ বাঁচাতে এসেছি,' ড. সুনারিল বললেন। 'আমার ধারণা ছিল, জেনারেল ভিনসেন্ট ব্যাপারটা জানেন।'

থতমত খেয়ে গেলেন কর্নেল সাদিক জিবরিল। তিনি আশা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট তাহিরের নাম বলা হবে। 'জেনারেল ভিনসেন্ট আপনাদের ভিজিট অনুমোদন করেছেন?'

'আপনি বরং টেলিফোন করে সরাসরি তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন।' ধোঁকা দিচ্ছেন ড. সুনারিল, জানেন তাঁর হারাবার কিছু নেই।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন কর্নেল, কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

পিছন থেকে ড. সুনারিল বললেন, 'জেনারেলকে বলবেন, প্রতিবেশী কয়েকটা রাষ্ট্র কনটামিনেশনের উৎস খুঁজে বের করার জন্যে জাতিসংঘকে অনুরোধ জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি যদি আমার টীমকে মালিতে কাজ করতে না দেন, সবাই তাঁর নিন্দা ও সমালোচনা করবে।'

দশ মিনিট পর ফিরে এসে কোন কথা বললেন না কর্নেল, প্রতিটি পাসপোর্টে স্ট্যাম্প মেরে সই করে দিলেন। কাজ শেষ করে বললেন, 'মনে রাখবেন, ডক্টর, মালিতে আপনারা আমাদের অতিথি। তার বেশি কিছু না। আপনারা যদি অনভিপ্রেত বিবৃতি দেন বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যে ক্ষতিকর কিছু করেন, বিনা নোটিশে বহিষ্কার করা হবে। ভাল কথা, আপনাদের নিরাপত্তার জন্যে বডিগার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ক্যাপটেন ফয়সল আর দশজন সৈনিক।'

'বডিগার্ড? বাহ্, খুশির কথা।'

'যা-ই পান, সরাসরি আমাকে রিপোর্ট করবেন আপনি।'

'কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কিভাবে তা সম্ভব?'

'ক্যাপটেনের ইউনিটে প্রয়োজনীয় কমিউনিকেশন ইকুইপমেণ্ট আছে।'

'একটা কার চাই আমরা, ফোর-হুইল-ড্রাইভ হলে ভাল হয়। আর চাই দুটো লরি, ল্যাবরেটরি গিয়ার বহন করার জন্যে।'

কর্নেল বললেন, 'মিলিটারি ভেহিকেলের ব্যবস্থা করা হবে।'

ইণ্টারভিউ শেষ হয়ে গেল, কার্গো আনলোড করার জন্যে প্লেনের কাছে ফিরে এলেন ড. সুনারিল।

'আমাকে কি করতে হবে?' কর্নেলকে জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন ফয়সল। 'ড. সুনারিল যদি টক্সিক অসুস্থতায় আক্রান্ত লোকজনের দেখা পেয়ে যান?'

'অত কথা তোমাকে ভাবতে হবে না,' বললেন কর্নেল। 'যেখানে যা খুশি দেখে বেড়াক ওরা, ফেরার পথে প্লেনটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পড়লে কার কি করার আছে?'

মিশর থেকে নাইজেরিয়া আসার পথে নুমার এক্সিকিউটিভ জেটে ঢুলছে রানা. কফির দুটো মগ হাতে এগিয়ে এলেন রেডক্লিফ।

সিধে হয়ে বসে কফির কাপে চুমুক দিল রানা, ওর প্রশ্ন শুনে রেডক্লিফ বললেন, 'ঠিক পোর্ট হার্টকোর্টে নয়, উপকূল থেকে দু'শো কিলোমিটার দূরে আমাদের একটা রিসার্চ শিপে অপেক্ষা করছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।'

'আপনি অনেক কথাই চেপে যাচ্ছেন,' পিছন থেকে অভিযোগ করল মুরল্যাণ্ড।

রানার পাশের সীটে বসে পড়লেন রেডক্লিফ। 'অ্যাডমিরালের মনে কি আছে সত্যি আমি জানি না, তবে সন্দেহ করছি সারা দুনিয়ার কোরাল রীফ নিয়ে নুমার মেরিন বায়োলজিস্টরা যে স্টাডি চালিয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে।'

'ওই স্টাডি সম্পর্কে জানি আমি,' বলল রানা। 'যদিও ফলাফলটা জানি না, তার আগেই ববি আর আমি মিশরে চলে আসি।'

'সার কথা হলো, সমস্ত রীফ বিপদের মধ্যে আছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য গতিতে,' বললেন রেডক্লিফ। 'মেরিন বিজ্ঞানীদের মধ্যে এটাই এখন প্রধান আলোচ্য বিষয়।'

'ঠিক কোন কোন সাগর নিয়ে আলোচনা হচ্ছে?'

'বলুন কোন সাগর-মহাসাগর নিয়ে আলোচনা হচ্ছে না। ক্যারিবিয়ানের ফ্লোরিডা কী থেকে ত্রিনিদাদ, প্যাসিফিকের হাওয়াই থেকে ইন্দোনেশিয়া, রেড সী, আফ্রিকান উপকূল, ভারত মহাসাগরে বাংলাদেশ…'

'ক্ষয়ের মাত্রা সবখানে সমান?' জানতে চাইল রানা।

মাথা নাড়লেন রেডক্লিফ। 'না, এলাকা ভেদে এক এক রকম। সবচেয়ে বেশি নষ্ট হচ্ছে পশ্চিম আফ্রিকান কোস্ট।'

'কোরাল রীফ একটা নিয়ম ধরে ক্ষয়ে যায়, তারপর আবার ফিরে পায় স্বাস্থ্য, কাজেই এর মধ্যে উদ্বিগ্ন হবার কি আছে?'

'উদ্বেগের কারণ মাত্রা। এর আগে এই হারে ক্ষয় হতে দেখা যায়নি।'

'কারণ সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুটো কারণ। একটা হলো গরম পানি। সী কারেন্ট নিয়মিত বদলায়, সেই নিয়ম ধরে বাড়ে ওয়াটার টেমপারেচার। আর পানি গরম হলে খুদে কোরাল পলিপ অ্যালজি ছাড়ে, বা বমি করে– কোরাল পলিপের খাদ্য ওটা।'

'পলিপ তো হলো টিউব আকৃতির খুদে শয়তান, ওগুলোর অবশিষ্ট কঙ্কাল থেকে তৈরি হয় রীফ, আমাদের ভাষায় প্রবাল-প্রাচীর।'

'ভেরি গুড, মি. রানা।'

'কোরাল সম্পর্কে এখানেই আমার জ্ঞানের সমাপ্তি,' স্বীকার করল রানা।

কোরাল পলিপের জীবনমরণ সংগ্রাম পত্রিকার হেডিং হয় না কখনও।'

'আ. শেম,' বললেন রেডক্লিফ। 'বিশেষ করে আমরা যখন জানি যে কোরালের পরিবর্তন থেকে পরিষ্কার আঁচ পাওয়া যায় ভবিষ্যতে সাগরের মতিগতি কি হবে, কি দাঁড়াবে আবহাওয়ার হাল-হকিকত– কোরালের এই পরিবর্তনকে ব্যারোমিটার বলা যেতে পারে।'

'বেশ, পলিপ অ্যালজি বা শ্যাওলা পরিত্যাগ করে– তারপর?'

'অ্যালজি যেহেতু পুষ্টি, পলিপকে খাদ্যপ্রাণ যোগায়, বিভিন্ন রঙ উপহার দেয়,' বলে যাচ্ছেন রেডক্লিফ, 'ওটার অভাব নিষ্প্রাণ, রঙবিহীন করে তোলে কোরালকে– এই অবস্থাকে ব্লিচিং বলা হয়।'

'পানি ঠাণ্ডা থাকলে এ ঘটনা প্রায় ঘটেই না।'

রানার দিকে তাকালেন রেডক্লিফ। 'এ-সব কেন আপনাকে বলছি, সবই যদি জানা থাকে আপনার?'

'গুরুত্বপূর্ণ কিছু শুনতে পাবার আশায় অপেক্ষা করছি আমি,' বলল রানা। 'আপনি দ্বিতীয় একটা কারণের কথা বলেছেন।'

'নতুন একটা হুমকি দেখা দিয়েছে,' বললেন রেডক্লিফ। 'অকস্মাৎ বিপুল পরিমাণে সবুজ অ্যালজি আর সীউইডের আবির্ভাব ঘটেছে, রীফগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে লাগামছাড়া প্লেগের মত।'

'এক সেকেণ্ড। আপনি বলছেন কোরাল মারা যাচ্ছে অ্যালজি ত্যাগ করায়, অথচ ওই অ্যালজিই ওটাকে গ্রাস করে ফেলছে?'

'গরম পানির আরেকটা কাজ হলো, অ্যালজি উৎপাদনে সাহায্য করা, হঠাৎ উৎপাদনের মাত্রা এত বেড়ে গেছে যে কোরালে সূর্যের আলো পৌঁছুতে পারছে না। বলা যায়, চাপা দিয়ে মেরে ফেলছে।'

মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা। 'আশা করা যায় পানি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তা ঘটেনি,' বললেন রেডক্লিফ। 'অন্তত সাউথ হেমিসফেয়ারে ঘটেনি। তাছাড়া, জানা কথা, আগামী দশকে পানির তাপমাত্রা কমার কোন আশা নেই।'

'গ্রীন হাউসের প্রতিক্রিয়া?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটা সম্ভাবনা তো বটেই। পলিউশনও অন্যতম কারণ হতে পারে।'

'যদিও আপনার কাছে নিরেট কোন প্রমাণ নেই?'

'আমার বা নুমার সমুদ্র-বিজ্ঞানীদের সব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই।'

'তবু, নিজস্ব একটা ধারণা?'

'শত শত বছর ধরে নর্দমা থেকে দূষিত পানি, আবর্জনা আর টক্সিক কেমিকেল ফেলা হয়েছে সাগরে; সাগরের সূক্ষ্ম কেমিকেল ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে গেছে। সাগর উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, এবং তার চড়া মাশুল দিতে হবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে।'

এরকম গম্ভীর হতে রেডক্লিফকে আগে কখনও দেখেনি রানা। 'এতটা খারাপ?'

'আমার ধারণা পয়েন্ট অব নো রিটার্ন ছাড়িয়ে এসেছি আমরা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বা আমার বস রাহাত খান কি ভাবছেন জানি না, তবে ওঁরা যে আমাদেরকে দুনিয়ার সব সাগরকে বিশুদ্ধ করার দায়িত্ব নিতে বলবেন না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

হেসে ফেললেন রেডক্লিফ। 'না, আপনার সঙ্গে আমি একমত।'

দু'জনেই ওরা মারাত্মক ভুল করছে। যদি জানতে পারত অ্যাডমিরালের মনে কি আছে, পাইলটকে হুমকি দিয়ে বলত প্লেন ঘুরিয়ে নাও, কায়রোয় ফিরে যেতে চাই আমরা।

পোর্ট হার্টকোর্ট থেকে হেলিকপ্টারে চড়ে রওনা হলো ওরা, গালফ অব গিনির ওপর দিয়ে উড়ে চল্লিশ মিনিটে চলে এল নুমার রিসার্চ ভেসেল ওয়াণ্ডার-এর ওপর। ওয়াণ্ডার সম্পর্কে সব জানে রানা ও মুরল্যাণ্ড– তৈরি করতে খরচ পড়েছে আশি মিলিয়ন ডলার, একশো বিশ মিটার লম্বা; সফিসটিকেটেড সাইজমিক, সোনার ও ব্যাথিমেট্রিক সিস্টেমে বোঝাই।

কপ্টার থেকে নেমে একটা মইয়ের দিকে এগোল রানা, উঠে গেছে একটা মেরিন ল্যাবরেটরির দিকে। পাশাপাশি অনেক কাউন্টার দেখা গেল, সবগুলোয় কেমিকেল অ্যাপারাটাস ভর্তি। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল কনফারেন্স রুমে।

রানার দিকে পিছন ফিরে একটা প্রজেকশন স্ক্রীনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক ভদ্রলোক, স্ক্রীনে ফুটে ওঠা গ্রাফিক ডায়াগ্রাম গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখছেন। প্রৌঢ়ই বলা যায়, রানার চেয়ে অন্তত বিশ বছরের বড় হবেন। অত্যন্ত লম্বা তিনি, গায়ের রঙ শ্যামলা, পিছন থেকে দেখে ভারতীয় বা বাংলাদেশী বলে সন্দেহ হলো।

কনফারেন্স রুমে আরও এক ভদ্রলোক রয়েছেন। স্মার্ট, সুদর্শন, চেহারায় কর্তৃত্বের ভাবটুকু স্পষ্ট; টেবিলের কিনারায় একটা হাত রেখে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে একটু কাত হয়ে আছেন, অপর হাতে না ধরানো চুরুট। নুমার ডিরেক্টর, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। 'রানা! ববি! কংগ্রাচুলেশন্স, ভাবতেই পারিনি এত তাড়াতাড়ি ফিউনারাল বার্জটা পেয়ে যাবে তোমরা। ওয়েল ডান, রানা। ওয়েল ডান, ববি।'

সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'নাইল থেকে এভাবে তুলে আনা হলো···কারণটা কি, অ্যাডমিরাল?'

অ্যাডমিরাল হাসলেন, রানার সরাসরি প্রশ্ন করার এই স্বভাব সম্পর্কে জানেন তিনি। 'তোমাদেরকে আমি নাইজার নদীতে বেড়াতে পাঠাচ্ছি। বিলাসবহুল একটা ইয়টে।'

'কখন?'

'ভোরে রওনা হচ্ছ তোমরা।'

'ওখানে গিয়ে কি করতে হবে আমাদের?'

লম্বা ভদ্রলোকের দিকে ঘুরলেন অ্যাডমিরাল। 'আগের কাজ আগে। এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। ড. অজিত রায়, লাগুনা বীচ-এর গোল্ড উইন মেরিন সায়েন্স

ল্যাবে আছেন উনি, চীফ ওশেন টক্সিকোলজিস্ট।'

'ভায়ারা,' ভরাট গলায় বললেন অজিত রায়, 'আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে সত্যি আমি আনন্দিত। রাহাত খান ও অ্যাডমিরাল আমার পুরানো বন্ধু।' করমর্দনের জন্যে হাত বাড়ালেন তিনি।

ফোনের রিসিভার তুলে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন হ্যামিলটন।

মৃদু কণ্ঠে রানা বলল, 'নিশ্চয়ই আমাদেরকে পচা কোন কাজে পাঠাচ্ছেন আপনি?'

'শুনলেই বুঝতে পারবে,' বলে অজিত রায়ের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল।

স্ক্রীনের রিমোট কন্ট্রোলের একটা বোতামে চাপ দিলেন রায় মহাশয়। একটা নদীর রঙিন গতিপথ ফুটে উঠল স্ক্রীনে। 'নাইজার রিভার,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'নাইল আর কঙ্গোর পরেই আফ্রিকার তৃতীয় বৃহত্তম নদী। অদ্ভুত ব্যাপার, সাগর থেকে মাত্র তিনশো কিলোমিটার দূরে গিনি থেকে শুরু হয়েছে ওটা, অথচ প্রথমে উত্তর-পুব, তারপর দক্ষিণে চার হাজার দু'শো কিলোমিটার এগিয়ে নাইজেরিয়া হয়ে আটলান্টিকে পড়েছে। দীর্ঘ চলার পথে মাঝখানে কোথাও, হাইলি টক্সিক পয়জন মিশছে স্রোতের সঙ্গে। স্রোতটা, বলাই বাহুল্য, সাগরে গিয়ে পড়ছে। ফলে বর্ণনার অতীত একটা বিপর্যয় দেখা দিয়েছে...আক্ষরিক অর্থেই কেয়ামত নেমে আসছে দুনিয়ার বুকে।'

রানার সন্দেহ হলো ভুল শুনেছে। 'আবার বলুন, প্লীজ।'

'আমি প্রলাপ বকছি না,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'এ-ব্যাপারে দু'মাস আগে প্রথম আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন জেনারেল রাহাত খান, তোমার বস্। সেই থেকে তথ্য সংগ্রহ করছি আমি। কাল আমি রিপোর্ট করেছি তাঁকে, সেই সঙ্গে জানালাম তোমাকে আমার দরকার।' পকেটে হাত ভরলেন তিনি। 'তোমার বস্ একটা বার্তা পাঠিয়েছেন।'

কাগজটা নিয়ে পড়ল রানা। বিসিআই চীফ মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান লিখেছেন, 'পরিস্থিতি ভয়াবহ। অ্যাডমিরাল তোমাকে ব্রিফ করবেন। তোমার ছুটি বাতিল করা হলো, বিসিআই-এর প্রতিনিধি হিসেবে নুমার সঙ্গে কাজ করবে তুমি। শুভেচ্ছা।'

'পশ্চিম আফ্রিকার সাগর আক্ষরিক অর্থেই মারা যাচ্ছে,' রানা মুখ তুলে তাকাতেই শুরু করলেন অ্যাডমিরাল। 'অজ্ঞাত কনটামিন্যান্ট-এর কারণে মারাত্মক একটা প্লেগ ছড়িয়ে পড়ছে। চেইন রিয়্যাকশনের মত দ্রুত অবনতি ঘটছে পরিস্থিতির, প্রতিটি জলজ প্রাণ ধ্বংস হয়ে যাবার হুমকি দেখা দিয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে দুনিয়ার আবহাওয়া স্থায়ীভাবে বদলে যাবে...' শুরু করলেন রেডক্লিফ।

'তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার সময় পাব না,' তাঁকে বাধা দিয়ে মন্তব্য করলেন অ্যাডমিরাল। 'তার আগেই মাটির ওপর সব ধরনের লাইফ ফর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে– তার মধ্যে আমরা মানুষও থাকব।'

মুরল্যাণ্ড মাথা চুলকে বলল, 'তথ্যে কোন ভুলভাল নেই তো? মানে, অতিরঞ্জিত কিংবা...'

'কংগ্রেসকে যখন জানালাম, ওরাও বলল আমি নাকি অতিরঞ্জিত করছি!' নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলেও, দেখা গেল একটু একটু কাঁপছেন হ্যামিলটন। 'বলে কিনা সাগর মরে গেলে কার কি এসে যায়! বাই গড, এসে যায় বৈকি, আমার এসে যায়!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, অ্যাডমিরালকে আগে কখনও এরকম ভাবাবেগে আক্রান্ত হতে দেখেনি ও। 'দুনিয়ার সব নদীতেই দূষিত আবর্জনা ফেলা হয়,' শান্ত সুরে বলল ও। 'নাইজার নদীর দূষণে আলাদা কি আছে?'

'ওই দূষণ যে জিনিসটা তৈরি করছে তাকে বলা হয় রেড টাইড। নাইজার নদীতে রেড টাইড রিপ্রডিউস্‌ড্‌ হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে ভয়াবহ গতিতে।'

'আপনারা সবাই ডাইভার,' এবার মুখ খুললেন অজিত রায়। 'কাজেই সম্ভবত জানেন যে রেড টাইডের কারণ হলো মাইক্রোস্কোপিক ক্রিয়েচার, নাম ডাইনোফ্ল্যাজিলেট– খুদে অর্গানিজম, রেড পিগমেণ্ট বহন করে, সেজন্যেই সংখ্যায় বাড়তে শুরু করলে পানিতে লালচে-খয়েরি রঙ ধরে।'

রিমোট কন্ট্রোলে আবার চাপ দিলেন রায়, বলে চলেছেন, 'রেড টাইডের কথা প্রাচীন কালেও শোনা গেছে। 'আপনাদেব মুসা নবী নীলনদকে রক্তে রূপান্তর করেছিলেন। সাগর লাল হয়ে যাবার কথা হোমারও উল্লেখ করেছেন। এমনকি ডারউইনও। আধুনিককালেও এ ঘটনা সারা দুনিয়ার সাগরে বারবার ঘটতে দেখা গেছে। সম্প্রতি মেক্সিকোর পশ্চিম উপকূলের পানি লাল ও আঠাল হয়ে উঠেছিল। ওই রেড টাইড আসলে ভয়ঙ্কর, কয়েক বিলিয়ন মাছ, সেলফিশ আর কাছিম মেরে ফেলে। এমনকি শামুকও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। দু'শো মাইল সৈকতে মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়, অবশ্য তার আগেই বিষাক্ত মাছ খেয়ে কয়েকশো স্থানীয় লোক আর ট্যুরিস্ট মারা যায়।'

'কিন্তু আমি তো রেড টাইডে স্কুবা নিয়ে ডাইভ দিয়েছি,' বলল রানা। 'কোন ক্ষতি হয়নি।'

'ভাগ্য ভাল যে অনেক রকম রেড টাইড আছে, আপনি ক্ষতিকর নয় এমন একটায় ডুব দিয়েছিলেন,' ব্যাখ্যা করলেন ড. রায়। 'তবে নতুন একটা পরিবর্তনশীল স্পিশীজ পাওয়া গেছে, যেটা অত্যন্ত মারাত্মক বায়োলজিকাল টক্সিন প্রডিউস করে। ওটার সঙ্গে সামান্যতম সংস্পর্শে এলেও জলজ কোন প্রাণের বাঁচার উপায় নেই। মাত্র কয়েক গ্রাম সমান ভাগে ভাগ করে খাইয়ে দিতে পারলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে মেরে ফেলা সম্ভব।'

'এতটাই শক্তিশালী?'

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর রায়। 'এতটাই।'

'এর আরও মারাত্মক দিক আছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'টক্সিন কি ক্ষতি করতে পারে, তা তো শুনলেই। ওই খুদে ডাইনোফ্ল্যাজিলেট পরস্পরকে হজম করে ফেলে, যার ফলে পানিতে অক্সিজেন কমে যায়, অবশিষ্ট অ্যালজি ও মাছ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়।'

'নতুন অক্সিজেনের সত্তর ভাগ যোগান দেয় ডায়াটম– অ্যালজি বা শ্যাওলার মত খুদে লাইফ ফর্ম, যেগুলো সাগরে বাস করে। বাকি ত্রিশ ভাগ আসে মাটিতে দাঁড়ানো গাছপালা থেকে। ডাইনোফ্ল্যাজিলেটের তৈরি রেড টাইড ডায়াটমকে মেরে ফেলে। ডায়াটম নেই তো অক্সিজেনও নেই।'

'বলছেন পরস্পরকে খেয়ে ফেলে। এভাবে অস্তিত্ব হারাতে পারে না?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

মাথা নাড়লেন ডক্টর রায়। 'খায়, আবার জন্মও দেয়, রেটটা হলো একটা মরলে দশটা পয়দা হয়।'

'কোন ধারণা করা গেছে, রেড টাইড ঠিক কোত্থেকে শুরু হচ্ছে?' রানার প্রশ্ন।

'এই নতুন ধরনের ডাইনোফ্ল্যাজিলেট বিপুল পরিমাণে কেন তৈরি হচ্ছে তার কারণ জানা সম্ভব হয়নি। তবে আমরা ধারণা করছি যে নাইজার নদী থেকে কোন ধরনের কনটামিন্যাণ্ট বেরুচ্ছে, বেরিয়ে রিপ্রোডাকশন শুরু করছে।' মাথার চুলে আঙুল চালালেন ডক্টর রায়। 'এই রেড টাইড যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, দুনিয়ার সমস্ত সাগরকে একটা লাল চাদরের মত ঢেকে ফেলবে, ফলে অক্সিজেন সাপ্লাই এতটাই কমে যাবে যে পৃথিবীতে প্রাণী বলে কিছু টিকতে পারবে না।'

বিপদটা যে কী ভয়ঙ্কর, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করছে ওরা। মুরল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'কেমিকেল অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে ওগুলোকে ধ্বংস করা যায় না?'

'পেস্টিসাইড?' মাথা নাড়লেন ডক্টর রায়। 'তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে গড়াতে পারে। সবচেয়ে ভাল শুরুতেই ওটার মাথা কেটে ফেলে দেয়া।'

'বিপদটার কোনও সময়-সীমা আছে কি?' জানতে চাইল রানা।

'আগামী চার মাসের মধ্যে যদি কনটামিনেশনের প্রবাহ থামানো না যায়, অনেক দেরি হয়ে যাবে। ততদিনে এত বেশি ছড়িয়ে পড়বে যে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।' বোতামে চাপ দিলেন তিনি, স্ক্রীনে রঙিন গ্রাফ ফুটে উঠল। 'ইতিমধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠবে ডাইনোফ্লাজিলেট, নিজের খোরাক নিজেই যোগাতে পারবে, নাইজার থেকে হজম করা বিষ সন্তানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে। কম্পিউটরের হিসেবে অক্সিজেনের অভাবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে শুরু করবে আট মাসের মধ্যে। বাচ্চাদের ফুসফুস দুর্বল, প্রথমে যাবে তারা। অক্সিজেনের অভাবে কাঁদতে পারবে না ওরা, নীল হয়ে যাবে গায়ের রঙ, তারপর কোমায় চলে যাবে। যারা শেষদিকে মারা যাবে, ব্যাপারটা তাদের জন্যে সুখকর হবে না।'

মুরল্যাণ্ডের চেহারায় অবিশ্বাস ফুটে উঠল। 'অক্সিজেনের অভাবে দুনিয়ার বুক থেকে সমস্ত প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, এ আমি চিন্তাই করতে পারছি না।'

পায়চারি শুরু করল রানা। 'আমরা কি করব? নাইজার নদীর পানি নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করে কনটামিনেশন-এর উৎস খুঁজব?'

মাথা ঝাঁকালেন হ্যামিলটন। 'ইতিমধ্যে এখানে নুমার বিজ্ঞানীরা এমন কিছু একটা আবিষ্কারের চেষ্টা চালাবে যার সাহায্যে রেড টাইডকে নিউট্রালাইজ করা সম্ভব হয়।'

দেয়ালে ঝোলানো নাইজার নদীর সামনে থামল রানা। 'কিন্তু আমরা যদি

উৎসটা নাইজেরিয়ায় না পাই?'

'সেক্ষেত্রে আরও সামনে এগোতে হবে তোমাদের,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'প্রয়োজন হলে সেই মালি পর্যন্ত।'

'দেশগুলোর রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বলুন।'

'রাজনৈতিক বা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভাল নয়,' সংক্ষেপে বললেন হ্যামিলটন।

'ভাল নয় মানে কি?'

'খুব খারাপ। বেনিন শাসন করছেন একজন ডিকটেটর, সন্ত্রাসই তাঁর একমাত্র পুঁজি। নদীর ওপারে নাইজার, ওখানে গেরিলারা খুন-খারাবিতে মেতে আছে। আর মালির প্রেসিডেন্ট তাহির লোক ভাল হলেও, জেনারেল পিয়েত্রো ভিনসেন্টের হাতের পুতুল তিনি। তিন সদস্যের সুপ্রীম মিলিটারি কাউন্সিলের হেড ভিনসেন্ট, অত্যাচার আর লুটপাট করে দেশটাকে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলছেন।'

আরও প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা হলো। রানার প্রশ্নের উত্তরে অ্যাডমিরাল জানালেন, স্যাটেলাইট সেনসর ব্যবহারের চিন্তা বাতিল করে দেয়া হয়েছে কাজটা যথেষ্ট নিখুঁতভাবে করা যাবে না বলে। ওয়াগুারে রয়েছে প্রথমশ্রেণীর ল্যাব, ওটাকে পাঠাতে অসুবিধে কি? উত্তর এল, পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু নদীর মুখে পৌঁছুতে পারেনি, নাইজেরিয়ান গানবোট ডুবিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়ায় ফিরে আসতে হয়েছে। কাজেই, কাজটা করতে হবে ছোট একটা বোট নিয়ে, সরু নদীপথে ও অগভীর পানিতে যাতে কোন অসুবিধে না হয়। বিলাসবহুল ইয়ট নিয়ে গেলে ওদের উদ্দেশ্যও গোপন রাখা সম্ভব হবে। কাগজ-পত্র আগেই তৈরি করা হয়েছে, ওরা যাবে তিনজন ফ্রেঞ্চ শিল্পপতি হিসেবে, পশ্চিম আফ্রিকায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে চায়। সবশেষে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'ইয়টটা একবার দেখো তোমরা। দেখলে বুঝতে পারবে কেন ওরা তোমাদেরকে সন্দেহ করবে না।'

বিপুল গতি, সৌন্দর্য ও কেতা, তার সঙ্গে আরাম-আয়েশ এবং মার্কিন ষষ্ঠ নৌ-বহরকে কুপোকাত করার মত যথেষ্ট ফায়ারপাওয়ার চাইলে সী কুইনকেই দরকার রানার। কাঠামোয় তীক্ষ্ণ ও পিচ্ছিল একটা ভাব আছে, এঞ্জিনগুলোকে দেখে মনে হবে হিংস্র বাঘ, আড়ালে লুকিয়ে আছে অবিশ্বাস্য যত মারণাস্ত্র, সব দেখে রানা যেন বিক্রি হয়ে গেল। ফাইবারগ্লাস আর ইস্পাত দিয়ে তৈরি একটা মাস্টারপীস, সন্দেহ নেই। লুসিয়ানা বোটইয়ার্ডে অত্যন্ত গোপনে নুমার জন্যে এই একটাই বানানো হয়েছে। আঠারো মিটার দৈর্ঘ্য, খোলের তলা প্রায় সমতল হওয়ায় পানির নিচে মাত্র ১.৫ মিটার ডোবে। শক্তি যোগায় তিনটে ভি-টুয়েলভ টারবো ডিজেল এঞ্জিন, গতি এনে দেয় অবিশ্বাস্য সত্তর নট।

সুপার স্পোর্টস ইয়টের হেলম ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, নাইজার ডেলটার হালকা নীল পানি কেটে ত্রিশ নট গতিতে এগোচ্ছে। নদীর সামনের দিকে চোখ ওর, দু'পাশের তীর দ্রুতবেগে পিছিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মধ্যে চোখ নামিয়ে চার্ট আর

ডেপথ-সাউণ্ডারের ডিজিটাল সংখ্যায় দৃষ্টি বুলাচ্ছে। ইতিমধ্যে একটা পেট্রল বোটকে পাশ কাটিয়েছে ওরা, ক্রুরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল, শুভেচ্ছা জানিয়ে হাতও নেড়েছে। আকাশে একটা সামরিক হেলিকপ্টারও দেখা গেছে, বার কয়েক চক্কর দিয়ে সন্দেহজনক কিছু না দেখে ফিরে গেছে সেটাও। ফ্রান্সের তৈরি মিরেজ ছিল ওটা। না, এখন পর্যন্ত কোন সমস্যা দেখা দেয়নি।

ভেতরে প্রচুর জায়গা, একটা ল্যাবে বসে আছেন জর্জ রেডক্লিফ। মহাশূন্য অভিযানের প্রয়োজনে নাসা-র ডেভেলপ করা প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে সাজানো হয়েছে ল্যাবটা, সবই হাইলি সফিসটিকেটেড। এখানে শুধু যে পানির নমুনা পরীক্ষা করা যাবে তা নয়, সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করার জন্যে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নুমার অন্য একটা টীমের কাছেও পাঠানো যাবে। তারা কম্পিউটর ডাটা বেস নিয়ে অপেক্ষা করছে।

এঞ্জিন আর অস্ত্রশস্ত্র মুরল্যাণ্ডের দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে হেডসেট পরে এঞ্জিন রূমে বসে রয়েছে সে, পুরানো দিনের জাজ শুনছে। হাত দুটো ব্যস্ত, পোর্টেবল রকেট লঞ্চার আর মিসাইলের বাক্স খুলছে সে। দা রেপিয়ার নামে নতুন এই অস্ত্রের ডিজাইন এমনভাবে করা হয়েছে যে সাবসনিক এয়ারক্রাফট, সীগোয়িং ভেসেল, ট্যাংক বা কংক্রিটের পাঁচিল চুরমার করে দেয়া যায়। ফায়ার করা যায় কাঁধ থেকে, তেপায়াও ব্যবহার করা যেতে পারে। লঞ্চার আর গাইডেন্স ইউনিট অ্যাসেম্বল করার পর টিউবগুলোয় মিসাইল ভরল মুরল্যাণ্ড। এরপর মনোযোগ দিল রাইফেল আর হ্যাণ্ডগানে। সবশেষে খুলল গ্রেনেডের বাক্স। কাজ বাকি রাখতে পছন্দ করে না সে, অটোমেটিক গ্রেনেড লঞ্চারে গোটা চারেক গ্রেনেডও ভরে রাখল।

ইয়ট ছুটে চলেছে। ক্যামেরুন হাইল্যাণ্ড ছাড়িয়ে এল ওরা। শুরু হলো রেইন ফরেস্ট, গাছপালার ফাঁকে সাদাটে কুয়াশা দেখা গেল। মাঝে মধ্যে দু'একটা গ্রাম বা ছোট শহর পিছিয়ে গেল দ্রুত। নদীতে জলযান বলতে বেশিরভাগই ভেলা। ফেরিবোটও দেখা গেল দু'একটা, বোঝার ভারে যে-কোন মুহূর্তে ডুবে যাবে বলে মনে হলো। রানা খুব সতর্ক হয়ে আছে, প্রতিটি বাঁক ঘোরার আগে ধরে নিচ্ছে এবার ওদেরকে বাধা দেয়া হবে।

দুপুরের দিকে এক হাজার চারশো চার মিটার লম্বা বিখ্যাত ব্রিজটাকে পিছনে ফেলে এল ওরা। মার্কেট সিটি ওনিতশা আর এগ্রিকালচারাল টাউন আসাবাকে এক করেছে এই সেতু। ওনিতশার তীরে রোমান ক্যাথলিক চার্চ দেখা গেল। ডকে অসংখ্য জাহাজ আর বোট গিজগিজ করছে। ক্লান্ত বোধ করছে রানা, একটানা ছ'ঘণ্টা হলো হেলমে রয়েছে ও।

বিয়ার আর স্যাণ্ডউইচ নিয়ে উদয় হলো মুরল্যাণ্ড। 'ভাবলাম তোমার খানিকটা পুষ্টি দরকার। ওয়াণ্ডার থেকে রওনা হবার পর তুমি কিছু মুখে দাওনি।'

'ধন্যবাদ, ববি। এঞ্জিনের আওয়াজে পেটের কান্না কানে ঢোকেনি।'

'সন্দেহজনক কিছু দেখলে নাকি?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

মাথা নাড়ল রানা। 'প্লেন আর পেট্রল বোট এসেছিল, ফিরে গেছে।'

স্টার্নে ফ্রান্সের পতাকা উড়ছে, সেদিকে তাকিয়ে হাসল মুরল্যাণ্ড। 'ধোঁকা

দেয়ার ভাল বুদ্ধি বের করেছেন অ্যাডমিরাল।'

'তুমি হেলমটা একটু ধরো, আমি দেখে আসি রেডক্লিফ কি করছেন।'

সিঁড়ি বেয়ে ল্যাবে নেমে এল রানা। ওকে দেখে তিক্ত হাসি ফুটল রেডক্লিফের ঠোঁটে, বললেন, 'দুনিয়ার সব রকম দূষিত পদার্থ রয়েছে এই শালার নদীতে।'

'রেড টাইড তাহলে...'

'আমাদের স্টাডি বলছে রেড টাইডের উৎস আরও উজানে কোথাও।' রানাকে নিয়ে একজোড়া চৌকো, বাক্স আকৃতির ইউনিটের কাছে চলে এলেন রেডক্লিফ। ছোট টিভি সেটের মত দেখতে, তবে যেখানে স্ক্রীন থাকার কথা সেখানে দরজা রয়েছে। 'প্রথমটা গ্যাস ক্রোমটোগ্রাফ/মাস স্পেকট্রোমিটার–ন্যাস্টি গ্লব চেনার জন্যে। নদীর পানি ভেতরে ঢোকাই, সিস্টেমটা এরপর নিজেই পরীক্ষা করে। রেজাল্ট দেখা যাবে কম্পিউটর স্ক্রীনে। এই ইনস্ট্রুমেন্ট সলভেন্ট, পেস্টিসাইড, পিসিবি, ডায়োক্সিন ছাড়াও অন্যান্য অনেক ড্রাগ ও কেমিকেল কম্পাউণ্ড আইডেনটিফাই করতে পারে। আমি আশা করছি রেড টাইডকে যে কেমিকেল কম্পাউণ্ড প্ররোচিত করছে বা অস্থির করে তুলছে সেটাকেও চিহ্নিত করতে পারবে।'

'আর যদি কনটামিন্যাণ্ট মেটাল হয়?'

'এখানেই এসে পড়ে প্লাজমা/মাস স্পেকট্রোমিটারের কথা,' বললেন রেডক্লিফ, ইঙ্গিতে দ্বিতীয় ইনস্ট্রুমেণ্টটা দেখালেন। 'এটার কাজ হলো নিজে থেকে সমস্ত মেটাল ও অন্যান্য এলিমেণ্ট আইডেনটিফাই করা।'

'কি বলছে ওটা?'

'বলছে তামা থেকে পারদ, সোনা থেকে রূপো, এমনকি ইউরেনিয়ামও রয়েছে নাইজারের পানিতে। এই ইনস্ট্রুমেণ্টে বা আমার চোখে হয়তো ধরা পড়ল না, তাই পানির নমুনা সহ আমার রেজাল্ট নুমার রিসার্চারদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে, তারা নতুন করে পরীক্ষা করবে।'

'দায়ী টক্সিক কম্পাউণ্ড সম্পর্কে কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে?' জানতে চাইল রানা।

একটা কম্পিউটর রিড-আউট শিট হাতে নিয়ে রেডক্লিফ বললেন, 'টক্সিক আসলে একটা আপেক্ষিক টার্ম। কেমিস্ট্রির জগতে টক্সিক কম্পাউণ্ড বলে কিছু নেই, আছে শুধু টক্সিক লেভেল।'

'তো?'

'মেটাল ও অর্গানিক, দু'ধরনেরই অসংখ্য কনটামিন্যাণ্ট পেয়েছি। পেস্টিসাইডের মাত্রা সাজ্ঘাতিক। আমেরিকা বা ইউরোপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে অথচ তৃতীয় বিশ্বে এ-সব কীটনাশক হরদম ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে সিনথেটিক কেমিকেল পলিউট্যাণ্ট, যেটা ডাইনোফ্ল্যাজিলেটকে উন্মাদ করে দেয়ার জন্যে দায়ী, এখনও আমি আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে পারিনি। এই মুহূর্তে এ-কথাও বলতে পারব না যে কিসের পিছনে ছুটছি।'

'বোঝাই যাচ্ছে, কাজটা সহজ নয়।'

'সহজ? নদীর পানিতে কত রকমের কেমিকেল আছে, ধারণা করতে পারেন?

মানুষের তৈরি পরিচিত কেমিকেল কম্পাউণ্ডের সংখ্যাই সাত মিলিয়নের বেশি, প্রতি বছর শুধু আমেরিকান কেমিস্টরা ছ'হাজার করে নতুন কেমিকেল কম্পাউণ্ড তৈরি করছে।'

'সবগুলো টক্সিক হতে পারে না।'

'একটা বিশেষ মাত্রার টক্সিক উপাদান সবগুলোতেই আছে। যথেষ্ট পরিমাণে যা কিছু গেলা হয়, শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা হয় বা ইনজেক্ট করা হয় তা-ই টক্সিক। এমনকি বেশি খেয়ে ফেললে পানিও মারাত্মক।'

মাথায় হাত দিল রানা। 'এ তো দেখছি সাংঘাতিক জটিল একটা ব্যাপার।'

'হ্যাঁ, জটিল। আমি শুধু জানি, যে-পথ দিয়ে এসেছি সেই পথের কোথাও গজব সৃষ্টিকারী প্লেগ উপুড় করা হয়নি। শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ভিলেন মাইক্রোঅর্গানিজম নয়।'

'কি করে বুঝলেন?'

'নদীর পানির নমুনা স্টেরিলাইজ করে। পানি থেকে ব্যাকটেরিয়া আলাদা করে নেয়ার পরও ডাইনোফ্ল্যাজিলেট রিপ্রোডাকশন বন্ধ করেনি।'

পাঁচ

পরদিন দুপুরে প্রথম বিপদের মুখোমুখি হলো ওরা। নাইজেরিয়া সীমান্ত পিছনে ফেলে এসেছে সী কুইন, নদীর এমন একটা বিস্তৃতিতে রয়েছে ওরা যার এক দিকে বেনিন, অপর দিকে নাইজার। দু'পাশেই অবশ্য ঘন বনভূমি।

হেলমে রয়েছে মুরল্যাণ্ড, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। তার কাঁধের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, চোখে বিনকিউলার। সামনের বাঁকে উদয় হলো প্রতিপক্ষ। মুরল্যাণ্ডও দেখতে পেল। জিজ্ঞেস করল, 'পতাকা চিনতে পারছ?'

'বেনিন,' বলল রানা। 'একজোড়া বোট। রাশিয়ায় তৈরি, অ্যাটাক ক্রাফট, থারটি-মিলিমিটার কামান আছে। রেট অব ফায়ার প্রতি মিনিটে পাঁচশো রাউণ্ডের মত।'

'কামানগুলো দেখা যাচ্ছে সরাসরি আমাদের দিকে তাক করা,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তারমানে রুটিন পেট্রল নয়।'

'তোমার সন্দেহ ষোলো আনা সত্যি,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। 'ওরা একটা শকুনও পাঠিয়েছে।'

'স্পাই বলে ধরে নিয়ে যাবে না তো?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'ভাগ্য সহায়তা করলে কপ্টারটাকে ফেলে দিতে পারি, কিন্তু একসঙ্গে তিনটে ঘায়েল করা সম্ভব নয়।'

ককপিটে ঢুকলেন রেডক্লিফ। 'ওরা সম্ভবত ফ্রেঞ্চ জানে। কে কথা বলবে?'

'আমি,' বলল রানা। 'কথা যাই হোক, বিপদের জন্যে তৈরি থাকতে হবে।'

প্রথম গানবোটের ব্রিজে দাঁড়িয়ে দু'আঙুলে ধরে চওড়া গোঁফে বার কয়েক মোচড়

দিলেন অ্যাডমিরাল বেঞ্জামিন বোমা, তারপর আবার চোখে বিনকিউলার তুলে স্পোর্ট ইয়টের দিকে তাকালেন। বেনিন নেভির চীফ তিনি, খাটো বোতল আকৃতির কাঠামো, বয়েস চল্লিশ, দেশের প্রেসিডেন্ট তাঁর ভাই হওয়ায় রিভার ফেরির ডেক হ্যাণ্ড থেকে তিন বছরের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

কমাণ্ডার কারমাইকেল ফাতুলা, গানবোটের স্কিপার, পাশে ও খানিকটা পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বললেন, 'রাজধানী থেকে এসে কমাণ্ড নেয়াটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে, অ্যাডমিরাল।'

'তা আর বলতে,' হাসলেন বোমা। 'এ-ধরনের একটা প্লেজার ক্রাফট উপহার পেলে ভাই আমার আনন্দে আটখানা হবে।' সী কুইন নাইজেরিয়ায় ঢোকার পর থেকে দু'ঘণ্টা অন্তর তাঁর এজেন্টরা ওটার গতিবিধি সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে তাঁকে। ইয়টের বর্ণনা শুনে লোভ হয় তাঁর, মনে মনে প্রার্থনা করছিলেন ওটা যেন বেনিনের জলসীমায় প্রবেশ করে।

'এত দামী ইয়ট নিয়ে আসছে যখন, নিশ্চয়ই খুব প্রভাবশালী লোক হবে ওরা।'

'বেনিনে একমাত্র আমার আর আমার ভাইয়ের কর্তৃত্ব চলে,' গম্ভীর সুরে বললেন অ্যাডমিরাল বোমা। 'ওদেরকে আমরা শত্রুপক্ষের এজেন্ট হিসেবে জানি। আমার কাছে গোপন রিপোর্ট আছে, ওই বিদেশীরা আমাদের জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করতে এসেছে।'

'তারমানে কি, অ্যাডমিরাল, গ্রেফতার করে রাজধানীতে পাঠানো হবে ওঁদেরকে?'

'না। বোটে উঠে প্রথমে তুমি ওদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করবে, তারপর গুলি করবে।'

'স্যার!' কারমাইকেল ফাতুলাকে আতঙ্কিত দেখাল।

'আমার কথার ওপর কথা বলবে না!' সাবধান করে দিলেন বোমা। 'লাশগুলো নদীতে ফেলে দেবে।'

'জ্বী-স্যার, জ্বী-স্যার, আপনি যা বলেন।'

চোখে আবার বিনকিউলার তুললেন অ্যাডমিরাল বোমা। ইয়টটা এখন আর মাত্র দু'শো মিটার দূরে। 'তোমার লোকজনকে পজিশন নিতে বলো। স্পাইদের আমি জানাচ্ছি, সার্চ করার জন্যে বোটে চড়বে তোমরা।'

ফার্স্ট অফিসারের সঙ্গে কথা বললেন কমাণ্ডার ফাতুলা, ফার্স্ট অফিসার বুলহর্নের মাধ্যমে নির্দেশ দিল। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত না, অ্যাডমিরাল,' ফাতুলা বললেন, 'শুধু একজন লোককে দেখা যাচ্ছে হেলমে?'

'ইউরোপিয়ান স্পাইরা মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় নিচে কোথাও পড়ে আছে। এখনও কিছু সন্দেহ করতে পারেনি। গুলি করবে শুধু যদি দেখো যে পালাতে চেষ্টা করছে। বোটটা আমি অক্ষত অবস্থায় পেতে চাই।'

এবার ফাতুলা বিনকিউলার তাক করল রানার ওপর। 'স্যার, হেলমসম্যান আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে, হাত নাড়ছে!'

'হাসতে দাও, একটু পরই সেটা মুছে যাবে।'

গুনগুন করছে রানা।

'কিছু বলছ নাকি হে?' মিসাইল টারিট থেকে জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যাঁ। ও নদীরে, একটা কথাই শুধাই শুধু তোমারে···'

ফরওয়ার্ড কোয়ার্টার থেকে রেডক্লিফ বললেন, 'বো পোর্টস থেকে আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার লাইন অব ফায়ার কি হবে?'

'আপনার টার্গেট আমাদের ডান দিকের বোটটা, আমি বললেই গানারদের ফেলে দেবেন,' বলল রানা।

'হেলিকপ্টার?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'কোথায় সেটা?'

ইয়টের পিছনের আকাশে তাকাল রানা। 'পানি থেকে পঞ্চাশ মিটার ওপরে, একশো মিটার আমাদের পিছনে– থেমে আছে।' চেয়ারের নিচে রয়েছে লঞ্চারটা, নিচের দিকে ঝুঁকে তাতে গ্রেনেড লোড করল ও, তারপর বোটের গতি একেবারে কমিয়ে আনল। হেলিকপ্টারের দিকে খেয়াল নেই ওর, ওটা মুরল্যাণ্ডের সমস্যা। প্রথম গানবোটটা একেবারে কাছে চলে এসেছে, ব্রিজে দাঁড়ানো পেটমোটা লোকটাকে ভাঁড় বলে মনে হলো ওর। লক্ষ করল, গানবোটের সব ক'টা অস্ত্র ওর দিকে তাক করা।

সী কুইন এখন স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলেছে। গানবোট দুটো চলে এসেছে ইয়টের দু'পাশে, কোনটাই পাঁচ মিটারের বেশি দূরে নয়। ককপিট থেকে ক্রুদের দেখতে পেল রানা, হোলস্টারে অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবাই। কারও কাছে রাইফেল নেই।

কাউন্টারে ঝুঁকে চিৎকার করলেন অ্যাডমিরাল বোমা। ইয়ট থামাতে বলছেন তিনি, বলছেন তাঁর লোকজনকে বোটে উঠতে দেয়া হোক। তা না হলে গুলি করা হবে।

নির্দেশ মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রানা। বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। প্লীজ, গুলি করবেন না।'

সী কুইনের ককপিট আর অ্যাডমিরালের গানবোটের পিছনটা একই রেখায় চলে এসেছে। দুটো গানবোটের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছে রানা, লাফ দিয়ে যাতে কেউ সী কুইনে চলে আসতে না পারে। গানবোটের দু'জন ক্রু দুই প্রস্থ রশি ফেলল ইয়টের সামনে ও পিছনের ডেকে। ফাতুলা চিৎকার করে বলল, 'লাইন বাঁধুন!'

'অনেক দূরে,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে, আমি আসছি।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে হেলম ঘোরাতে শুরু করে থ্রটল সামনে ঠেলে দিল ও, গানবোটের পিছনে একশো আশি ডিগ্রী ঘুরে যেতে শুরু করল স্পোর্ট ইয়ট, সিধে হবার সময় দেখা গেল গানবোটের উল্টোদিকের খোলের পাশে চলে এসেছে ওরা। এখন দুটো বোটই সমান্তরাল কোর্সে, বোগুলো ভাটির দিকে তাক করা। সন্তুষ্টচিত্তে লক্ষ করল রানা, ত্রিশ মিলিমিটার কামানগুলো এখন আর নিচু হয়ে সী কুইনের ককপিটে আঘাত করতে পারবে না।

শান্তভাবে অপেক্ষা করছে রানা, ঠোঁটে হাসির রেখা। গানবোটের এঞ্জিন রুমের সঙ্গে মুরল্যাণ্ডের টারিট একই লাইনে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও। এক হাতে হুইল, অপর হাতটা ঢুকে গেল চেয়ারের তলায় রাখা গ্রেনেড লঞ্চারে, হেডসেটের মাইক্রোফোনে চাপা গলায় বলল, 'হেলিকপ্টার সরাসরি সামনে। স্টারবোর্ড সাইডের গানবোট। ইট'স শো টাইম, ফ্রেণ্ডস। লেট'স টেক দেম!'

রানার কথা তখনও শেষ হয়নি, এঞ্জিন রুম টারিটকে ঢেকে রাখা শীল্ড ছেড়ে দিল মুরল্যাণ্ড, একটা রেপিয়ার মিসাইল ছুঁড়ল সরাসরি হেলিকপ্টারের ফুয়েল ট্যাংকে। ফরওয়ার্ড হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এলেন রেডক্লিফ, দুই বগলে দুটো মডিফায়েড এম-সিক্সটিন অটোমেটিক রাইফেল, দু'হাতের আঙুল ঘন ঘন ট্রিগার টানছে, ত্রিশ মিলিমিটার কামানের অপারেটর লোকগুলো কিছু বুঝতে পারার আগেই মারা গেল। রানার লঞ্চার থেকে অ্যাডমিরালের গানবোটের মাথার ওপর দিয়ে দ্বিতীয় গানবোটের সুপারস্ট্রাকচারের দিকে ছুটল প্রথম গ্রেনেডটা। ব্যাকআপ গানবোট দেখতে পায়নি ও, ছুঁড়ল আন্দাজে, আশা করল ধনুকের মত বেঁকে গিয়ে ঠিক জায়গাতেই পড়বে গ্রেনেডটা। একটা উইঞ্চে লেগে নদীতে পড়ল সেটা, বিস্ফোরিত হলো পানির তলায়। পরেরটা ছুঁতেও পারল না, বিস্ফোরিত হলো একইভাবে।

এরকম অপ্রত্যাশিত হামলার জন্যে তৈরি ছিলেন না অ্যাডমিরাল বোমা। তাঁর মনে হলো আকাশটা যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। হেলিকপ্টার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল দেখে পাথর হয়ে গেলেন তিনি।

'বিদেশী শত্রুরা বোকা বানিয়েছে আমাদের!' রেইলের ওপর ঝুঁকে সী কুইনকে ঘুসি দেখাচ্ছেন কমাণ্ডার ফাতুলা। তারপর নির্দেশ দিলেন, 'ডিপ্রেস গানস অ্যাণ্ড ফায়ার!'

'অনেক দেরি হয়ে গেছে!' চিৎকার করলেন অ্যাডমিরাল বোমা। ভয়ে কুঁকড়ে গেছেন তিনি, বসে পড়েছেন, নিশ্চুপ কামানগুলোর আশপাশে ছড়িয়ে থাকা লাশগুলো দেখে মাথা ঘুরছে তাঁর। সুদৃশ্য একটা ইয়ট থেকে বিদেশী একদল লোক এভাবে কেয়ামত ডেকে আনবে, কল্পনাও করা যায় না– প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করছে ক্রুরা, ফাতুলার নির্দেশ তারা শুনতেই পায়নি। মাত্র দু'জন লোককে দেখা গেল রেইলের ধারে দাঁড়িয়ে রাইফেলের গুলি ছুঁড়ছে। অ্যাডমিরাল বোমা উপলব্ধি করলেন, এখুনি মারা যাবেন তিনি। ঠিক এই সময় আরেকটা মিসাইল আঘাত করল, বিস্ফোরিত হবার আগে কাঠের খোল ভেদ করে এঞ্জিন রুমের একটা জেনারেটরে লাগল।

প্রায় ওই একই সময়ে রানার ছুঁড়ে দেয়া তৃতীয় গ্রেনেডটা জায়গা মত পড়ল। কাকতালীয় ব্যাপারই বলতে হবে, দ্বিতীয় গানবোটের বাল্কহেডে লেগে খোলা একটা হ্যাচ গলে নিচে নেমে গেল গ্রেনেডটা। বোটের ম্যাগাজিনে ছিল কামানের গোলা আর অন্যান্য অ্যামুনিশন, সব ফাটতে শুরু করায় বিস্ফোরণের কনসার্ট শুরু হয়ে গেল। ছুটন্ত আবর্জনা আর মোচড়রত ধোঁয়া দেখা গেল চারদিকে– আবর্জনার ভেতর ভাঙা বাল্কহেড, দলিতমথিত লাশ, বিচ্ছিন্ন ভেণ্টিলেটর, লাইফবোটের টুকরো ইত্যাদি রয়েছে। শক ওয়েভের ধাক্কায় অ্যাডমিরালের

গানবোট প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল সী কুইনের পাশে, ছিটকে পড়ে গেল রানা।

মুরল্যাণ্ডের মিসাইল গানবোটটার এঞ্জিন রুম তছনছ করে দিয়েছে। বড় এক গর্ত থেকে গোটা নদীই যেন ঢুকে পড়ছে সেখানে।

কোথাও আর কোন টার্গেট না পেয়ে ব্রিজের লোক দু'জনকে বেছে নিলেন রেডক্লিফ। লাফ দিয়ে দাঁড়িয়েছেন মাত্র বোমা, পানিতে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছে, একজোড়া বুলেট খেলেন বুকে। রেডক্লিফের শেষ বুলেটটা ফাতুলার খুলি উড়িয়ে দিল। শেষ মিসাইল ছুঁড়ে গানবোটটা ডুবিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড।

তারপর নিস্তব্ধতা নেমে এল নদীর বুকে। পানির ওপর তেল পুড়ছে, শুধু তারই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ওরা। কয়েক মুহূর্ত এভাবেই কেটে গেল।

'এখন কি হবে?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

রানা জবাব দিল, 'এই স্পীডে বিশ মিনিটের মধ্যে নাইজারে পৌঁছে যাব আমরা।'

'কে জানে কোন সাক্ষি রেখে যাচ্ছি কিনা।'

'পানিতে লাফিয়ে দু'একজন বেঁচে যেতে পারে। তীর থেকেও নিশ্চয়ই কেউ দেখেছে।'

রানার বাহু ধরে রেডক্লিফ জানতে চাইলেন, 'নাইজারে পৌঁছে আবার আমরা সার্ভে শুরু করতে পারব তো?'

'অনায়াসে।' তারপর স্যাটেলাইট ডিশ আর কমিউনিকেশন অ্যাণ্টেনার ওপর চোখ পড়ল ওর। 'সর্বনাশ! এ অবস্থা হলো কি করে?'

'রাইফেলের গুলি লেগেছে,' ম্লান সুরে বললেন রেডক্লিফ। 'নুমা এখন আর আমার ডাটা ট্র্যান্সমিশন রিসিভ করতে পারবে না।'

ককপিটের পিছনে তাকাল রানা, দেখল ছোট রাডার ডিশটা অক্ষতই আছে। স্যাটেলাইট নেভিগেশন ইউনিট হারাবার ফলে এখন ওদেরকে নদীতে কনটামিনেশন এণ্ট্রি চিহ্নিত করতে হবে ল্যাণ্ড মার্কের সাহায্যে।

সীমান্তরেখা পেরিয়ে নাইজারে পৌঁছুল ওরা আঠারো মিনিটের মাথায়। আকাশে বা নদীতে কোন সিকিউরিটি ফোর্সকে দেখা গেল না। চার ঘণ্টা পর রাজধানী নিয়ামেই-এর একটা রিফুয়েলিং ডকে নোঙর ফেলল। ফুয়েল নেয়ার পর ইমিগ্রেশন অফিসারদের সঙ্গে কথা বলল রানা, নিজেদের পথে এগিয়ে যাবার অনুমতি খুব সহজেই পাওয়া গেল দেখে মনে মনে বিস্মিত হলো ও। পশ্চিম আফ্রিকার ঐতিহ্যই হলো বিদেশীদের অকারণ ঝামেলায় ফেলা।

নিয়ামেই-এর আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিং আর জন এফ কেনেডি নামে ব্রিজটা পিছিয়ে পড়তে মুরল্যাণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'সো ফার, সো গুড। আর বোধহয় কোন বিপদ হবে না।'

রানা একমত হতে পারল না। সব কিছু খুব সহজভাবে ঘটছে, ওর মন খুঁত খুঁত করার সেটাই কারণ। বেনিন গানবোট ধ্বংস হবার খবর দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ার কথা, অথচ ইমিগ্রেশনে কাগজ-পত্র দেখানোর সময় আশপাশে সশস্ত্র মিলিটারি গার্ড বা পুলিস দেখেনি ওরা। ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে

না, হতে পারে না গ্যাফিলতিও। রানার মনে হলো, কেউ যেন ওদের নিয়ে খেলছে। নাইজার কর্তৃপক্ষ অবশ্যই জানে বেনিনে কি ঘটেছে, বেনিন সরকার না জানিয়ে পারে না। অথচ ওদেরকে গ্রেফতার করা হলো না। কি কারণ?

রানার সন্দেহের কথা শুনে রেডক্লিফও চিন্তায় পড়ে গেলেন। বললেন, 'কারণ আমাদের বোটটা নয়তো?'

মুরল্যাণ্ড বলল, 'বোটটা মানে?'

'ভেবে দেখো,' জবাব দিল রানা। 'সী কুইন হাইলি স্পেশালাইজড বোট, তৈরি করা হয়েছে গোপনে, গতি সত্তর নট, মাত্র তিন মিনিটে দুটো গানবোট আর একটা হেলিকপ্টার ধ্বংস করতে পারে। পশ্চিম আফ্রিকার যে-কোন সামরিক নেতা একটা হাত বা চোখ-কানের বিনিময়ে এটা পেতে চাইবে।'

'তাহলে বলো, রিফুয়েলিঙের সময় ওটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়নি কেন?'

'কেউ হয়তো কারও সঙ্গে কোন চুক্তি করেছে, সী কুইনকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হবে নির্দিষ্ট কোন সময় আর স্থানে।'

'কে কার সঙ্গে চুক্তি করবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'জানি না।'

'তারমানে যে-পথে এসেছি সে-পথে আর আমাদের ফেরা হচ্ছে না?' গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'বেনিন নেভিকে ডুবিয়ে দেয়ার অর্থ হলো ওয়ান-ওয়ে টিকেট নিয়ে সামনে যাচ্ছি আমরা।'

ইতিমধ্যে নদীর দু'পাশের দৃশ্য বদলে গেছে। গাছপালা অদৃশ্য হয়েছে, হলদেটে কাঁকর আর বালি মেশানো ধু-ধু প্রান্তর দেখতে পেল ওরা, দু'এক জায়গায় শুকনো ঝোপ-ঝাড় ছাড়া আর কিছু নেই।

কাজ খুঁজে না পেয়ে মুরল্যাণ্ড একটা পাইরেট ফ্ল্যাগ বের করে বলল, 'এটা আমি মাস দুই আগে এক কস্টিউম পার্টি থেকে কিনেছিলাম।' কালো কাপড়ে মানুষের খুলির ওপর ক্রস চিহ্নের মত একজোড়া হাড় আঁকা পতাকাটায়। আগেকার দিনে জলদস্যুরা এই পতাকা ব্যবহার করত। 'ফ্রান্সের ওটা খুলে নিয়ে এটা ওড়ালে কেমন হয়, রানা?'

'চমৎকার হয়,' সহাস্যে সমর্থন করল রানা।

নাইজার নদীর ওপর দিকে রয়েছেন ড. সুনারিল, অসংখ্য লেক আর জলাভূমির ওপর দিয়ে বহু দূরে চলে গেছে তাঁর দৃষ্টি, সূর্যাস্ত দেখছেন তিনি। সিলভিয়া একটা ক্যাম্প টুলে বসে আছে, সামনে জ্বলন্ত স্টোভ নিয়ে। সে বলল, 'পরিচিত বেশিরভাগ টক্সিন খুঁজেছি আমি, কোনটাই পাইনি। বিপর্যয়ের জন্যে যেটাই দায়ী হোক, খুব চালাকির সঙ্গে ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

সিলভিয়ার পাশে বসে আছেন অ্যালান বুন, নিউজিল্যাণ্ডার, প্রজেক্টের চীফ এপিডেমিওলজিস্ট। গ্লাসে নিয়ে সোডা ওয়াটার খাচ্ছেন তিনি। 'আমিও ব্যর্থ হয়েছি,' বললেন তিনি। 'কালচার করে পাঁচশো কিলোমিটারের কোথাও

ডিজিজরিলেটেড মাইক্রোঅর্গানিজম পাইনি। ভিক্টিম ছাড়া পোস্টমর্টেম করা সম্ভব নয়, টিস্যু সাম্পেল পাওয়া সম্ভব নয়।'

'টক্সিক কনটামিনেশনে এদিকে অন্তত কেউ মারা যাচ্ছে না,' বলল সিলভিয়া।

ড. সুনারিল ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'তার মানে কি ভুল খবর পেয়ে এসেছি আমরা?'

ড. বুন মনে করিয়ে দিলেন, 'জাতিসংঘের হেডকোয়ার্টারে যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল সেটা ছিল অস্পষ্ট।'

সিলভিয়া বলল, 'নাইজার, চাদ আর সুদান থেকেও আমাদের টীম জানিয়েছে, কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা, ইট'স আ কাভার আপ।'

'তা যদি হয়, খুব নিখুঁতই বলতে হবে।' এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে ড. সুনারিল বললেন, 'আমার ধারণা, কনটামিনেশনের ঘটনা ঘটছে শুধু মালিতে। আমাদের উচিত টিমবাকটুতে ফিরে যাওয়া। তুমি লক্ষ করেছ, দক্ষিণে রওনা হবার আগে আমরা যাদের ইন্টারভিউ নিই তাদেরকে কেমন নার্ভাস দেখাচ্ছিল? এমন হতে পারে, চুপ থাকার জন্যে ভয় দেখানো হয়েছে ওদেরকে। বিশেষ করে মরুভূমি থেকে আসা টুয়ারেগরা, ওরা তো পরীক্ষা করাতেই রাজি হলো না। আসলে আমারই ভুল হয়েছে, উচিত ছিল মরুভূমির দিকে যাওয়া।'

'তুমি একজন বিজ্ঞানী, সাইকিক ইনভেস্টিগেটর নও,' বললেন ড. বুন।

'আসলে ক্যাপটেন ফয়সল আমাদেরকে ভুল বুঝিয়ে এদিকে সরিয়ে এনেছে,' বলল সিলভিয়া। 'তার মিষ্টি ব্যবহার দেখে সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

'চলো তাহলে মরুভূমিতে যাই আমরা,' বললেন ড. সুনারিল। 'ফয়সলকে বলব প্রজেক্টের কাজ শেষ হয়ে গেছে, আমরা কোন কনটামিনেশন পাইনি। তা না হলে কর্নেল সাদিক জিবরিলকে রিপোর্ট করবে সে।'

'কিন্তু টিমবাকটু থেকে প্লেনে চড়ার পর মরুভূমিতে নামব কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন ড. বুন। 'জেট নিয়ে নামতে হলে অন্তত এক হাজার মিটার লম্বা রানওয়ে দরকার হবে।'

সিলভিয়া বলল, 'সাহারায় সমতল পাথুরে জায়গা অনেক পাওয়া যাবে, কোন কোনটা কয়েকশো মাইল লম্বা।'

'তা না হয় হলো, ঝুঁকি নিয়ে ল্যাণ্ড করলাম আমরা,' বললেন ড. বুন, 'কিন্তু মরুভূমিতে আমাদের বাহন কি হবে?'

ছোট আকারের মার্সিডিজ কারটার দিকে ইঙ্গিত করল সিলভিয়া। 'ওটা কার্গো ডোর দিয়ে গলবে বলেই আমার ধারণা।'

প্রায় আধঘণ্টা আলোচনা করল ওরা। তারপর ড. বুন জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্যাপটেন ফয়সল কোথায়, অনেকক্ষণ হলো দেখছি না তাকে।'

'রিক্রিয়েশন ভেহিকেলে,' বলল সিলভিয়া। 'লোকটা কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট ছেড়ে একদম নড়তে চায় না।'

নিজের ট্রাকে বসে স্টিরিও হেডফোনের মাধ্যমে ওদের সব কথা শুনছে ক্যাপটেন

ফয়সল। হেডসেটের তার চলে গেছে দারুণ সেনসিটিভ একটা ইলেকট্রনিক লিসনিং ডিভাইসে। ট্রাকের ছাদে রয়েছে অ্যামপ্লিফায়ার, পার্ক করা কারাভান-এর মাঝখানে ক্যাম্প স্টোভের দিকে তাক করা। সামনের দিকে ঝুঁকে বায়োনিক বুস্টার অ্যাডজাস্ট করল সে। সিলভিয়া ও অন্যান্যদের প্রতিটি শব্দ, এমনকি শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। এক সময় আলাদা হয়ে গেল ওরা, ড. সুনারিল আর ড. বুন মরুভূমির ম্যাপ নিয়ে বসলেন, সিলভিয়া গেল টীমের অন্যান্য সদস্যদের ব্রিফ করতে।

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট-এর সঙ্গে জোড়া লাগানো একটা ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল ফয়সল। গাও ডিস্ট্রিক্ট, সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করল সে, খানিক পরই লাইনে চলে এলেন কর্নেল সাদিক জিবরিল। হু-র টীম কি করতে যাচ্ছে, বিস্তারিত শুনে ঘাবড়ে গেলেন তিনি। ফয়সলের প্রশংসা করে বললেন, 'ওদের ওপর কড়া নজর রাখো, আমি জেনারেল ভিনসেন্টের সঙ্গে এখুনি যোগাযোগ করছি।'

'জেনারেল কি টিমবাকটুতে?'

'না, গাওতে। ভাগ্য ভাল হলে আমি তাঁকে স্যাভয় গাসকিলের ইয়টে পেয়ে যাব। একটা মিলিটারি ট্র্যান্সপোর্ট নিয়ে এখুনি আমি রওনা হয়ে যাচ্ছি, আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।'

এয়ারপোর্ট থেকে একটা মিলিটারি কার তুলে নিল কর্নেল জিবরিলকে। ডকে এসে দেখলেন তাঁর জন্যে একটা স্পীডবোট অপেক্ষা করছে। উজানে, মাঝ নদীতে নোঙর ফেলেছে স্যাভয় গাসকিলের প্রমোদতরী। ইয়টটায় আগে কখনও ওঠেননি জিবরিল, তবে শুনেছেন যে প্রশস্ত মাস্টার স্যুইট থেকে কাঁচ ঘেরা পেঁচানো সিঁড়ি নেমে গেছে হেলিপোর্টে। সব মিলিয়ে দশটা স্টেটরূম, ফরাসী অ্যান্টিকস ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে আধুনিক ও প্রাচীন পেইন্টিং। একাধিক ককটেল বার, রিভলভিং অবজার্ভেশন লাউঞ্জ, স্টীম রূম, বিশাল বাথরূম ছাড়াও রয়েছে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন সিস্টেম, যা কিনা গাসকিলের দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখতে সক্ষম।

গ্যাঙওয়ের পাশে ডেকেই জেনারেল ভিনসেন্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কর্নেলের। জেনারেলের হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করলেন জিবরিলকে। সংক্ষেপে দ্রুত বলে গেলেন জিরবিল কি ঘটেছে।

সব শুনে পায়চারি শুরু করলেন জেনারেল ভিনসেন্ট, থমথম করছে চেহারা। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'ওদের প্লেনের ক্রুরা এখনও টিমবাকটুতে আছে কিনা জানেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কর্নেল জিবরিল বললেন, 'পাইলটরা হোটেল থ্রী স্টারে উঠেছে।'

'আপনি বলছেন, ড. সুনারিল ওদেরকে বোনাস দেবে, উত্তরের মরুভূমিতে নামিয়ে দেয়ার বিনিময়ে?'

'হ্যাঁ, সেরকমই শুনলাম আমি।'

'প্লেনটা আপনার দখল করতে হবে।'

'আপনি চান পাইলটদের হাত করি আমি?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল জিবরিল। 'ঘুষ দিয়ে?'

'অপব্যয় হবে সেটা,' বললেন জেনারেল ভিনসেন্ট। 'তারচেয়ে সরিয়ে ফেলুন, মিটিয়ে ফেলুন ঝামেলা।' এ-ধরনের একটা নির্দেশই আশা করছিলেন কর্নেল, কাজেই কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। 'ইয়েস, স্যার।'

'পাইলটদের সঙ্গে চেহারা আর কাঠামো মেলে, এরকম লোক যোগাড় করুন মিলিটারি থেকে,' বললেন জেনারেল। 'কি করতে হবে বুঝিয়ে দিন।'

'জ্বী, স্যার।'

'আর ড. সুনারিলকে বলুন, আমি নির্দেশ দিয়েছি ওদের সঙ্গে ক্যাপটেন ফয়সলও কায়রোয় ফিরবে, আমার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে।'

'ঠিক আছে, স্যার। স্যার, নতুন পাইলটদের কি নির্দেশ দেব আমি?'

'নির্দেশ দিন,' ক্রুর হেসে বললেন পিয়েত্রো ভিনসেন্ট, 'হু-র টীমটাকে নামিয়ে দিতে হবে অ্যাসেলারে।'

'অ্যাসেলার।' শব্দটা এমন সুরে উচ্চারণ করলেন কর্নেল জিবরিল, যেন ওটায় অ্যাসিড মাখানো আছে। 'ট্যুরিস্ট সাফারির যে অবস্থা হয়েছিল, ওদেরও সেই একই অবস্থা হবে। উন্মাদ লোকগুলো খেয়ে ফেলবে ওদের।'

'সেটা ঠিক করবেন ঈশ্বর,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন জেনারেল।

'কিন্তু অজ্ঞাত কোন কারণে ওরা যদি বেঁচে যায়?'

হাসলেন জেনারেল ভিনসেন্ট। 'চিন্তার কিছু নেই,' বললেন তিনি। 'হাতে তেবেজা আছে না!'

ছয়

নুমার মস্তিষ্ক অর্থাৎ ডাটা সুপারমার্কেটের অধিপতি হলো ল্যারি কিং, একজন নিগ্রো। কাপড়চোপড় দেখে মনে হবে ষাট দশকের একজন হিপ্পি, নিউ ইয়র্কের ফ্লয়েড বেনেট ফিল্ডে অপেক্ষা করছে, টারমাকের পরিত্যক্ত অংশে পার্ক করা একটা জীপের গায়ে হেলান দিয়ে। টারমাক ধরে ছুটে এসে প্লেনটা থামল দশ মিটার দূরে। নিচে নামলেন নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, সঙ্গে ড. অজিত রায়।

অ্যাডমিরালের মেসেজ পেয়েই ওয়াশিংটন থেকে নিউ ইয়র্কে ছুটে এসেছে ল্যারি কিং। হ্যাণ্ডশেক করলেন ওঁরা তার সঙ্গে, সে জিজ্ঞেস করল, 'ড. রায়, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে কোন কারণে মন খারাপ? নাইজেরিয়ায় কিছু ঘটেছে নাকি?'

'কেবিনের সিলিং বড় বেশি নিচু ছিল,' বললেন অজিত রায়। 'তারচেয়ে বড় কথা, অ্যাডমিরালের সঙ্গে জিন রামি খেলতে বসে দশটার মধ্যে ছ'টাতেই আমি

হেরে গেছি।'

হেসে উঠল কিং, অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'লায়লা লাজুলির সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছ, কিং?'

'আপনি এখানে পৌঁছুনোর সময় জানানোর সঙ্গে সঙ্গে জাতিসংঘ হেডকোয়ার্টারে ফোন করেছিলাম। সেক্রেটারি জেনারেল তাঁর শেডিউল নতুন করে সাজিয়েছেন।' জাতিসংঘ মহাসচিবের পার্সোন্যাল সেক্রেটারি তাঁর নিজেরই ভাগ্নী। লায়লা লাজুলির সঙ্গে অ্যাডমিরালের বিশেষ বন্ধুত্ব আছে, বছর কয়েক আগে রানাই দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সেই সূত্রে নুমার প্রায় সব অফিসারের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে তার। 'আমরা তাঁর সঙ্গে বসব দশটায়, তিনি যদি প্রয়োজন মনে করেন এগারোটা পাঁচে মহাসচিবের সঙ্গে বসার ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'তোমার জীপকে বলো কোন রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাক আমাদের,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আধ ঘণ্টা সময় আছে হাতে, ব্রেকফাস্টটা সেরে নেয়া যাক।'

'নাস্তার কথা উঠলেই পান্তা ভাতের কথা মনে পড়ে যায়, আর মনটা হু হু করে,' সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললেন অজিত রায়।

কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে অর্ডার দিল কিং। ড. রায় তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রেড টাইড সম্পর্কে কতটুকু কি জানা গেল, মি. কিং?'

কমপিউটর এক্সপার্ট কিং জবাব দিল, 'স্যাটেলাইট ফটোয় পাওয়া ইনক্রিজিং ডাইমেনশন হিসাব করে তাজ্জব হয়ে গেছি আমি। ব্যাপারটা এরকম– শ্যাওলা শুরু করেছিল ফুটো একটা পয়সা দিয়ে, মাসের শেষ দিকে বিলিওনেয়ার বনে গেছে, প্রতিদিন দ্বিগুণ হারে বেড়ে। পশ্চিম আফ্রিকার রেড টাইড প্রতি চারদিনে আকারে দ্বিগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আজ ভোর চারটের সময় দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার এরিয়া দখল করে ছিল ওটা।'

'অর্থাৎ এক লাখ বর্গ মাইল,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'এই হারে গোটা দক্ষিণ আটলান্টিক গ্রাস করতে তিন কি চার হপ্তা লাগবে,' অনুমান করলেন ড. রায়।

'কারণ সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?' প্রশ্ন করল কিং।

'ডাইনোফ্ল্যাজিলেটকে পরিবর্তন বা উত্তেজিত করছে সম্ভবত কোন অর্গানোমেটালিক।'

'অর্গানোমেটালিক?'

'মেটাল আর অর্গানিক সাবস্ট্যান্স-এর একটা কমবিনেশন,' ব্যাখ্যা করলেন ড. রায়। 'আমরা কয়েক ডজন কনটামিনেশন আইডেনটিফাই করেছি, তবে ওগুলোর কোনটাই দায়ী বলে মনে হয়নি। আপাতত আমরা শুধু ধারণা করতে পারি যে একটা মেটালিক এলিমেন্ট যেভাবেই হোক সিনথেটিক কমপাউণ্ড বা কেমিকেল বাই-প্রডাক্টের সঙ্গে মিশে নাইজার নদীতে পড়ছে।'

'এক্সোটিক বায়োটেক রিসার্চের বর্জ্যও হতে পারে,' বলল কিং।

'পশ্চিম আফ্রিকায় কোন এক্সোটিক বায়োটেক এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে না,' জানালেন অ্যাডমিরাল।

'ওদের শেষ খবর জানা গেছে?' প্রশ্ন করল কিং।

'কাদের শেষ খবর?'

'নাইজারে আমাদের তিন বন্ধুর কথা বলছি। হঠাৎ করে কাল থেকে ডাটা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে ওরা।'

চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন অ্যাডমিরাল, তারপর নিচু গলায় বললেন, 'একজোড়া গানবোট আর একটা হেলিকপ্টার ওদেরকে বাধা দিয়েছিল। পুরো রিপোর্ট এখনও পাইনি আমি। ওদের কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট নিশ্চয়ই নষ্ট হয়ে গেছে। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির স্যাটেলাইট ফটোয় দেখা গেছে, কপ্টার আর গানবোটগুলোকে উড়িয়ে দিয়েছে ওরা। তারপর মালিতে পৌঁচেছে ওরা নিরাপদেই।'

চেয়ারের ভেতর ডেবে গেল কিং, তার খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। 'মালি থেকে আর বেরুতে হবে না, স্রেফ মারা পড়বে। বিদেশী গুপ্তচরদের খেজুর গাছে ঝুলিয়ে মারে ওরা, আমি জানি।'

'সেজন্যেই তো ইউএন-এর সাহায্য দরকার আমাদের,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'লায়লা লাজুলির মাধ্যমে মহাসচিবকে অনুরোধ করব, আমাদের টীম আর ডাটা যেন নিরাপদে বের করে আনা যায়।'

মাথায় হাত দিল কিং। 'আমরা কি নাইজার নদীতে রিসার্চ শুরু করেছি অনুমতি ছাড়াই?'

অ্যাডমিরাল ম্লান সুরে বললেন, 'নেতাদের আমরা বোঝাতে পারিনি। তবে প্রেসিডেন্ট জানেন, সেক্রেটারি অভ স্টেটসও জানেন– যদিও পশ্চিম আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোকে পানি পরীক্ষা করার অনুরোধ জানাতে রাজি হয়নি তাঁরা।'

'তা সত্ত্বেও আপনি রানা, মুরল্যাণ্ড আর মি. রেডক্লিফকে পাঠালেন ওখানে?'

'আর কোন উপায় ছিল না,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছিল। ঝুঁকি শুধু ওরা তিনজন নেয়নি, আমিও নিয়েছি। এই অপারেশনের কথা ফাঁস হয়ে গেলে আমার ক্যারিয়ার বলে কিছু থাকবে না, একশো বছরের জেলও হতে পারে।'

লায়লা লাজুলির বয়েস ত্রিশের নিচে, সুন্দরী ও রহস্যময়ী নারীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিজের মধ্যে ধরে রেখেছে সে। তার গায়ের রঙ দুধে-আলতা, কোমর ছাড়ানো ঘন কালো চুল, যথেষ্ট লম্বা, অথচ রোগা নয়। ইউএন হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙে, তার অফিস কামরায়, জর্জ হ্যামিলটন আর তাঁর বন্ধুরা ঢুকছেন দেখে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'অ্যাডমিরাল, নাইস টু সী ইউ এগেন। ইউ আর অ্যামেজিং, অ্যাডমিরাল। তিন বছর আগে দেখেছি, সেই একই রকম আছেন দেখছি, একটুও বদলাননি।' সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল সে, সোফা দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করল।

কুশল বিনিময়ের পরপরই আসল কথা পাড়লেন অ্যাডমিরাল। এভাবে শুরু করলেন তিনি, 'এর মধ্যে কোন অতিরঞ্জন নেই, মিস লাজুলি। পরিবেশ ও আবহাওয়া সংক্রান্ত গুরুতর বিপর্যয় ঠেকাবার জন্যে জাতিসংঘের সাহায্য চাই আমরা। আবার বলছি, অতিরঞ্জন নয়– দেরি করলে গোটা মানবজাতির অস্তিত্ব

বিপন্ন হয়ে পড়বে।'

'মনে হচ্ছে গ্রীনহাউস এফেক্ট সম্পর্কে লেকচার শুনতে হবে।'

'তারচেয়ে অনেক খারাপ,' বললেন হ্যামিলটন। 'চলতি বছরের শেষ দিকে দুনিয়ার বেশিরভাগ জনসংখ্যা একটা স্মৃতিতে পরিণত হবে।'

সামনে বসে থাকা লোকগুলোর দিকে একে একে তাকাল লাজুলি। কেউ একচুল নড়ছে না, থমথম করছে চেহারা। 'প্লীজ, বলে যান।'

এরপর অ্যাডমিরাল কথা বলার দায়িত্ব দিলেন ল্যারি কিং আর অজিত রায়কে। অতি দ্রুত বাড়তে থাকা রেড টাইড সম্পর্কে যা যা জানা গেছে সব তারা ব্যাখ্যা করল। বিশ মিনিট পর চুপ করল ওরা।

'আপনারা এই বিপদ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ?' নিস্তব্ধতা ভাঙল লাজুলি।

'সম্পূর্ণ,' বললেন ড. রায়। 'রেড টাইড অবাধে ছড়িয়ে পড়লে গ্লোবাল লাইফের জন্যে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাওয়া যাবে না। ফলাফল সহজেই অনুমেয়।'

কিং বলল, 'টক্সিসিটির কথা ধরা হচ্ছে না। পানি ও ডাঙার পশু বা মানুষ বিষটা যেভাবে হোক খাবেই, আর খেলেই দলে দলে মারা যাবে।'

'জাতিসংঘের সাহায্য চাওয়ার আগে,' অ্যাডমিরালকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করছে লাজুলি, 'আপনি নিশ্চয়ই আপনাদের সরকারকে ব্যাপারটা জানিয়েছেন, মি. হ্যামিলটন?'

'জানিয়েছি, কিন্তু ওঁরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি,' বললেন হ্যামিলটন। 'তবু আমি নুমার তরফ থেকে বোটে করে ছোট একটা টীম পাঠিয়েছি নাইজার নদীতে, পানি পরীক্ষা করে রেড টাইড বিস্ফোরণের কারণ জানার জন্যে।'

ভুরু কুঁচকে লাজুলি জিজ্ঞেস করল, 'নুমার টীমই কি বেনিনের গানবোটগুলো ডুবিয়ে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলেন অ্যাডমিরাল।

'সর্বনাশ, এ আপনারা কি করেছেন! আপনি জানেন, বেনিন নেভির চীফ মারা গেছেন? তিনি প্রেসিডেন্টের আপন ভাই!'

'শুনেছি।'

'আপনার টীম... ওরা এখনও বেঁচে আছে?'

'কয়েক ঘণ্টা আগের খবর জানি– মালি সীমান্তের কাছে কনটামিনেশন ট্রেস করতে পেরেছে ওরা, গাও শহরের দিকে যাচ্ছে, এখনও কোন বিপদ হয়নি।'

'ওদের আশা আপনি ছেড়ে দিতে পারেন, অ্যাডমিরাল,' রেগে গেছে লাজুলি, যদিও চেহারায় তা সামান্যই প্রকাশ পেল।

'সে কারণেই আপনার কাছে আসা,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'বলুন ঠিক কি চাইছেন আপনি।'

'কনটামিনেশনের উৎস জানার সঙ্গে সঙ্গে টীমটাকে উদ্ধার করে আনাটা জরুরী।'

অ্যাডমিরাল থামতেই ড. রায় যোগ করলেন, 'ওদের অ্যানালেসিস ডাটাও খুব জরুরী দরকার আমাদের।'

হাত ঝাপটে অসহায় একটা ভঙ্গি করল লাজুলি, বলল, 'কিন্তু এ-সব শুনলে মহাসচিব সাহায্য করা তো দূরের কথা, খেপে যাবেন। উনি আমার মামা হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে দিয়ে কোন অবৈধ কাজ করিয়ে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

অ্যাডমিরাল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে লাজুলি বলল, 'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। আমি আপনাদের কোন সাহায্যে আসব না। নুমার লোকজন সার্বভৌম একটা রাষ্ট্রে ঢুকে তাদের নেভির সঙ্গে যুদ্ধ করবে, নৌ-বাহিনীর চীফকে খুন করবে, অথচ আশা করা হবে জাতিসংঘ ফোর্স পাঠিয়ে তাদেরকে উদ্ধার করে আনবে, এ স্রেফ...'

'টীমে মুরল্যাণ্ড আর রানা আছে...'

'যেই থাকুক... কে? কে আছে বললেন?'

'মাসুদ রানা,' বিড়বিড় করলেন অ্যাডমিরাল।

কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলল না লাজুলি। তারপর সে-ও খুব নিচু গলায় বলল, 'আপনি দেখছি ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় গুলি করতে পারেন।'

'যদি প্রয়োজন দেখা দেয়।'

ড. রায়ের ভুরু জোড়া উঁচু হলো। 'কি কথা হচ্ছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে লাজুলি বলল, 'বছর তিনেক আগে কায়রোয় এক ভদ্রলোক আততায়ীর গুলি থেকে বাঁচিয়েছিলেন আমাকে- একবার নয়, দু'বার। এই মাত্র কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ঋণ শোধ করতে বললেন অ্যাডমিরাল।'

'ঘটনাটা আমার মনে আছে,' বলল কিং। 'আপনি আমার বন্ধু মাসুদ রানার কথা বলছেন।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল। এগিয়ে এসে লাজুলির চেয়ারের পাশে থামলেন। 'মিস লাজুলি, আপনি শুধু মহাসচিবকে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে বলুন। তারপর আমরাও তাঁকে যুক্তি দেব।'

'রানা ওখানে আটকা পড়েছে, কিছু একটা তো করতেই হবে,' নরম সুরে বলল লাজুলি। 'ঠিক আছে, আপনারা বসুন, দেখি কতদূর কি করা যায়।'

'মানুষজন তো দূরের কথা,' পরিত্যক্ত ও ভাঙাচোরা অ্যাসেলার গ্রামের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন ড. অ্যালান বুন, 'একটা ছাগল বা কুকুরও দেখা যাচ্ছে না!'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো,' বলল সিলভিয়া, রোদ ঠেকাবার জন্যে কপালে হাত তুলে রেখেছে।

পাথুরে মরুভূমির উঁচু একটা ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে দলটা, দূরে দেখা যাচ্ছে অ্যাসেলার গ্রাম। মানুষজন নেই, তবে উত্তর-পুব থেকে আসা টায়ারের দাগ দেখা গেল বালির ওপর, গ্রামের দিকে চলে গেছে।

ড. সুনারিল ক্যাপটেন ফয়সলের দিকে তাকালেন। 'এখানে আমাদেরকে ল্যাণ্ড করাবার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে শহরটা পরিত্যক্ত— ভূতুড়ে।'

ফোর-হুইল-ড্রাইভ, খোলা মার্সিডিসে বসে আছে ফয়সল, ড্রাইভিং সীটে। 'তাওয়াদিনি সল্ট মাইন থেকে আসা একটা কারাভ্যান রিপোর্ট করেছিল অ্যাসেলারে মহামারী লেগেছে। আর কি বলতে পারি আমি?'

'ভেতরে ঢুকে দেখে আসতে অসুবিধে কি,' বলল সিলভিয়া। 'কুয়ার পানিও পরীক্ষা করা উচিত।'

'আপনারা যদি হেঁটে যান, আপনাদের বাকি লোকজনকে আনার জন্যে ফিরে যেতে পারি আমি,' বলল ফয়সল।

'ঠিক আছে। ইকুইপমেন্টগুলোও আনবেন।'

ফয়সল চলে যাবার পর সিলভিয়া বলল, 'সাহায্য করার জন্যে একপায়ে খাড়া, কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে আমার।' ড. সুনারিলের পিছু নিয়ে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। গ্রামে ঢুকে কি দেখবে ভেবে ভয় ভয় লাগছে তার।

দশ মিনিট পর সরু গলি দিয়ে গ্রামের ভেতর ঢুকল ওরা। সবগুলো গলিতে দুনিয়ার আবর্জনা ছড়িয়ে আছে, টপকে এগোতে হলো ওদেরকে, তীব্র দুর্গন্ধে মনে হলো পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। যত এগোল, ততই বাড়ল সেটা। সন্দেহ হলো ঘরগুলোর ভেতর থেকে আসছে।

কোন ঘরে কাউকে ঢুকতে দিলেন না ড. সুনারিল। বাজার এলাকায় পৌঁছুল দলটা। বিস্ময় ও আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে গেল ওদের চোখ। এমন ভয়াবহ, রোমহর্ষক দৃশ্য জীবনে আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারল না কেউ। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের অসংখ্য হাড়, খুলিগুলো সারি সারি এমনভাবে সাজানো যেন বিক্রির জন্যে প্রদর্শন করা হচ্ছে। শুকনো, কালো হয়ে যাওয়া মানুষের চামড়া ঝুলছে গাছের ডালে, রাজ্যের মাছি ভন ভন করছে।

সিলভিয়া প্রথমে ভাবল, কোন সেনাবাহিনী এখানে বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। ভুল ভাঙল ছড়িয়ে থাকা হাড়গুলো খুঁটিয়ে দেখার পর, প্রায় প্রতিটি ক্ষতবিক্ষত করা হয়েছে দাঁত দিয়ে। 'ক্যানি-বালিজম!' আতঙ্কে ফিসফিস করল সে।

'হ্যাঁ,' ড. সুনারিলকে বললেন ড. বুন, 'সিলভিয়া ঠিকই বলছে। একদল পিশাচ এখানকার সব মানুষকে খেয়ে ফেলেছে।'

ড. সুনারিলকে বললেন, 'গন্ধ থেকে বোঝা যাচ্ছে বাড়িগুলোর ভেতর এখনও পচা লাশ আছে, কঙ্কালে পরিণত হয়নি। তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, দেখি একটা অন্তত পাই কিনা।'

'কেন শুধু শুধু বিপদের ঝুঁকি নেব। চলো প্লেনের কাছে ফিরে যাই।'

'ননসেন্স,' তিরস্কার করলেন ড. সুনারিল। 'অ্যাবনরমাল বিহেভিয়ারের এক্সট্রিম কেস এটা, কারণটা টক্সিক কনটামিনেশনও হতে পারে। কিছু পাই কিনা দেখতে হবে আমাকে।'

'আমিও যাচ্ছি,' বলল সিলভিয়া।

কাঁধ ঝাঁকালেন ড. বুন। 'ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমিও।'

তার পিঠ চাপড়ে দিলেন ড. সুনারিল। 'ধন্যবাদ, বন্ধু।'

প্রথম যে ঘরে ঢুকল ওরা, সেটার দেয়াল পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে খাড়া করা, ফাঁক-ফোকরগুলো মাটি ভরে পূরণ করা হয়েছে। লাশ পাওয়া গেল দুটো, পুরুষ ও মহিলার, মারা গেছে অন্তত এক হপ্তা আগে। গরমে এরইমধ্যে কুঁকড়ে গেছে চামড়া, শুকিয়ে গেছে টিস্যু। মৃত্যু দ্রুত ঘটেনি, যন্ত্রণাদায়ক মন্থর ছিল গতি, লাশগুলো পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন ড. সুনারিল। জানালেন, 'প্যাথলজিক্যাল এগজামিনেশন ছাড়া বেশি কিছু বলা যাচ্ছে না।'

ড. বুন বললেন, 'ফ্রেশ একটা ভিক্টিম পেলে ভাল হত···।'

সবাই নাকে রুমাল জড়িয়ে নিয়েছেন, তারপরও বমি পাচ্ছে। সিলভিয়া জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, ঘরে কোন বাচ্চা নেই কেন, কি ভেবে চুপ করে থাকল সে। মা ও বাবা বাচ্চাদেরকে খেয়ে ফেলেছে, চিন্তাটা মাথায় আসতেই অসুস্থ বোধ করল সে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

রাস্তা পেরিয়ে অন্য একটা বাড়িতে ঢুকল সিলভিয়া। ইংরেজি হরফ এল আকৃতির উঠান, প্রায় পরিষ্কারই বলা যায়। তবে দুর্গন্ধটা এ-বাড়িতেই যেন বেশি। দেয়াল আর পাঁচিলগুলো সাদা চুনকাম করা, ছাদের সিলিং খুব উঁচু। জানালাগুলো খোলা, ঘরে প্রচুর আলো আছে। সিলভিয়া ধারণা করল, সম্ভবত কোন ব্যবসায়ী বাস করত এখানে। এক এক করে অনেকগুলো ঘরে ঢুকল সে, বেশিরভাগ ফার্নিচার জায়গা মত খাড়া রয়েছে দেখে অবাক লাগল তার। শেষ একটা ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল, নিজের অজান্তেই আঁতকে উঠেছে। ঘরের মাঝখানে স্তূপ করা রয়েছে মানুষের বিচ্ছিন্ন হাত ও পা।

পিছিয়ে বেরিয়ে এল সিলভিয়া, হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেছে সে। প্যাসেজ ধরে হন হন করে হাঁটছে, সামনে পড়ল একটা বেডরুম। এখানেও থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে, গলা থেকে অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল। বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সে। লোকটার চোখ খোলা। মাথাটা বালিশের ওপর। হাত দুটো শরীরের দু'পাশে স্থির হয়ে আছে। তার চোখের মণি লালচে, সাদা অংশটুকু গাঢ় রক্তবর্ণ। সিলভিয়ার মনে হলো, লোকটা বেঁচে আছে। তারপর সে লক্ষ করল, বুকটা ওঠা-নামা করছে না, চোখের পাতাও নড়ছে না।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না সিলভিয়া, পা-পা করে এগিয়ে এসে ঝুঁকল সে, আঙুলের ডগা দিয়ে ঘাড়ের রগ স্পর্শ করল। পালস নেই। এরপর লোকটার একটা হাত ধরল সে। পেশী এখনও পুরোপুরি শক্ত হয়নি। হাতটা ছেড়ে দিতে যাবে, পিছনে পায়ের শব্দ হলো।

বন করে আধ পাক ঘুরল সিলভিয়া। দেখল ড. সুনারিল আর ড. বুন ঘরে ঢুকছেন।

লাশটা পরীক্ষা করে হাসলেন ড. সুনারিল। 'বাই গড, বুন। পোস্টমর্টেমের জন্যে ফ্রেশ ভিক্টিম চেয়েছিলে, পেয়ে গেছ।'

এয়ারলাইন ইউনিফর্ম পরা চীফ পাইলট আর ক্যাপটেন ফয়সল হাসাহাসি করছে।

মার্সিডিজ নিয়ে অ্যাসেলার গ্রাম থেকে এই মাত্র ফিরেছে ফয়সল। 'প্লেনে ওদের আর কেউ নেই তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আপনি ওদের সবাইকে গ্রামে রেখে এসেছেন,' বলল চীফ পাইলট। 'প্লেন খালি।'

প্লেনের পাশে মার্সিডিজে বসে রয়েছে ফয়সল, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে চীফ পাইলট। ফয়সল বলল, 'তোমার অভিনয়ে কোন খুঁত নেই, লেফটেন্যান্ট ইমরান। সুনারিল ধরে নিয়েছে তুমি বদলী ক্রু।'

'ধন্যবাদ, ক্যাপটেন। ইংরেজিটা ভাল জানি বলে কোন অসুবিধে হয়নি। বলছিলেন কর্নেল জিবরিলের সঙ্গে কথা বলবেন। এখুনি? ককপিটে চলুন, ফ্রিকোয়েন্সি সেট করে দিই।'

ককপিটে ওঠার পর কর্নেল জিবরিলের সঙ্গে যোগাযোগ করল লেফটেন্যান্ট, মাইক্রোফোনটা ধরিয়ে দিল ফয়সলের হাতে। 'দিস ইজ ঈগল ওয়ান। ওভার।'

'এদিকে আমি জিবরিল, ক্যাপটেন,' পরিচিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'কোড দরকার নেই। প্রতিপক্ষরা শুনছে বলে মনে হয় না। কি পরিস্থিতি বলো।'

'অ্যাসেলার শহরের স্থানীয় লোকজন কেউ বেঁচে নেই। বিদেশী লোকগুলো নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। আই রিপিট, গ্রামবাসীরা সবাই মারা গেছে।'

'শালার নরখাদকরা তাহলে নিজেরাই নিজেদেরকে খেয়ে ফেলেছে? সত্যি নাকি?'

'হ্যাঁ, কর্নেল, চুনোপুঁটি সব শেষ করে ফেলেছে। ড. সুনারিলের ধারণা, সবাইকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।'

'ওরা কোনও প্রমাণ পেয়েছে?'

'এখনও পায়নি। কুয়ার পানি পরীক্ষা করছে, দু'একটা লাশের পোস্টমর্টেম করছে...।'

'কিছু আসে যায় না। ওদের সঙ্গে খেলতে থাকো। পরীক্ষা-টরীক্ষা শেষ হলে ওদেরকে তুমি তেবেজায় পৌঁছে দেবে। জেনারেল ভিনসেন্ট ওদেরকে ওখানে সাদর অভ্যর্থনা জানাবেন।'

'আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব, স্যার।'

'কাজটা ভালয় ভালয় শেষ করো, তোমার প্রমোশন ঠেকায় কে।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

সিলভিয়ার আবিষ্কৃত মরা লোকটার বাড়িতে দোকান খুলে বসলেন ড. বুন। গ্রামে এটাই সবচেয়ে বড় আর পরিচ্ছন্ন বাড়ি। বেডরূমে পাওয়া লাশের প্যাথলজি টেস্ট করলেন তিনি, আর সিলভিয়া রক্ত পরীক্ষা করল। গ্রামের ভেতর ও আশপাশের কয়েকটা কুয়ার পানি নমুনা হিসেবে নিয়ে এসে ড. সুনারিলের তত্ত্বাবধানে কেমিকেল অ্যানালেসিস করা হলো। টীমের অন্যান্য সদস্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কঙ্কাল ও লাশের টিস্যু আর হাড় সংগ্রহ করে পরীক্ষা চালাল। বাজার এলাকার পিছনের একটা বড় গুদামের ভেতর পাওয়া গেল সাফারি গ্রুপের ল্যাণ্ড রোভারটা। সামান্য মেরামত করার পর চলার উপযোগী হলো ওটা, গ্রাম আর প্লেনের

মাঝখানে সাপ্লাই আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে। অলস ভঙ্গিতে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল ক্যাপটেন ফয়সলকে, ওদের কোন কাজে লাগল না।

দুর্গন্ধে ঘুম আসবে না, কাজেই সারা রাত এবং পরদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করল ওরা। ক্যাম্প ফেলা হয়েছে প্লেনের কাছে। নাতিদীর্ঘ একটা ঘুম দেয়ার পর হু-র সদস্যরা একটা অয়েল হিটারকে ঘিরে গোল হয়ে বসল। মেজবানের ভূমিকা নিয়ে ওদেরকে সোঁদা গন্ধী আফ্রিকান চা বানিয়ে খাওয়াল ফয়সল, কে কি বলছে সেদিকে খাড়া করে রাখল কান।

একটা পাইপ ধরিয়ে ড. সুনারিল বললেন, 'বুন, তুমি শুরু করো। একমাত্র তাজা যে লাশটা পাওয়া গেছে, সেটা পরীক্ষা করে কি পেলে তুমি?'

সহকারীর কাছ থেকে নিয়ে একটা ক্লিপবোর্ডে চোখ বুলালেন বুন কোলম্যান লণ্ঠনের আলোয়। 'আমার এত বছরের অভিজ্ঞতায় কোন মানুষের মধ্যে এত বেশি জটিলতা আগে কখনও দেখিনি। রঙ বদলে লাল হয়ে গেছে চোখ– মণি আর সাদা অংশ, দুটোই। রঙ বদলেছে গায়ের চামড়াতেও, তামাটে হয়ে গেছে। স্প্লীন অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেছে আকারে। মস্তিষ্ক ও হৃৎপিণ্ডের শিরাগুলোয় জমাট বেঁধে গেছে রক্ত। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিডনি। প্যাংক্রিয়াস আর লিভারে প্রচুর দাগ পড়েছে। হেমোগ্লোবিনের মাত্রা অত্যন্ত বেশি। ডিজেনারেশন অভ ফ্যাটি টিস্যু। লোকগুলো যে পাগল হয়ে পরস্পরকে খেয়ে ফেলেছে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সবগুলো ডিজঅর্ডার এক করলে আন কন্ট্রোলড সাইকোসিস পেয়ে যাবে তুমি।'

'আন কন্ট্রোলড?' জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'ধীরে ধীরে পাগল হয়েছে লোকটা, প্রতিক্রিয়া ক্রমশ প্রবল হওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। এই মাত্রার ব্রেন ড্যামেজ মানুষকে পাগল না বানিয়ে পারে না। লোকটা এত সব সমস্যায় আক্রান্ত হবার পরও অনেকক্ষণ বেঁচে ছিল, মিরাকলই বলতে হবে।'

'তোমার ডায়গনস্টিক কংক্লুসন?' জানতে চাইলেন ড. সুনারিল।

'মারা গেছে ম্যাসিভ পলিকাইথেমিয়া ভেরা-য় আক্রান্ত হয়ে। এই রোগের কারণ অজ্ঞাত। লক্ষণ হলো রেড ব্লাড সেল ও হেমোগ্লোবিন অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায়। এ-কারণেই শরীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পার্টস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রক্ত জমাট বাঁধার যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি না হওয়ায় হার্ট বন্ধ হয়নি বা স্ট্রোক করেনি, সারা শরীরে হেমারিজের ঘটনা ঘটেছে, সেটা বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা গেছে ত্বকে আর চোখে। দেখে মনে হবে তাকে যেন মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন বি-টুয়েলভ ইনজেক্ট করা হয়েছে। তোমরা সবাই জানো রেড ব্লাড সেল ডেভেলপ্ করার জন্যে ওটা জরুরী।'

সিলভিয়ার দিকে ফিরলেন ড. সুনারিল। 'তুমি রক্ত পরীক্ষা করেছ। সেলগুলো সম্পর্কে বলো আমাদের। ওগুলো কি স্বাভাবিক আকৃতি বজায় রাখতে পেরেছে– চ্যাপ্টা, গোল, মাঝখানটা দাবানো?'

মাথা নাড়ল সিলভিয়া। 'না, বদলে গেছে, এরকম আকৃতি আগে কখনও

দেখিনি– প্রায় তেকোনা। বুন যেমন বলল, সংখ্যায় এত বেশি যে বিশ্বাস করা যায় না। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রতি কিউবিক মিলিমিটার রক্তে ৫.২ মিলিয়ন রেড সেল থাকে। আমাদের ভিক্টিমের রক্তে এর তিন গুণ পাওয়া গেছে।'

বুন বললেন, 'আরেকটা কথা। আর্সেনিক পয়জনিং-এর প্রমাণও পেয়েছি আমি, আগে বা পরে এতেও তার মৃত্যু হত।'

'বুনের ডায়গনসিস ঠিক আছে,' বলল সিলভিয়া। 'রক্তের নমুনাতেও স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে। কোবাল্ট লেভেলও স্কেল ছাড়িয়ে গেছে।'

ক্যাম্প চেয়ারে সিধে হয়ে বসলেন ড. সুনারিল। 'কোবাল্ট?'

'অবাক হবার কিছু নেই,' বললেন ড. বুন। 'ভিটামিন বি-টুয়েলভে প্রায় ৪.৫ পার্সেন্ট কোবাল্ট থাকে।'

মাথা ঝাঁকালেন সুনারিল। 'কুয়ার পানিতেও আর্সেনিক আর কোবাল্ট পেয়েছি আমি,' বললেন তিনি। 'এক কাপ পানিতে ওগুলোর পরিমাণ এত বেশি, খেলে একটা উট অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

'কোবাল্ট আর আর্সেনিকের জিওলজিক্যাল ডিপোজিট থেকে ধীরে ধীরে মাটির তলার স্রোতে মিশছে,' হিটারের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল সিলভিয়া।

'কিন্তু আর্সেনিক আর কোবাল্ট দূষণের কারণে এই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে, তা হতে পারে না। অন্য কোন কম্পাউণ্ড ওগুলোর সঙ্গে মিশে যাওয়ায় টক্সিসিটির মাত্রা সহনক্ষমতার ওপরে উঠে গেছে, রেড সেল বেড়ে যাবার সেটাই কারণ। সেই কম্পাউণ্ডটা কি তা জানা যাচ্ছে না। যদিও আমার অ্যানালেসিসে আরেকটা ব্যাপার ধরা পড়েছে। রেডিও অ্যাকটিভিটির প্রচুর নমুনা পেয়েছি আমি।'

'ইন্টারেস্টিং,' বললেন বুন। 'কিন্তু নরম্যাল রেডিয়েশনের সংস্পর্শে রেড সেলের সংখ্যা কমে যায়, বাড়ে না। পরীক্ষার সময় রেডিও অ্যাকটিভিটির ক্রনিক এফেক্ট দেখিনি আমি।'

'হতে পারে কুয়ার পানিতে রেডিয়েশন পেনিট্রেট করেছে সম্প্রতি,' বলল সিলভিয়া।

'এখানে আমাদের ইকুইপমেণ্ট খুব কম,' বললেন সুনারিল। 'নতুন কোন ব্যাকটেরিয়া বা এক্সোটিক কেমিকেল কমবিনেশন দায়ী হলে খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্যারিসে, আমাদের ল্যাবে নমুনা পাঠাতে হবে।'

'আ সিনথেটিক বাই-প্রডাক্ট,' চিন্তিত সুরে বিড়বিড় করছে সিলভিয়া। তারপর মরুভূমির চারদিকে চোখ বুলাল সে। 'কোত্থেকে আসতে পারে? আশপাশ থেকে আসার কোন সম্ভাবনাই তো নেই।'

বুন বললেন, 'ফোর্ট ফরো-র বিপজ্জনক ওয়েস্ট ডিসপোজাল?'

নিভে যাওয়া চুরুটে আগুন ধরালেন সুনারিল। 'দু'শো কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। তাছাড়া, হাই রেডিয়েশন লেভেলের ব্যাখ্যা কি? ফোর্ট ফরো ফ্যাসিলিটির ডিজাইন এমনভাবে করা হয়নি যে রেডিওঅ্যাকটিভ ওয়েস্ট গ্রহণ

করতে পারবে। হ্যাজারডাস ওয়েস্ট সবই পুড়িয়ে ফেলা হয়, কাজেই আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়াটার সাপ্লাই পেনিট্রেট করতে পারে না। অত দূর থেকে যদি আসেও, এখানে পৌঁছুনোর আগেই মারাত্মক কেমিকেলগুলো হজম করে নেবে মাটি।'

'ঠিক আছে,' বলল সিলভিয়া। 'পরবর্তী পদক্ষেপ কি?'

'নমুনা নিয়ে কায়রো, সেখান থেকে প্যারিসে যাই চলো। লাশটাও নিয়ে যাব। কায়রোয় নিয়ে গিয়ে বরফে রাখার ব্যবস্থা করা যাবে।'

'আমি রাজি,' জানাল সিলভিয়া।

'ক্যাপটেন ফয়সল?' জিজ্ঞেস করল সুনারিল। 'আপনি কি বলেন?'

শার্টের তলায় টেপ-রেকর্ডার রেখেছে ফয়সল, ওদের সব কথা রেকর্ড হয়ে গেছে। 'গ্রামের এই অবস্থা দেখার পর আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনারা চলে যেতে চাইলে যেতে পারেন। আমি পরে ল্যাণ্ড রোভার নিয়ে টিমবাকটুতে ফিরব।'

'চারশো কিলোমিটার পথ। আপনি চিনবেন?'

'মরুভূমিতে জন্ম আমার,' বলল ফয়সল। 'ভোরে রওনা হলে সন্ধের দিকে পৌঁছে যাব।'

'ঠিক আছে।' চেয়ার ছাড়লেন সুনারিল। 'কাল সকালে রওনা হব আমরা।'

যে-যার তাঁবুতে চলে গেল ওরা, হিটারের পাশে একা বসে থাকল ফয়সল। বোতাম টিপে টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করল সে, তারপর হাতের টর্চ উঁচু করে প্লেনের ককপিট লক্ষ্য করে দু'বার আলো জ্বালল। এক মিনিট পর সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে তার পাশে দাঁড়াল চীফ পাইলট। 'আমাকে ডাকছেন?'

'বিদেশী কুত্তারা কাল ফিরে যাচ্ছে।'

'আমরা আসছি জানিয়ে তেবেজায় খবর দিতে হয়,' বলল চীফ পাইলট।

'মনে করিয়ে দিয়ো, সুনারিল আর তার দলকে যেন যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানানো হয়। ওদেরকে নামিয়ে দিয়ে তুমি আবার দেরি কোরো না, প্লেন নিয়ে সোজা ফিরে যাবে বামাকোয়।'

'ঠিক আছে, ক্যাপটেন। তেবেজায় ভূত ছাড়া কেই-বা থাকতে চাইবে।'

সাত

'কতক্ষণ হলো পিছু নিয়েছে ওরা?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড, মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমোবার পর চোখ রগড়াচ্ছে সে, তাকিয়ে আছে রাডার স্ক্রীনে ফুটে থাকা ইমেজের দিকে।

'পঁচাত্তর কিলোমিটার পিছনে প্রথম দেখি, মালিয়ান এলাকায় ঢোকার পরপরই,' জবাব দিল রানা, হুইলের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

'ওদের আর্মামেন্ট দেখার সুযোগ হয়েছে?'

'না। একশো মিটার দূরে, একটা শাখা নদীতে লুকিয়ে আছে বোটটা।

সারফেস রাডারে রিফ্লেকশন দেখে সন্দেহ হয় আমার। আমরা বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে আসতেই একটা চ্যানেলে ঢুকে অনুসরণ করে ওরা।'

'রুটিন পেট্রলও হতে পারে, তাই না?'

'রুটিন পেট্রল হলে ক্যামোফ্লেজ নেটিং-এর আড়ালে লুকাবে কেন?'

রাডারের ডিসট্যান্স স্কেল পরীক্ষা করল মুরল্যাণ্ড। 'ওরা কিন্তু দূরত্ব কমাবার কোন চেষ্টা করছে না।'

'হয়তো উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় আছে।'

'হায় বেচারা গানবোট!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুরল্যাণ্ড। 'জানে না বাড়াবাড়ি করলে বাতিল লোহার দোকানে ঠাঁই হবে।'

'সমস্যা আছে হে,' বলল রানা। 'এক ঝাঁক মালিয়ান ফাইটার আমাদের পুব দিকে চক্কর দিচ্ছে।'

আকাশে তাকাল মুরল্যাণ্ড। খানিক পর বলল, 'ফ্রেঞ্চ মিরেজ ফাইটার, মডিফায়েড মডেল। ছ'টা…না, সাতটা। পাঁচ থেকে ছ'কিলোমিটার দূরে।'

নদীর পশ্চিম দিকে আঙুল তুলল রানা। 'এখানেই শেষ নয়। তীর ঘেঁষে পাহাড় সারি দেখতে পাচ্ছ, তার পিছনে ধুলোর ওই মেঘ? আর্মারড কারের একটা কনভয়, বুঝলে।'

'ক'টা?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড, অবশিষ্ট মিসাইলগুলোর কথা ভাবছে সে।

'খোলা জায়গা দিয়ে যাবার সময় গুনেছি, চারটে।'

'ট্যাংক নেই?'

'আমাদের গতি ত্রিশ নট, ট্যাংক পিছিয়ে পড়বে।'

'এবার আর সারপ্রাইজ দেয়ার সুযোগ পাব না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'দূরে সরে থাকছে ওরা। প্রশ্ন হলো, জেনারেল ভিনসেন্ট কখন হামলা করার নির্দেশ দেবে?'

'ঘটে যদি বোমার চেয়ে সামান্য একটু বেশি বুদ্ধি থাকে, আর যদি সী কুইনকে নিজের জন্যে রাখতে চান, শুধু অপেক্ষা করলেই হবে। এক সময় তো পানি থেকে উঠতেই হবে আমাদের।'

'এক সময় ফুয়েলও ফুরিয়ে যাবে।'

'যাবে।' চুপ করে গিয়ে চওড়া, অলস নাইজার নদীর দিকে তাকাল রানা, বালিময় প্রান্তর ধরে বয়ে চলেছে। সোনালি-হলুদ সূর্য দিগন্তের দিকে নামতে শুরু করেছে, নীল আর সাদা বক উত্তপ্ত বাতাসে ডানা মেলে নেমে আসছে অগভীর পানিতে, সরু কাঠির মত পা। এক ঝাঁক নাইল পার্চ লাফিয়ে উঠল বাতাসে, আতসবাজির মত ঝলসে উঠল গায়ের রঙ, শান্ত পানির ওপর দিয়ে সী কুইন পিছু নিল ওগুলোর। ভাটির দিকে ভেসে গেল একটা পিনিস, কালো রঙ করা খোলের গায়ে চিত্র-বিচিত্র কত কি আঁকা, অল্প বাতাসে পালগুলো কোনরকমে ফুলে আছে। চালের বস্তার ওপর কয়েকজন মাঝি-মাল্লা ঘুমাচ্ছে, বাকিরা দাঁড় টানছে। চারদিকে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, রানার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করল না যে মৃত্যু ও ধ্বংস ওত পেতে আছে নদীর দু'পাশে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল মুরল্যাণ্ড। 'তুমি না বলছিলে, ভদ্রমহিলা মালিতে যাবেন?'

'জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের সঙ্গে জড়িত তিনি,' বলল রানা। 'মরুভূমিতে অদ্ভুত এক মহামারী ছড়িয়েছে, তদন্ত করার জন্যে মালিতে যাবার কথা তার, হ্যাঁ।'

'খুবই দুঃখের কথা যে তার সঙ্গে তুমি দেখা করতে পারছ না,' সহাস্যে বলল মুরল্যাণ্ড। 'আকাশে থাকবে মরুভূমির চাঁদ, তার কোমরে জড়িয়ে থাকবে তোমার হাত, মিষ্টি মধু বর্ষণ করবে তুমি তার কানে...'

'হট ডেট সম্পর্কে এই যদি তোমার ধারণা হয়, ভুলে যাও।'

'একজন জিয়োলজিস্টকে আর কিভাবে তুমি এণ্টারটেইন করাতে পারো?'

'বায়োকেমিস্ট,' শুধরে দিল রানা।

হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'ভেবে দেখেছ, আমরা যে টক্সিন খুঁজছি, ওরাও হয়তো সেটাই খুঁজছে?'

'ভেবেছি বৈকি।'

এই সময় নিচের ল্যাব থেকে উঠে এলেন রেডক্লিফ, চওড়া হাসি লেগে রয়েছে মুখে। 'পেয়ে গেছি,' বিজয়ীর সুরে ঘোষণা করলেন তিনি।

'কি পেয়ে গেছেন?' মুরল্যাণ্ড হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

উত্তর না দিয়ে শুধু হাসছেন রেডক্লিফ।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি আপনি পেয়েছেন?'

'গ্লপ? রেড টাইডকে যেটা উত্তেজিত করছে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

মাথা ঝাঁকালেন রেডক্লিফ। তাঁর হাতটা ধরে ঝাঁকাল রানা।

'প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম,' বললেন রেডক্লিফ। 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক্সপেরিমেণ্ট, মডিফিকেশন আর টেস্ট করার পর একটা এক্সোটিক অর্গানোমেটালিক কমপাউণ্ড আইডেনটিফাই করেছি আমি– অ্যালারটেড সিনথেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড আর কোবাল্টের কমবিনেশন ওটা।'

'শুনে মনে হচ্ছে গ্রীক,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'অ্যামিনো অ্যাসিড কি?'

'যার দ্বারা প্রোটিন তৈরি।'

'নদীতে সেটা আসে কি করে?' জানতে চাইল রানা।

'তা জানি না,' জবাব দিলেন রেডক্লিফ। 'আমার ধারণা, সিনথেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড এসেছে একটা জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং বায়োটেকনোলজি ল্যাবরেটরি থেকে, যেটার বর্জ্য কেমিকেল ও নিউক্লিয়ার বর্জ্যের সঙ্গে সোর্স এরিয়ায় ডাম্প করা হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে ওগুলো এক হয়েছে, এ হতে পারে না। নির্দিষ্ট কোন একটা জায়গায় ডাম্প করা হচ্ছে ওগুলো।'

'মাই গড!'

'পানিতে আমি রেডিয়েশনের হাই রিডিং পাচ্ছি,' বললেন রেডক্লিফ। 'যোগাযোগ একটা না থেকেই পারে না।'

রাডার স্ক্রীনে চোখ রেখে গানবোটটাকে আবার দেখল রানা, ওদের পিছনে দৃষ্টিপথের আড়ালে এখনও। আরও খানিক পিছিয়ে পড়েছে ওটা। মুখ তুলে আকাশে তাকাল ও। দূরেই রয়েছে ফাইটারগুলো, কাছে আসার কোন লক্ষণ নেই। নদী এদিকটায় কয়েক কিলোমিটার চওড়া হয়ে গেছে, আর্মারড কারগুলো

এখন আর দেখা যাচ্ছে না। 'আমাদের কাজ অর্ধেক শেষ হয়েছে,' বলল ও। 'বাকি কাজ শেষ হবে নাইজারের কোথায় টক্সিন ঢুকছে জানার পর। মালিয়ানরা আমাদের বিরুদ্ধে এখনও কিছু শুরু করেনি, কাজেই উজানে আমরা সার্ভের কাজ চালিয়ে যাব।'

'কিন্তু ড. রায় আর অ্যাডমিরালের কাছে রেজাল্ট পৌঁছে দেবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'উপায় একটা বের করে ফেলব।'

রানার কথায় আস্থা রাখলেন রেডক্লিফ, মাথা ঝাঁকিয়ে ফিরে গেলেন কেবিন ল্যাবে। মুরল্যাণ্ডের হাতে হেলম ধরিয়ে দিয়ে ডেক ম্যাটে শুয়ে পড়ল রানা, নিদ্রাদেবীর তাগাদায় সাড়া দিয়ে।

ঘুম ভাঙার পর দেখল সূর্য অর্ধেকের মত হারিয়ে গেছে দিগন্তে। তাড়াতাড়ি চেক করল রানা– গানবোট এখনও ওদের পিছনে লেগে আছে, তবে রিফুয়েলের জন্যে জেট ফাইটারগুলো ফিরে গেছে। একটু পরই ওর হাতে গরম এক মগ কফি ধরিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড। 'কাকে স্বপ্ন দেখলে? বলতে আপত্তি থাকলে শুনতে চাই না।'

'তোমার প্রেমিকাকে,' মুচকি হেসে জবাব দিল রানা। মুখ বন্ধ হয়ে গেল মুরল্যাণ্ডের। তারপর রানা জানতে চাইল, 'আমরা কি গাও ছাড়িয়ে এসেছি?'

'দু'ঘণ্টা ঘুমিয়েছ তুমি। গাওকে ছাড়িয়ে পঞ্চাশ কিলোমিটার এগিয়ে এসেছি। ভাসমান একটা ভিলা দেখার সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছ তুমি। রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল বিকিনি পরা মিস ইউনিভার্সেরা, আমাকে লক্ষ্য করে চুমো ছুঁড়েছে।'

'যাহ, বানিয়ে বলছ।'

তিনটে আঙুল খাড়া করল মুরল্যাণ্ড। 'স্কাউট'স অনার। এত সুন্দর হাউজবোট জীবনে আমি দেখিনি।'

'রেডক্লিফ কি এখনও স্ট্রং টক্সিন লেভেল পাচ্ছেন?'

মাথা ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। 'বলছেন, যত এগোচ্ছি আমরা ততই বাড়ছে লেভেল।'

'তারমানে কাছাকাছি চলে এসেছি।'

'উনিও তাই বলছেন।'

এক পলকের জন্যে রানার চোখের গভীরে কি যেন একটা ঝিক করে উঠল। আকস্মিক একটা ঝলক, যেন মস্তিষ্কের ভেতর কল্পনা করা কিছু একটার ছায়া পড়ল চোখের তারায়।

'তোমার ওই দৃষ্টিতে কি যেন আছে,' কৌতূহল প্রকাশ করল মুরল্যাণ্ড।

বাস্তব জগতে ফিরে এল রানা। 'ভাবছি কেউ যদি সী কুইনকে দখল করার স্বপ্ন দেখে, তার স্বপ্নটাকে ভেঙে দেয়া যায় কিনা।'

সূর্য অস্ত যাবার খানিক পর নিচ থেকে হাঁক ছাড়লেন রেডক্লিফ। 'আমরা পরিষ্কার পানিতে চলে এসেছি। আমার ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে এইমাত্র গায়েব হয়ে গেল

কনটামিনেশন!’

রানা ও মুরল্যাণ্ড সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে নদীর দুই তীরে তাকাল। কোনদিকেই কোন গ্রাম বা রাস্তা নেই, চার দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সমতল অনুর্বর ভূমি খাঁ খাঁ করছে। ‘খালি,’ বলল মুরল্যাণ্ড। ‘কামানো বগলের মত, খালি।’

ককপিটে উঠে এসে সী কুইনের পিছন দিকে তাকালেন রেডক্লিফ। ‘কিছু দেখতে পেলেন, মি. রানা?’

‘পুবদিকে শুকনো একটা নালা দেখতে পাচ্ছি।’ হাত তুলে দেখাল রানা। ‘এককালে হয়তো পানি ছিল।’

‘আমাদের কালে নয়,’ বললেন রেডক্লিফ।

প্রাচীন নালার দিকে তাকিয়ে মুরল্যাণ্ড বলল, ‘মি. রেডক্লিফ, আপনি স্বপ্ন দেখেননি তো? এদিকের নদীতে কিভাবে কনটামিনেশন ঢুকবে?’

‘সী কুইনকে ঘোরাও,’ বললেন রেডক্লিফ। ‘ডাটা রিচেক করব আমি।’

একবার নয়, বার কয়েক আসা-যাওয়া করল সী কুইন। কখনও তীর ঘেঁষে, কখনও মাঝখান দিয়ে। রাডারে দেখা গেল পিছনের গানবোট দাঁড়িয়ে পড়েছে। প্রতিপক্ষরা নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছে সী কুইনের আচরণে।

শেষবার ফিরে আসছে সী কুইন, হ্যাচ থেকে মাথা তুললেন রেডক্লিফ। ‘ঈশ্বরের দিব্যি, টক্সিনের হাইয়েস্ট কনসেনট্রেশন আসছে পুব পারের ওই নালা থেকে।’

শতাব্দী প্রাচীন শুকনো নালাটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা, চোখে সন্দেহ। পাথুরে তলা বাঁকা হয়ে চলে গেছে উত্তর দিকে, সেদিকে এক সারি নিচু বালিয়াড়ি। থ্রটল ‘অলস’-এ সেট করল রানা, ‘স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাচ্ছে সী কুইন। এই পয়েন্টের পরে টক্সিন নেই বলছেন?’ জিজ্ঞেস করল ও।

‘না,’ জবাব দিলেন রেডক্লিফ।

‘সয়েলের ন্যাচারাল বাই-প্রডাক্ট নয় তো?’ জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

‘এ-ধরনের একটা কমপাউণ্ড প্রকৃতির দান হতে পারে না,’ বিড়বিড় করলেন রেডক্লিফ।

‘বালিয়াড়ির পিছনে হয়তো একটা কেমিকেল প্লান্ট আছে,’ বলল রানা। ‘সেখান থেকে মাটির তলা দিয়ে নদীতে এসে পড়েছে ড্রেনেজ পাইপ। হতে পারে?’

‘আরও এক্সপেরিমেণ্ট ছাড়া বলা যাচ্ছে না। আমাদের যা করার করেছি, বাকিটা করবে কনটামিনেশন এক্সপার্টরা।’

সী কুইনের পিছন দিকে তাকিয়ে গানবোটটাকে দেখতে পেল রানা, এইমাত্র দৃষ্টিসীমার ভেতর বেরিয়ে এসেছে। ‘এখানে আমরা কি করছি তা ওদেরকে বুঝতে দেয়া যাবে না। সামনে এগোই, আমরা যেন এখনও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছি।’

‘সৌন্দর্যই বটে,’ তিক্ত গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। ‘নরকও বোধহয় এত বিপজ্জনক নয়।’

থ্রটল সামনে ঠেলে দিল রানা, বো উঁচু করে ছুটল সী কুইন। দু’মিনিটের

মধ্যে পিছিয়ে পড়ল গানবোট।

জেনারেল পিয়েত্রো ভিনসেন্ট কনফারেন্স টেবিলের শেষ মাথায় একটা লেদার এক্সিকিউটিভ চেয়ারে বসেছেন। তাঁর দু'পাশে বসেছেন মালির দু'জন কেবিনেট মিনিস্টার ও তাঁর মিলিটারি চীফ-অভ-স্টাফ। সিল্ক মোড়া দেয়ালে মডার্ন পেইন্টিং আর কার্পেট দেখে মনে হবে কোন বিল্ডিঙের অফিস কামরায় রয়েছেন ওঁরা। আসল ব্যাপারটা ধরা পড়ছে শুধু জেট এঞ্জিনের আওয়াজে।

এয়ারবাসটা জেনারেল ভিনসেন্টকে দেয়া স্যাভয় গাসকিলের উপহার। শর্ত ছিল, মালিতে নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারবেন গাসকিল, সরকারের আইন বা বিধি-নিষেধ তাঁর বেলায় প্রযোজ্য হবে না। সেই প্রথম থেকেই যখন যা চেয়েছেন গাসকিল, ভিনসেন্ট তা দিয়ে আসছেন, পরিবর্তে বিদেশী ব্যাংক অ্যাকাউন্টে তাঁর টাকার পরিমাণ দিনে দিনে শুধু বাড়ছেই।

চীফ-অভ-স্টাফ খাদিম হুসেনের মুখ থেকে বেনিন নেভির বিপর্যয় সম্পর্কে রিপোর্ট শুনছেন জেনারেল ভিনসেন্ট। সবশেষে খাদিম হুসেন দুটো রঙিন ফটো দেখালেন জেনারেলকে। সুপার ইয়টের ছবি, নদীর উজানে যাচ্ছে। 'প্রথম ফটোয় ইয়টে ফ্রেঞ্চ পতাকা উড়তে দেখা যাচ্ছে, তাই না? কিন্তু আমাদের দেশে ঢোকার পর পাইরেট ফ্ল্যাগ ওড়াচ্ছে ওরা।'

'এর মানে কি?' ব্যাখ্যা দাবি করলেন জেনারেল।

'জানি না,' স্বীকার করলেন কর্নেল খাদিম হুসেন। 'ফ্রেঞ্চ অ্যামব্যাসাডর বলছেন, এই বোট সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না।'

'কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই জানো বোটটা কোত্থেকে এল।'

'কোন দেশের বোট বা কোথায় তৈরি, কোন তথ্যই আমাদের ইন্টেলিজেন্স যোগাড় করতে পারেনি। আমেরিকা বা ইউরোপেও এই ডিজাইনের বোট কেউ দেখেনি।'

'তাহলে জাপানী কিংবা চাইনিজ হবে,' বললেন মালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী, হেইকল বোঁদে।

ছাগল দাড়িতে হাত বুলালেন কর্নেল হুসেন। 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স খবর নিয়ে দেখেছে, এ-ধরনের বোট সম্পর্কে তারাও কিছু জানে না।'

'তারমানে তুমি বলতে চাও এই বেআইনী অনুপ্রবেশ সম্পর্কে কোন তথ্যই তোমার কাছে নেই?' জেনারেল ভিনসেন্টের গলায় অবিশ্বাস।

'দুঃখিত, জেনারেল, সত্যি আমি কিছু জানি না।' হাত তুলে ব্যর্থতা স্বীকার করলেন কর্নেল হুসেন। 'এ যেন আল্লা আকাশ থেকে ফেলে দিয়েছেন।'

'নিরীহদর্শন একটা ইয়ট, মেয়েদের কাপড় বদলের মত পতাকা বদল করছে, ভেসে যাচ্ছে নাইজার নদীর উজানে,' ঠাণ্ডা সুরে বলে চলেছেন জেনারেল ভিনসেন্ট। 'আসার পথে বেনিন নেভীর অর্ধেকটা ধ্বংস করে দিয়েছে, মেরে ফেলেছে কমাণ্ডিং অ্যাডমিরালকে, অথচ আমার পাশে বসে তুমি বলছ ওটা সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হাত কচলাচ্ছেন কর্নেল হুসেন। 'আমি দুঃখিত, জেনারেল,

স্যার। নিয়ামেই ডকে যখন ছিল তখন যদি আমাকে অনুমতি দেয়া হত, একজন এজেন্টকে পাঠাতে পারতাম...।'

'নাইজার অফিসারদের ঘুষ দেয়া হয়েছে, রিফুয়েলিঙের সময় তারা যাতে বোটটার দিকে না তাকায়। আমি চাইনি একজন এজেন্ট গিয়ে ওদের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলুক।'

'ওরা কি আমাদের রেডিওর ডাকে সাড়া দিয়েছে?' জানতে চাইলেন হেইকল বোদে।

মাথা নাড়লেন কর্নেল হুসেন। 'না, আমাদের ওয়ার্নিং কানে তুলছে না ওরা।'

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আল মুজাহিদী বললেন, 'ওদের উদ্দেশ্য বা মিশন কি হতে পারে?'

'উদ্দেশ্য বা মিশন যাই হোক,' পররাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, 'বেআইনীভাবে আমাদের দেশে ঢুকেছে, এখন যদি আমরা ওটাকে দখল করে নিই, কার কি বলার আছে?'

'অ্যাডমিরাল বোমা সে চেষ্টা করেছিলেন, এই মুহূর্তে তিনি নদীর তলায় শুয়ে আছেন।'

'ওটায় মিসাইল লঞ্চার আছে,' বললেন হুসেন। 'অত্যন্ত শক্তিশালী।'

'প্রয়োজনীয় ফায়ার পাওয়ার আমাদেরও কম নয়।'

জেনারেল বললেন, 'ক্রু সহ বোটটা নাইজারে আটকা পড়েছে। ওদের পালাবার কোন পথ নেই। ফিরতি পথে সাগর এক হাজার কিলোমিটার দূরে। ওরা জানে, পালাতে চেষ্টা করলে আমাদের ফাইটার প্লেন আর গোলন্দাজ বাহিনী বাধা দেবে। কাজেই আমরা অপেক্ষায় থাকব। ফুয়েল শেষ হয়ে গেলে আত্মসমর্পণ না করে উপায় নেই। তখন সব প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে।'

'ওরা কি আর সত্যি কথা বলবে,' সন্দেহ প্রকাশ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আল মুজাহিদী।

'বলবে, বলবে,' তাড়াতাড়ি বললেন কর্নেল হুসেন। 'আমি বলাব।'

কো-পাইলটকে ককপিটে ঢুকতে দেখা গেল। 'বোটটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্যার।'

'পতাকাটা দেখার সুযোগ হলো,' বললেন জেনারেল ভিনসেন্ট। 'পাইলটকে বলো, ব্যবস্থা করুক আমরা যাতে পরিষ্কার দেখতে পাই।'

মুরল্যাণ্ড ও রানা, আওয়াজটা শুনতে পেয়ে একযোগে মুখ তুলে তাকাল– নদীর দু'শো মিটার ওপর দিয়ে উড়ে আসছে একটা প্লেন, নীলচে গোধূলিতে মিটমিট করছে রানিং লাইটগুলো। ধীরে ধীরে আকারে বড় হলো ওটা। প্যাসেঞ্জার জেট, ফিউজিলাজের একপাশে মালির জাতীয় পতাকা আঁকা। এসকর্ট হিসেবে দুটো বা তিনটে ফাইটার থাকলেই চলত, অথচ ওটাকে ঘিরে রেখেছে বিশটা। ভাব দেখে মনে হলো নদীর ওপর দিয়ে সোজা উড়ে যাবে, পাশ কাটাবে সী কুইনকে। কিন্তু না। দুই কিলোমিটার দূরে থাকতে ঘুরে গেল নাক, শুরু করল চক্কর দিতে, ধীরে

ধীরে ছোট করে আনছে বৃত্তটা। ফাইটারের ঝাঁকটা আরও ওপরের আকাশে উঠে গেছে, সেগুলোও চক্কর দিচ্ছে।

জেটের নাকে বসানো বিশাল রাডার ডোমটা দেখতে পেল রানা, ইতিমধ্যে একশো মিটারের মধ্যে চলে এসেছে ওটা। পোর্টে সেঁটে থাকা মুখগুলো দেখা যাচ্ছে এখন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে দেখছে সী কুইনকে। হাত নাড়ল রানা, তারপর নাটকীয় ভঙ্গিতে কুর্নিশ করল। 'ভাল চাও তো গোলমাল পাকিয়ো না, দোস্ত। মার খেয়ে মরবে।'

'কাকে কি বলছ তুমি?' এঞ্জিন রূমের মইয়ে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে মুরল্যাণ্ড, মিসাইল লঞ্চারকে লক্ষ্য করে লাফ দেয়ার জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি, তাকিয়ে আছে চক্কররত প্লেনটার দিকে।

ডেক চেয়ারে বসে আকাশযানের আরোহীদের উদ্দেশে অলসভঙ্গিতে হাতের ক্যাপ নাড়লেন রেডক্লিফ, রানাকে বললেন, 'অভিযানের নেতৃত্ব আপনার হাতে, সেটাকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি না, তবে আশা করি সৎ পরামর্শ দিলে আপনি মাইণ্ড করবেন না। আসুন আমরা আমাদের পৈত্রিক প্রাণ বাঁচাবার জন্যে সারেণ্ডার করি।'

'পালাবার কোন পথ নেই, তা আমিও দেখতে পাচ্ছি,' বলল রানা। 'তবে জুয়া খেলা আমার চিরকেলে নেশা, এ স্বভাব বদলাবার নয়।'

'কি করতে চান আপনি?'

'আমার ধারণা, জেনারেল ভিনসেন্ট সী কুইনের ওপর এতটাই লোভ করেছেন যে মালিতে ঢুকতে দেয়ার জন্যে নাইজার অফিসারদের ভেট পাঠাতেও কার্পণ্য করেননি। ফুল স্পীডে ইয়ট ছোটাব, যদি দেখি ওরা আমাদের ঘাড়ে পড়তে চাইছে, দু'একটাকে ফেলে দেব। এই ঝুঁকিটা আমি নিতে চাইছি এই জন্যে যে আমার বিশ্বাস ভিনসেন্ট ইয়টের গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত পড়তে দিতে চাইবেন না।'

'সবগুলো ডিম আপনি ভুল ঝুড়িতে রাখছেন,' তর্ক করছেন রেডক্লিফ। 'ওদের একটা প্লেনও যদি পড়ে, ভিনসেন্ট আমাদের ওপর তাঁর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।'

'আমারও তাই ধারণা।'

'কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তুমি পাগল হয়ে গেছ,' মুরল্যাণ্ডের গলায় সন্দেহ।

'কনটামিনেশন ডাটা,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'ওগুলো সংগ্রহ করতেই এখানে আমাদের আসা, মনে আছে?'

'মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই,' বললেন রেডক্লিফ। 'আপনার কোন প্ল্যান থাকলে বলুন।'

'ডাইভারশন ক্রিয়েট করা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না, যদি চাই আমাদের একজন ডাটা নিয়ে আফ্রিকা থেকে পালিয়ে যাবে।'

'দেখা যাচ্ছে সত্যি একটা প্ল্যান আছে তোমার,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'বলে যাও।'

'জটিল কিছু নয়,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'আর এক ঘণ্টা পর অন্ধকার হয়ে

যাবে। ইয়ট ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরব আমরা, খেলাটা ভিনসেন্টের একঘেয়ে লাগতে শুরু করার আগে পৌঁছে যাব গাও-এর কাছাকাছি। আপনি, রেডক্লিফ, সাঁতার দিয়ে তীরে উঠবেন। আতসবাজির খেলাটা দেখাব আমি আর ববি, ভাটির দিকে ছুটতে ছুটতে।'

'গানবোটটাকে পাশ কাটাতে হবে না? নাকি আশা করছেন ওরা নীরব দর্শকের ভূমিকা নেবে?'

'আমার সময়ের হিসেবে যদি ভুল না হয়, ওরা ভালভাবে বুঝতেই পারবে না কখন কিভাবে কেটে পড়েছি আমরা।'

'রানা' বলতে চাইছে,' বলল মুরল্যাণ্ড, 'গোলাগুলি শুরু হলে মালিয়ানদের নজর থাকবে শুধু আকাশের দিকে, নদীর দিকে কারও খেয়াল থাকবে না।'

'কিন্তু আমি কেন?' জানতে চাইলেন রেডক্লিফ। 'আপনাদের একজন নন কেন?'

'কারণ আপনিই আমাদের মধ্যে যোগ্যতম,' বলল রানা। 'আপনি বুদ্ধিমান, সাহসী...পিচ্ছিল। গাও এয়ারপোর্টে পৌঁছে কেউ যদি একটা প্লেন হাইজ্যাক করতে পারে তো আপনিই পারবেন। আমাদের মধ্যে আপনি একমাত্র কেমিস্টও বটেন। একমাত্র আপনার পক্ষেই টক্সিক কনটামিনেশন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব, আপনিই নদীতে ওটার এণ্ট্রি পয়েন্ট চিহ্নিত করেছেন।

'রাজধানী বামাকোয় পৌঁছে মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় নিতে পারি আমরা।'

'সম্ভাবনা কম। বামাকো এখান থেকে ছয়শো কিলোমিটার দূরে।'

'রানার কথায় যুক্তি আছে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমার আর ওর হলুদ পদার্থ এক করা হলেও গায়ে মাখার সাবানও তৈরি করা সম্ভব নয়।'

'আমি পালিয়ে গিয়ে তোমাদেরকে আত্মত্যাগের সুযোগ করে দেব, এতে আমি রাজি নই,' রেডক্লিফের গলায় জেদ। 'শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা তোমাদের চেয়ে আমার কম নয়।'

'কে বলল আমরা শহীদ হতে চাই?' হাসছে রানা। 'আপনাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়ার পর আমরা এমন একটা ব্যবস্থা করব, জেনারেল ভিনসেন্ট কোনদিনই সী কুইনের মজা উপভোগ করতে পারবেন না।' ইয়ট থেকে আমরাও পালাব, মরুভূমি পেরিয়ে পৌঁছুবার চেষ্টা করব টক্সিনের উৎসে।'

'কি?' হতভম্ব দেখাল মুরল্যাণ্ডকে। 'মরুভূমি পেরোব?'

'চিন্তা কোরো না,' আশ্বাস দিল রানা। 'মরুভূমিতে বাঘ-ভালুক নেই।'

'ওর কথাই ঠিক,' ম্লান সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। 'শহীদ হবার কোন ইচ্ছে সত্যি ওর নেই। ও আত্ম-ধ্বংসী হতে চায়।'

'আত্ম-ধ্বংসী?' শব্দটা পুনরাবৃত্তি করল রানা। 'দোস্ত, এইমাত্র তুমি জাদুর মন্ত্র উচ্চারণ করেছ।'

মাস্তুলের ডগায় যুক্তরাষ্ট্রের একটা বিশাল পতাকা উড়িয়েছে রানা. ফ্ল্যাগ লকার থেকে পেয়েছে। ওটা ওড়াবার পর পাইরেট ফ্ল্যাগটা নামিয়ে নিয়েছে পিছনের জ্যাকস্টাফ থেকে। আকাশের দিকে তাকাল ও। প্লেনগুলো এখনও উদ্দেশ্যবিহীন চক্কর দিচ্ছে আকাশে। ঘুরে গিয়ে তাকাল পিছনের ডোমে। শাটারগুলো বন্ধ। মুরল্যাণ্ড অবশিষ্ট মিসাইল ছোঁড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে না. রানার নির্দেশে ওগুলো সে ফুয়েল ট্যাংকের সঙ্গে বাঁধছে। বাঁধার কাজ শেষ হলে টাইমার/ডিটোনেটর লাগাবে। রেডক্লিফ রয়েছেন নিচে. জানে রানা. অ্যানালেসিস ডাটাটেপ আর ওয়াটার স্যাম্পল রেকর্ড প্লাস্টিকে মুড়ে ব্যাকপ্যাকে ভরছেন, খাবারদাবার ও সারভাইভাল গিয়ারের সঙ্গে।

রাডারের দিকে তাকাল রানা. মালিয়ান গানবোটের পজিশন আন্দাজ করে নিল। সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে. উত্তেজনায় গরম হয়ে উঠেছে শরীরের রক্ত। বড় করে শ্বাস টানল. থ্রটল পুরোপুরি খুলে দিয়ে হুইল ঘোরাল স্টারবোর্ডের দিকে।

প্রায় লাফিয়ে উঠে ঘুরে গেল সী কুইন. নদীর ওপর অর্ধবৃত্ত তৈরি করে ফুল স্পীডে ছুটল ভাটির দিকে. ফেনা আর পানির ছিটা ছড়াচ্ছে চারদিকে।

পতাকাটা পতপত করে উড়ছে দেখে রানা ভাবল, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন হয়তো ব্যাপারটাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন. কিন্তু ওয়াশিংটন রেগে বোম হয়ে যাবে। কিছু আসে যায় না। এটা নুমার জলযান. আর নুমা মার্কিন সরকারের একটা প্রতিষ্ঠান।

সামনে কোন বাধা নেই. নদীর পানিতে শুধু তারার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। সী কুইনের এখন যে স্পীড. সামনে কোন নৌকা বা বোট পড়লে স্রেফ গুঁড়ো হয়ে যাবে। স্পীডোমিটারের দিকে তাকাল রানা। সত্তরের ঘরে স্থির হয়ে আছে কাঁটা। তারপর রাডারের দিকে তাকাতেই দেখল মালিয়ান গানবোট স্ক্রীনের ঠিক মাঝখানে চলে এসেছে। চোখ তুলে সামনে, অন্ধকারে তাকাল ও। গানবোটের নিচু কাঠামোটা কোন রকমে আন্দাজ করা গেল. পথরোধ করার জন্যে নদীর মাঝখানে আড়াআড়ি হয়ে যাচ্ছে। কোন আলো জ্বলছে না. তবে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই যে ক্রুরা তাদের অস্ত্র ওর মাথার দিকে তাক করে আছে।

রানা জানে. ইয়টটাকে অক্ষত অবস্থায় পাবার জন্যে এখুনি ওরা গুলি করবে না। দুটো বোটের মাঝখানে এখনও কয়েকশো মিটার দূরত্ব। কিন্তু ওর ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। অকস্মাৎ বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেল. প্রবল একটা ঝাঁকি খেলো সী কুইন।

কমাণ্ড প্লেনে গর্জে উঠলেন জেনারেল ভিনসেন্ট. 'গানবোটের ক্যাপটেনকে কে

অনুমতি দিল? কার হুকুমে ফায়ার ওপেন করল সে?'

'সে বোধহয় নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' হতভম্ব দেখাচ্ছে কর্নেল হুসেনকে।

'আক্রমণ বন্ধ করতে বলো ওকে. এখুনি! বোটটা আমি অক্ষত অবস্থায় চাই।'

'ইয়েস স্যার!' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল কর্নেল. প্লেনের কমিউনিকেশন কেবিনের দিকে ছুটল।

'ইডিয়েট!' গাল পাড়ছেন জেনারেল। 'এত করে সাবধান করলাম আমি না বলা পর্যন্ত গুলি করা যাবে না। আমার নির্দেশ অমান্য করার অপরাধে ক্যাপটেন আর গানবোটের অফিসারদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।'

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেইকল বোঁদে বললেন. 'সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না?'

'আপনি চুপ করুন! আমাকে একটা সেনাবাহিনী চালাতে হয়. অপরাধ ক্ষমা করতে পারি না।'

স্ত্রী আর বাচ্চাকাচ্চার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় চুপ করে গেলেন হেইকল বোঁদে। জেনারেল ভিনসেণ্টের সঙ্গে কেউ লাগলে নিখোঁজ হয়ে যায় সে. সঙ্গে আত্মীয়স্বজনরাও।

মরুভূমির অন্ধকার চিরে ছুটে এল ভয়ঙ্কর ট্রেসারগুলো, প্রথম দিকে সী কুইনের বাম দিকের পানিতে পড়ল। শব্দ শুনে মনে হলো একসঙ্গে দশ-বারোটা কামান গর্জন করছে। ইয়টের পাশে বিস্ফোরিত হলো বিপুল পানি। তারপর গানারদের লক্ষ্য নির্ভুল আর নিখুঁত হতে শুরু করল। নদীর ওপর দিয়ে সোজা ছুটে এল ওগুলো. প্রায় পয়েণ্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে আঘাত করল সী কুইনকে। বো আর ফোরডেকে এবড়োখেবড়ো গর্ত তৈরি হলো, নাইলন লাইনের কয়েল আর ফোক্যাসলের অ্যাংকর চেইনে লেগে দিকভ্রান্ত না হলে বোটের ভেতর ঢোকার পথ করে নিত শেলগুলো।

প্রাথমিক আক্রমণটা এড়াবার উপায় ছিল না. কোন সময়ই তো পাওয়া যায়নি। হিসেবে ভুল হওয়ায় তাল হারিয়ে ফেলেছে রানা, মাথা নিচু করে এদিক ওদিক হুইল ঘোরাচ্ছে গোলার হাত থেকে বাঁচার জন্যে। আবার কিছুক্ষণ লক্ষ্য ভেদে ব্যর্থ হলো গানাররা।

লাইনের কয়েলে গোলা পড়েছে, ধোঁয়া আর আগুনের শিখা উঠছে ওখান থেকে। রানার চারদিকে ইনস্ট্রুমেণ্ট প্যানেল ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ভাগ্যই বলতে হবে যে এখনও কোন শেল লাগেনি ওর গায়ে, তবে গলার পাশ থেকে তরল ও উষ্ণ কি যেন একটা নেমে আসছে। বোকামি করায় নিজেকে তিরস্কার করছে ও। ওর নির্দেশেই তো লঞ্চার থেকে মিসাইলগুলো বের করে ফুয়েল ট্যাংকের সঙ্গে বেঁধেছে মুরল্যাণ্ড।

গানবোট একদম কাছে চলে এসেছে। মাজল ফ্ল্যাশের আলোয় ইচ্ছে করলে হাতঘড়ির ডায়াল দেখতে পারবে ও। উন্মত্তের মত হুইল ঘোরাচ্ছে. গানবোটের বোকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করল মাত্র দু'মিটার ফাঁক রেখে। পরমুহূর্তে পাশাপাশি চলে এল বোট দুটো. ইয়টের তৈরি ঢেউ আর স্রোত দুলিয়ে দিল গানবোটকে.

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গানাররা, গোলা আর গুলিগুলো কোন ক্ষতি না করে হারিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

কামানের গর্জন থেমে গেল, যদিও কারণটা বোঝার জন্যে পিছন দিকে তাকায়নি রানা। যখন তাকাল, গানবোটটা তখন অন্ধকারের ভেতর অনেক পিছনে। রাডারটা এখনও কাজ করছে, স্ক্রীনে ফাইটারগুলো নেই দেখে পরম স্বস্তি বোধ করল রানা।

ওর পাশে উদয় হলো মুরল্যাণ্ড। 'ইউ ওকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তোমরা?'

'ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়ায় এখানে সেখানে সামান্য চামড়া ছড়ে গেছে। তুমি কি জানো, তোমার গলার পাশে ছোট্ট এক টুকরো কাঁচ ঢুকেছে?'

'তুমি দেখতে পাচ্ছ, বের করে আনো।'

কাঁচের টুকরোটা চামড়া থেকে বের করে ফেলে দিল মুরল্যাণ্ড। নিচ থেকে উঠে এলেন রেডক্লিফ, মাথায় বরফ চেপে ধরে আছেন। বরফটা ফেলে দিলেন তিনি, দেখা গেল তার ডান পাশের খুলি আলুর মত ফুলে আছে। 'বোটের এই অবস্থা দেখে অ্যাডমিরাল জ্ঞান হারাবেন।'

মুরল্যাণ্ড বলল, 'এটা তিনি ফিরে পাবার আশা করেছিলেন বলে মনে হয় না।'

'আগুন নিভেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখনও ধোঁয়া উঠছে, এক্সটিংগুইশার নিয়ে যাচ্ছি আমি। প্লেনগুলো কোথায় বলো তো?'

'রাডারে মাত্র একটা দেখতে পাচ্ছি, বাকিগুলোর খবর নেই।'

'গাও কত দূরে?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'আশি কিলোমিটার। আরও এক দেড় ঘণ্টা শহরের আলো দেখা যাবে না।' কাউন্টার শেলফে রাখা পোর্টেবল রেডিওর দিকে তাকাল রানা। 'সময় হয়েছে, ওরা কি বলে শোনা যেতে পারে।' হেলমের দায়িত্ব মুরল্যাণ্ডের হাতে দিয়ে রেডিওটা অন করল ও। মাউথপীসে বলল, 'গুড ইভিনিং। আপনাকে আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?'

কিছুক্ষণ কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তারপর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'নিজের পরিচয় দিন।'

'আপনি আগে।'

'ঠিক আছে, আমি জেনারেল পিয়েত্রো ভিনসেণ্ট, চীফ অভ মালি সুপ্রিম মিলিটারি কাউন্সিল। আইডেনটিফাই ইওর শেলফ। আপনি কি কোন আমেরিকান ভেসেল কমাণ্ড করছেন?'

'এডওয়ার্ড টেক, কুইন অ্যানি'স রিভেঞ্জ-এর ক্যাপটেন।'

'প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছি আমি,' কঠিন সুরে বললেন জেনারেল ভিনসেণ্ট। 'কালো-দাড়ি জলদস্যুর সঙ্গে ভালই পরিচয় আছে। মস্করা বাদ দিয়ে সারেণ্ডার করুন।'

'আর যদি আমার অন্য কোনও প্ল্যান থাকে?'

'মালিয়ান এয়ারফোর্সের ফাইটার-বম্বার আপনাদেরকে ধ্বংস করে দেবে।'

'পারবে কি? আপনার গানাররা তো পারল না।'

'আমার সঙ্গে খেলবেন না!' সাবধান করে দিলেন জেনারেল। 'কে আপনি, আমার দেশে কি করছেন?'

'শখ করে মাছ ধরতে এসেছিলাম।'

'প্রলাপ না বকে সারেণ্ডার করুন!' গর্জে উঠলেন জেনারেল। 'তা না হলে ক্রু সহ সবাই আপনারা মারা পড়বেন।'

'ইয়টটা আপনি হারাতে চান?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সারা দুনিয়ায় এ জিনিস এই একটাই আছে। এটার যে কি ক্ষমতা, আমার ধারণা আপনি তা জানেন।'

অপরপ্রান্তে চুপ করে গেলেন জেনারেল। বিশ সেকেণ্ড পর মুখ খুললেন তিনি, 'পরলোকগত বন্ধু বোমার পরিণতি সম্পর্কে রিপোর্ট পেয়েছি। আমি আপনার বোটের ফায়ারপাওয়ার সম্পর্কে ধারণা রাখি।'

'এ-ও কি জানেন যে আপনার গানবোটটাকে আমরা পানির তলায় পাঠিয়ে দিতে পারি?'

'গুলি করা হয়েছে আমার নির্দেশ অমান্য করে, সেজন্যে আমি দুঃখিত।'

'আমরা ইচ্ছে করলে আকাশ থেকেও আপনাদেরকে ফেলে দিতে পারি,' বলল রানা।

মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করলেন জেনারেল ভিনসেন্ট, সম্ভাবনাটা নিয়ে তিনি চিন্তা করেছেন। 'আমি মারা গেলে আপনিও মারা যাবেন। তাতে কার কি লাভ হবে বলুন?'

'ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে দিন আমাকে, গাওতে পৌঁছুনো পর্যন্ত।'

'মানুষ হিসেবে আমি উদার,' বললেন জেনারেল, যেন ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। 'তবে গাওতে পৌঁছে থামতে হবে আপনাকে, শহরের ফেরি ডকে বোট ভেড়াবেন। পালাবার চেষ্টা করলে আকাশ থেকে গজব নেমে আসবে, মনে থাকে যেন।'

'বুঝতে পারছি, জেনারেল।' রেডিও বন্ধ করে দিয়ে হাসল মাসুদ রানা।

অন্ধকারের ভেতর ধীরে ধীরে ফুটে উঠল গাও শহরের আলো, পাঁচ কিলোমিটার দূরে। নদীর কিনারায় বোট সরিয়ে এনেছে রানা, রেডিও অন করে জেনারেল ভিনসেন্টের সঙ্গে কথা বলছে ও, এই ফাঁকে বোট থেকে নেমে গেলেন রেডক্লিফ।

'আপনার দেশ থেকে আমাদেরকে নিরাপদে চলে যেতে দেয়া হবে, এই প্রতিশ্রুতি পেলে বোটটা আপনাকে উপহার দিতে আমার কোন আপত্তি নেই,' রেডিওতে বলল রানা।

'আমি রাজি,' সঙ্গে সঙ্গে জানালেন জেনারেল।

'দূষিত একটা নদীতে গুলি খেয়ে মরতে চাই না আমরা।'

'আপনি উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী,' রানার প্রশংসা করলেন জেনারেল। তারপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলেন।

রানা জানে, হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় পাওয়া গেছে, তার বেশি কিছু

নয়। সন্দেহ নেই, ওদেরকে খুন করে শকুনকে দিয়ে লাশ খাওয়াবেন ভিনসেন্ট।
কি করা যায় ভাবছে রানা।

রানার কাঁধে টোকা দিয়ে সী কুইনের সামনে, বোর ডান দিকে হাত তুলল মুরল্যাণ্ড। 'আলোর মালা দেখতে পাচ্ছ? ওই হাউজবোটের কথাই বলেছিলাম তোমাকে। নিশ্চয়ই কোন বিলিওনেয়ারের ইয়ট, হেলিকপ্টার আছে, সুন্দরী মেয়েদের কথা কি আর বলব তোমাকে।'

'ভাবছি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম থাকলে ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত।'

'অন্তত ফ্যাক্স তো না থেকেই পারে না।'

মৃদু হাসল রানা, 'জরুরী কোন কাজ যখন নেই, গিয়ে একবার দেখলে হয় না?'

হেসে উঠে রানার পিঠ চাপড়ে দিল মুরল্যাণ্ড। 'যাই, ডিটোনেটর সেট করে আসি।'

মুরল্যাণ্ড ককপিট থেকে বেরিয়ে যেতেই একটা কম্পিউটরে কোর্স প্রোগ্রাম করে অটোমেটিক পাইলট এনগেজ করল রানা। ওরা নেমে যাবার পরও চওড়া নদী ধরে সামনে এগোবে সী কুইন।

ফিরে এল মুরল্যাণ্ড। রানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। রেডিও অন করে কথা বলল রানা, 'জেনারেল ভিনসেন্ট।'

'ইয়েস।'

'আমি আমার সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। বোটটা আপনার কপালে নেই। দিনটা আপনার ভাল কাটুক।'

নিঃশব্দে হাসছে মুরল্যাণ্ড। 'তোমার স্টাইল আমার ভারি ভাল লাগে।'

রেডিওটা পানিতে ফেলে দিল রানা। হাউসবোটের আরও কাছে চলে এল সী কুইন, সঙ্গে সঙ্গে থ্রটল পিছিয়ে আনল। স্পীড কমে বিশ নটে দাঁড়াতেই চিৎকার করল, 'নাউ!'

পিছনের ডেক ধরে ছুটল মুরল্যাণ্ড, লাফ দিল পানিতে। থ্রটল আবার সামনে ঠেলে দিয়ে রানাও পানিতে লাফিয়ে পড়ল সী কুইনের পাশ থেকে। পানি ঠাণ্ডা নয়, কাজেই ছ্যাঁকা লাগল না। এ পানি পেটে যাওয়া চলবে না, নিজেকে আগেই সাবধান করে দিয়েছে। পানি থেকে মাথা তুলে দেখল এক্সপ্রেস ট্রেনের মত গর্জন তুলে অন্ধকারের ভেতর তুমুল বেগে ছুটে যাচ্ছে সী কুইন। অপেক্ষা করছে রানা, মিসাইল আর ফুয়েল ট্যাংক বিস্ফোরিত হবে।

এক কিলোমিটার দূর থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজটা কানের পর্দা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করল। অদৃশ্য একটা ঘুসির মত লাগল শক ওয়েভ। আগুনের একটা কুণ্ড বিস্ফোরিত হতে দেখল রানা, সহস্র টুকরা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সী কুইন। আধ মিনিটের মধ্যে নিভে গেল সমস্ত আগুন। নিস্তব্ধতা নেমে এল নদীর বুকে, এখন শুধু নিঃসঙ্গ একটা প্লেনের যান্ত্রিক গুঞ্জন আর হাউজবোট থেকে পিয়ানোর আওয়াজ ভেসে আসছে।

রানাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মুরল্যাণ্ড। আকাশের দিকে একটা হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি ধারণা? শকুনগুলোকে বোকা বানানো গেছে?'

'আপাতত। তবে সহজে ওরা হাল ছাড়বে না।'

পাশাপাশি সাঁতরাচ্ছে ওরা। হাউসবোটটাকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। আপার ডেকের সামনের অংশে পাইলটহাউস। স্টার্ণ ডেকের মাঝখানে রয়েছে হেলিকপ্টারটা। তিন তলায় বিভক্ত, কাঁচ ঘেরা এট্রিয়াম ট্রপিক্যাল প্ল্যানটে ভরা। হুইলহাউসের পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির নমুনা। হাউসবোট তো নয়, যেন একটা ফ্যান্টাসি বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

ডুব সাঁতার দিয়ে হাউসবোটের গায়ে এসে মাথা তুলল ওরা। মালিয়ান গানবোটটাকে দেখা গেল, ভাটির দিক থেকে ফুল স্পীডে ছুটে আসছে। ব্রিজে অফিসারদের ছায়া দেখতে পেল রানা, তাকিয়ে আছে যেদিকে বিস্ফোরণ ঘটেছে। বোতে ক্রুদেরও দেখা গেল, হাতে অটোমেটিক রাইফেল, নদীর পানিতে কি যেন খুঁজছে। প্রায় একই সময়ে হাউসবোটের ডেকে বেরিয়ে এল লোকজন, উত্তেজিত সুরে কথা বলছে। আপার ডেকে ফ্লাডলাইট জ্বলছে, হাউসবোট ও চারপাশের পানি আলোকিত হয়ে আছে। রানার দেখাদেখি ডুব দিয়ে হাউসবোটের খোলের তলায় চলে এল মুরল্যাণ্ড, সেটা এত চওড়া যে উল্টোদিকে পৌঁছুতে প্রায় এক মিনিট লেগে গেল। পোর্ট ডেক সম্পূর্ণ খালি, লোকজন ভিড় করেছে স্টারবোর্ড সাইডে। রাবার বাম্পার ধরে ডেকে উঠে এল ওরা। বোটের লেআউট বুঝতে পাঁচ সেকেণ্ড সময় নিল রানা। গেস্ট স্যুইটগুলো এই ডেকেই। ওদেরকে ওপরে উঠতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে পরবর্তী ডেকে উঠে এল ওরা। উঁকি দিয়ে ডাইনিং সেলুনে তাকাল, আকারে ডিলাক্স হোটেল রেস্টুরেন্টের মত বড়, সেভাবেই সাজানো। থামল না ওরা, উঠে এল পাইলটহাউসের নিচের ডেকে। একটা দরজা খুলে উঁকি দিল রানা। দামী ফার্ণিচার ঠাসা একটা লাউঞ্জ, একদিকের দেয়াল জুড়ে বার। বারটেণ্ডার নেই, লোকজনও নেই, শুধু এক স্বর্ণকেশী মহিলা সামনে গ্র্যাণ্ড পিয়ানো নিয়ে বসে আছে। কীবোর্ডের ওপর চারটে খালি গ্লাস দেখা যাচ্ছে। পিয়ানো তো বাজাচ্ছেই, সেই সঙ্গে গাইছেও– পুরোপুরি মাতাল হয়ে পড়ায় কোনটাই ভাল পারছে না। হঠাৎ থেমে গেল সে, আধবোজা চোখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। 'বিড়াল তাড়া করেছে বুঝি?' বার দু'য়েক ঢেকুর তুলে জিজ্ঞেস করল।

বারের পিছনে আয়না, তাতে ভিজে টি-শার্টস্ আর শর্ট পরা দু'জন লোককে দেখতে পেল ওরা, খুলির সঙ্গে সেঁটে আছে চুল, মুখে কয়েক দিনের না কামানো দাড়ি। পানি থেকে উঠে আসা ইঁদুর মনে করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মহিলার চোখে চোখ রেখে নিজের ঠোঁটে একটা আঙুল চেপে ধরল রানা, তাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল একটা হলওয়েতে।

হলওয়েটা মনে হলো সীমাহীন। অসংখ্য প্যাসেজ, নানাদিকে চলে গেছে। 'রোড ম্যাপ আর মোটরসাইকেল পেলে সুবিধে হত,' বিড়বিড় করল মুরল্যাণ্ড।

প্রতিটি দরজায় চকচকে তামার প্লেট লাগানো, কাজেই কোনটা কি চিনতে অসুবিধে হলো না। হলওয়ের শেষ মাথার দরজায় লেখা রয়েছে– 'মি. গাসকিল'স

প্রাইভেট অফিস'।

'ইনিই বোধহয় এই ভাসমান প্রাসাদের মালিক,' বলল মুরল্যাণ্ড।

কথা না বলে দরজাটা খুলল রানা। ভেতরে ঢুকে মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা। কামরার মাঝখানে ফেলা হয়েছে স্প্যানিশ অ্যান্টিক কনফারেন্স টেবিল, সঙ্গে গ্রীন উল দিয়ে মোড়া দশটা চেয়ার। দেয়ালে সাজানো আর্টিফ্যাক্টগুলো ল্যাটিন আমেরিকান, কোন কোনটা দু'আড়াই হাজার বছরের পুরানো। দেয়ালে আরও বহু কিছুর সঙ্গে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ছবিও আছে। বিশাল অফিস স্যুইটের এখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে চকচকে মার্বেল পাথরের নারীমূর্তি। প্রতিটি বাল্কহেডের সামনে একটা করে কটনউড ট্রী, ছোট ছোট শাখায় বিশ্রাম নিচ্ছে বিবস্ত্র পরীরা। জানালাগুলোয় উইলোর ডাল দিয়ে বানানো শাটার ব্যবহার করা হয়েছে। রানার যেন বিশ্বাসই হতে চাইছে না একটা বোটে রয়েছে ওরা।

বিশাল ডেস্কের ওপর প্রাচীন যুগের পটারি দেখা গেল। একটা কেবিনেটের মাথায় রয়েছে কমপ্লিট কমিউনিকেশন সিস্টেম।

দেরি না করে ফোন কনসোলের সামনে চলে এল রানা। থরে থরে সাজানো বোতাম আর ডায়ালের ওপর চোখ বুলাল কিছুক্ষণ। তারপর চাপ দিল নাম্বারগুলোয়। কান্ট্রি আর সিটি কোড দেয়ার পর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রাইভেট নাম্বার যোগ করল ও। কনসোলের স্পীকার থেকে যান্ত্রিক শব্দজট ভেসে এল। তারপর হঠাৎ কোন আওয়াজ নেই। এক মিনিট পর শুরু হলো রিঙ।

তারপর ভেসে এল একটা নারীকণ্ঠ। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন'স অফিস।'

জাতিসংঘের ট্যাকটিকাল টীমের সঙ্গে মীটিঙে ছিলেন অ্যাডমিরাল, খবর পেয়েই লাইনে চলে এলেন। রানা তাঁকে বলল, 'বেশি সময় দেয়া যাচ্ছে না, আপনার রেকর্ডার অন করুন, প্লীজ।'

'অন করাই আছে, মাই বয়।'

'কেমিকেল ভিলেনকে রেডক্লিফ চিহ্নিত করতে পেরেছেন। ডাটা নিয়ে রওনা হয়েছেন, গাও এয়ারপোর্ট থেকে প্লেনে চড়ার চেষ্টা করবেন। আমরা জানি নাইজারের কোথায় কমপাউণ্ডটা ঢুকছে। সত্যিকার উৎস উত্তর মরুভূমির কোথাও, খুঁজে বের করতে হবে। ভাল কথা, সী কুইন আমরা ডুবিয়ে দিয়েছি...।'

দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ হলো, তারপরই শোনা গেল মুরল্যাণ্ডের গলা। 'ওরা আসছে! কি করি এখন?'

'তোমরা এখন কোথায়, রানা?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'গাসকিল নামে কোন ধনীলোকের নাম শুনেছেন?'

'স্যাভয় গাসকিল, ফ্রেঞ্চ টাইকুন? তাঁর সম্পর্কে শুনেছি...'

রানা কিছু বলার আগেই বিস্ফোরিত হলো দরজা, ছ'জন হোঁৎকা চেহারার ক্রু ধাওয়া করল মুরল্যাণ্ডকে। রুখে দাঁড়িয়ে তিনজনকে কাবু করল মুরল্যাণ্ড, তারপর বাকি তিনজনের নিচে চাপা পড়ল।

'গাসকিলের হাউসবোটে আমরা অনিমন্ত্রিত অতিথি, অ্যাডমিরাল,' দ্রুত বলল

রানা। 'সরি, আমাকে ছাড়তে হচ্ছে।' রিসিভার নামিয়ে রাখল ও, চেয়ার না ছেড়েই ঘুরে তাকাল ডেস্কের ওপর দিয়ে।

অফিস স্যুইটে ঢুকলেন স্যাভয় গাসকিল। সাদা ডিনার জ্যাকেটের বোতামে হলুদ একটা গোলাপ। একটা হাত কায়দাদুরস্ত ভঙ্গিতে জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে ঢোকানো, কনুইটা সামনের দিকে ভাঁজ হয়ে আছে। আহত ক্রু আর মুরল্যাণ্ডকে এমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাশ কাটালেন, ওখানে যেন আবর্জনা পড়ে আছে। তারপর থামলেন তিনি, ঠোঁটের কোণে ঝুলতে থাকা সিগারেট থেকে নীল ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তাঁর ব্যক্তিগত ডেস্কে বসে থাকা লোকটাকে দেখলেন তিনি। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হাত দুটো বুকে ভাঁজ করা, গাসকিলের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'গুড ইভিনিং,' সবিনয়ে বলল ও।

'আমার বোটে কি করছেন আপনি?' ব্যাখ্যা দাবি করলেন গাসকিল।

'আপনার ফোনটা ধার করা খুব জরুরী ছিল। আশা করি আমরা আপনাদের রসভঙ্গ করিনি। কল চার্জ, সেই সঙ্গে দরজার ক্ষতিপূরণ দিতে কোন আপত্তি নেই আমাদের।'

'আপনি অনুমতি নিতে পারতেন, ভদ্রলোকের মত বলতে পারতেন ফোনটা ব্যবহার করতে চান।'

'আমাদের এই চেহারা দেখে আপনি অনুমতি দিতেন?'

'না, বোধহয় না।'

প্যাড আর কলম নিয়ে খস খস করে কিছু লিখল রানা, কাগজটা ছিঁড়ে চেয়ার ছাড়ল, এগিয়ে এসে বাড়িয়ে ধরল গাসকিলের দিকে। 'বিলটা আপনি এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। আপনার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল, এবার আমাদেরকে যেতে হয়।'

জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট একটা অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে এল হাতটা। 'আমার আতিথেয়তা গ্রহণ করে থাকছেন আপনারা,' বললেন গাসকিল। 'সময়টা উপভোগ করুন। তারপর আপনাদেরকে মালিয়ান সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে তুলে দেয়া হবে।'

টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করানো হলো মুরল্যাণ্ডকে। তার একটা চোখ এরইমধ্যে বুজে এসেছে, নাক থেকে এক ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল কার্পেটে। 'আপনি কি আমাদের আটক করছেন?' জিজ্ঞেস করল সে।

মুরল্যাণ্ডের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালেন গাসকিল, সে যেন চিড়িয়াখানার কোন প্রাণী। 'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন আপনি।'

রানার দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'দুঃখিত,' মুখ হাঁড়ি করে বলল সে। 'এর জন্যে দায়ী বিকিনি পরা মেয়েগুলো। না ওদের দেখি, না এই বোটের কথা বলি, আর না এখানে আটক হই।'

নুমা হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙের কনফারেন্স রুমে ফিরে এসে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন, 'ওরা বেঁচে আছে।'

টেবিলে বসে আছেন দুই ভদ্রলোক। একজন জেনারেল ইউজিন ইথার, ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল রেসপন্স অ্যাণ্ড ট্যাকটিক্যাল টীমের সিনিয়র কমাণ্ডার তিনি। তাঁর পাশে বসে আছেন কর্নেল মিরাক, তাঁর সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড। ওদের সামনে টেবিলের ওপর পশ্চিম সাহারার বড় একটা ম্যাপ রয়েছে, সঙ্গে মালিয়ান মিলিটারি ও সিকিউরিটি পুলিস ফোর্সের রিপোর্ট।

'তাহলে ওদেরকে উদ্ধার করার প্ল্যানটা বহাল থাকছে, এখন আমরা কাজ শুরু করলেই পারি,' বললেন জেনারেল ইথার।

'লোকেশন?' জানতে চাইলেন কর্নেল মিরাক, অত্যন্ত সুদর্শন তিনি।

'একজন প্লেন হাইজ্যাক করার জন্যে রওনা হয়েছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'বাকি দু'জন নাইজার নদীতে, একটা হাউসবোটে রয়েছে। বোটটা স্যাভয় গাসকিলের।'

'ও, আচ্ছা, কাঁকড়া,' বললেন মিরাক।

'আপনি তাঁকে চেনেন?'

'তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতি সম্পর্কে জানি। বিরাট ধনী, বলা হয় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার আছে তাঁর। প্রতিদ্বন্দ্বী আর বিজনেস পার্টনাররা প্রায়ই গায়েব হয়ে যায়, লাভজনক বিশাল সব কর্পোরেশন একা পেয়ে যান তিনি, সেজন্যেই নিন্দুকরা তাঁর নাম দিয়েছে কাঁকড়া। শোনা যায় সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুর তিনি। আপনার বন্ধুরা ভাল লোকের পাল্লায় পড়েছেন।'

'ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটির সঙ্গে জড়িত?' প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'সন্দেহ নেই, তবে এমন কোন প্রমাণ রাখেন না যা দেখে আইন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে। ইন্টারপোলে তাঁর ফাইলটার ওজন হবে দশ কেজির কম নয়। আমার এক বন্ধু জানিয়েছেন।'

জেনারেল ইথার বললেন, 'গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যময় লাগছে। আন্তর্জাতিক কোন সঙ্কট দেখা না দিলে ইউএন ক্রিটিকাল রেসপন্স অ্যাণ্ড ট্যাকটিকাল টীমকে পাঠানো হয় না। নুমার তিনজন লোককে মালি থেকে উদ্ধার করা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ, আমি বুঝতে অক্ষম। তবু যখন জাতিসংঘের মহাসচিব নির্দেশ দিয়েছেন...' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'গাও এয়ারপোর্টে কাকে আমরা পাব, তার নাম কি, অ্যাডমিরাল?'

'জর্জ রেডক্লিফ,' বললেন হ্যামিলটন। 'তাঁকে উদ্ধার করাটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

'কি করে বুঝব, ইতিমধ্যেই তিনি কোন প্লেনে উঠে পড়েননি?' জিজ্ঞেস

করলেন কর্নেল মিরাক।

'ফ্লাইট শেডিউল চেক করে দেখেছি আমরা, তালিকায় তাঁর নাম নেই,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'কোন প্লেনও হাইজ্যাক হয়নি।'

সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ডের দিকে তাকালেন জেনারেল ইথার। 'এসো, মিরাক, প্ল্যানটা ফাইনাল করে ফেলি।'

অলড্রফ অ্যাস্টোরিয়া হোটেলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে লায়লা লাজুলি। জাতিসংঘের ভারতীয় অ্যামব্যাসাডরের প্রেস সেক্রেটারি ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিলেন, ডিনার শেষ করে বেরিয়ে এসেছে সে, টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে অপেক্ষা করছে তার গাড়ির জন্যে। গাড়ি-বারান্দায় কালো একটা লিংকন এসে দাঁড়াল, ডোরম্যানের মেলে ধরা ছাতার নিচে চলে এল লাজুলি, লম্বা স্কার্ট উঁচু করে ধরে গাড়ির ব্যাক সীটে উঠে বসল।

ভেতরে আগে থেকেই বসে আছেন মঈন জাহাঙ্গীর। লাজুলির হাত ধরে উল্টোপিঠে চুমো খেলেন তিনি। 'এভাবে দেখা করতে হলো বলে দুঃখিত। আশা করি তুমি বুঝবে, তোমার স্বার্থেই গোপনীয়তা দরকার।'

'এ আমাকে তোমার এড়িয়ে থাকার অজুহাত,' নরম অভিমানের সুরে বলল লাজুলি। 'তবু ভাগ্য আমার যে এতদিন পর আমার কথা তোমার মনে পড়ল।'

সামনের ও পিছনের সীটের মাঝখানে কাচের দেয়াল আছে, শোফার ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। জাহাঙ্গীর বললেন, 'না, লাজুলি, অজুহাত নয়। তুমি যদি শুধু জাতিসংঘ মহাসচিবের ভাগ্নী হতে, কথা ছিল। তুমি তাঁর পার্সোন্যাল সেক্রেটারি, কাজেই তোমার ওপর মিডিয়ার কড়া নজর আছে। আমি বিবাহিত লোক, আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখলে তোমারই ক্ষতি হবে, সেজন্যেই দূরে সরে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে আমাকে।'

'মঈন, আমি এখনও তোমাকে ভালবাসি। তুমিও আমাকে ভালবাসতে, কিন্তু বিয়ে করলে আরেকজনকে। আমার উচিত ছিল তোমার কথা ভুলে যাওয়া, কিন্তু...,' অসহায়ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল লাজুলি। 'ভুলতে তো পারিইনি, বরং তোমাকে আমি আজও নানাভাবে সাহায্য করছি। আমি সুপারিশ না করলে ফ্রেঞ্চ সিটিজেনশিপ পেতে না তুমি, জাতিসংঘে তোমার চাকরিও হত না।'

'সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, লাজুলি।'

'যাক এসব কথা। হঠাৎ দেখা করতে চাইলে কেন?'

'একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য দরকার আমার।'

দীর্ঘশ্বাস চাপল লাজুলি। 'শুধু সাহায্য দরকার হলে আমার কথা মনে পড়ে, তাই না? তুমি সাহায্য চাইছ, নাকি তোমার ফ্রেঞ্চ সরকার?'

মাথা নিচু করে বসে থাকলেন জাহাঙ্গীর।

'কি সাহায্য বলো।'

'হু-র এপিডিমিয়োলজি টীম মালির মরুভূমিতে রহস্যময় একটা রোগ সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে গেছে,' বললেন জাহাঙ্গীর। মাথা ঝাঁকাল লাজুলি,

অর্থাৎ ব্যাপারটা তার জানা আছে। 'আমার দায়িত্ব হলো ওদের ট্রাভেল কোঅর্ডিনেট করা এবং লজিস্টিক, ফুড, ট্র্যান্সপোর্টেশন, ল্যাব ইকুইপমেন্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।'

'টীমের লীডার ড. সুনারিল, তাই না? ওদের কোন সমস্যা হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ, বিকট একটা সমস্যায় পড়েছেন ওঁরা। আমি চাই টীমটাকে ফিরিয়ে আনুক হু। কারণ, আমার কাছে রিপোর্ট আছে, তা না হলে ওঁদেরকে খুন করা হবে।'

'কি বলছ! ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের লোকজনকে কেন কেউ খুন করতে যাবে?'

'খুন করবে পশ্চিম আফ্রিকার টেরোরিস্টরা,' বললেন জাহাঙ্গীর। 'আমি খবর পেয়েছি ওদের প্লেনে বোমা রাখা হবে, সেটা ফাটবে প্লেনটা যখন মরুভূমি পাড়ি দেবে।'

'সত্যি যদি ব্যাপারটা এরকম সিরিয়াস হয়, তুমি ড. সুনারিলের সঙ্গে যোগাযোগ করোনি কেন? আমার কাছে আসার কি কারণ?' লাজুলি বিস্মিত।

'ড. সুনারিলকে সাবধান করেছি, কিন্তু তিনি আমার কথা কানে তুলছেন না।'

'মালি সরকারকে জানিয়েছ? টীমের নিরাপত্তার দিকটা তারাই তো দেখবে।'

'কে, জেনারেল ভিনসেন্ট?' হাসলেন জাহাঙ্গীর। 'উনি বিদেশীদের একদমই সহ্য করতে পারেন না। আমার কথা বিশ্বাস করো, লাজুলি। আমার একমাত্র চিন্তা ড. সুনারিল আর তাঁর লোকজনদের নিয়ে। টীমটাকে ফিরিয়ে না আনলে…'

আপনমনে বিড়বিড় করছে লাজুলি, 'ঘটনাটা কি, আজকাল সবাই দেখছি মালিতে কনটামিনেশন খুঁজে বেড়াচ্ছে। আবার এমন বিপদে জড়িয়ে পড়ছে, তড়িঘড়ি উদ্ধার না করলে মারা পড়বে!'

হতভম্ব দেখাল জাহাঙ্গীরকে, তবে কথা বলল না, আশা করছে লাজুলি নিজে থেকেই ব্যাখ্যা দেবে।

'নুমার ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও আমাকে অনুরোধ করেছেন, আমি যেন মহাসচিবকে বলে তাঁর একটা টীমকে মালি থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করি।'

'আমেরিকানরাও মালিতে কনটামিনেশন খুঁজছে?'

'ওদেরটা আণ্ডারকাভার অপারেশন। মালির সিকিউরিটি ফোর্স বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'ঠিক কোথায় তদন্ত করছে ওরা?' বিচলিত দেখাল জাহাঙ্গীরকে।

'নাইজার নদীতে।'

'তদন্ত এগিয়েছে কতদূর?'

'একটা কেমিকেল কমপাউণ্ডের উৎস খুঁজছে ওরা, যেটা আফ্রিকান উপকূলে রেড টাইড সৃষ্টি করার জন্যে দায়ী। একটা বোট আর কেমিকেল অ্যানালেসিস ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করছে…'

'উৎসটা খুঁজে পেয়েছে?' জাহাঙ্গীর উত্তেজিত।

'অ্যাডমিরাল বললেন মালির গাও বা গাও-এর কাছাকাছি কোথাও।'

'গোটা ব্যাপারটাই আসলে ভুল তথ্যে ঠাসা,' প্রতিবাদের সুরে বললেন জাহাঙ্গীর।

'কি বলতে চাও? অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন মিথ্যে কথা বলছেন? তুমি যেমন প্রায়ই বলে থাকো?'

কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেলেন জাহাঙ্গীর।

লাজুলি বলল, 'কি যেন গোপন করে যাচ্ছ তুমি।'

'আরে না, কি গোপন করব...,' সামনের কাচে টোকা দিয়ে ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন মঙ্গন জাহাঙ্গীর। ইঙ্গিতে ফুটপাথ দেখালেন।

ফুটপাথের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। লাজুলি ম্লান সুরে বলল, 'তুমি চলে যাচ্ছ?'

'প্লীজ, লাজুলি, আমাকে তুমি ক্ষমা করো।'

'না, কক্ষনো না! তোমাকে আমি কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না। মঙ্গন, আর আমাদের দেখা হবে না। কাল দুপুরের মধ্যে তোমার রেজিগনেশন লেটার আমার টেবিলে আমি দেখতে চাই। তা না হলে তোমাকে বরখাস্ত করা হবে।'

'লাজুলি, প্লীজ...,' অনুনয়-বিনয় শুরু করলেন জাহাঙ্গীর।

তাকে থামিয়ে দিয়ে গাড়ির দরজা খুলল লাজুলি, 'আর কোন কথা নয়, বেরিয়ে যাও। আমি বুঝতে পেরেছি, তোমার কোন অসৎ উদ্দেশ্য আছে। বেরোও!'

দশ মিনিট পর একটা রেস্তোরাঁ থেকে ফোন করলেন জাহাঙ্গীর। 'আমার কাছে মসিয়ে গাসকিলের জন্যে জরুরী তথ্য আছে।'

'কোত্থেকে বলছেন আপনি? নিজের পরিচয় দিন।'

রেস্তোরাঁর নাম জানালেন জাহাঙ্গীর, তারপর বললেন, 'আমি ফ্রেঞ্চ সরকারের স্বার্থ দেখি, জাতিসংঘে আছি। তথ্যটা খুব জরুরী। বিপদটা শুধু মসিয়ে গাসকিলের নয়, ফ্রেঞ্চ সরকারেরও পতন ঘটতে পারে।'

'ঠিক আছে, আমি আসছি আপনার কাছে।'

গাসকিলের ক্রুরা হ্যাণ্ডকাফ পরাল ওদের, একটা স্টীম পাইপে জড়ানো খাটো চেইন হ্যাণ্ডকাফের সঙ্গে আটকে দেয়ায় বাধ্য হয়ে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গি নিতে হলো। ভারি স্টীল প্লেটিং-এর নিচে আটকে রাখা হয়েছে ওদেরকে, ওপরের ডেকে এঞ্জিন আর পাওয়ার-জেনারেটিং রূম। ইস্পাতের ডেকে একজন গার্ড হাতে অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে পায়চারি করছে।

পালানোর কোন উপায় নেই। রানা ও মুরল্যাণ্ড দু'জনেই জানে শিগগিরই ওদেরকে জেনারেল ভিনসেন্টের সিকিউরিটি ফোর্সের হাতে তুলে দেয়া হবে। কোন সন্দেহ নেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার মাধ্যমে ওদের অস্তিত্বের অবসান ঘটানো হবে।

শর্টস পরে আছে ওরা, অনাবৃত হাঁটুর চামড়ায় উত্তপ্ত ধাতব মেঝে ছ্যাঁকা দিচ্ছে। স্টীম পাইপ থেকে আগুনের আঁচ বেরিয়ে আসছে, দর দর করে ঘামছে

ওরা। সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে মুরল্যাণ্ড, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে তার।

রানার দিকে তাকাল সে। 'মি. রেডক্লিফ কি...তোমার কি মনে হয়?'

'বোধহয় পালাতে পেরেছেন,' আশা প্রকাশ করল রানা।

'এভাবে আমাদের ঘাম ছুটিয়ে ফ্রেঞ্চ ধন কুবেরের কি লাভ?' বাহু দিয়ে মুখের ঘাম মুছে জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'শুধু বিনা অনুমতিতে একটা টেলিফোন করার অপরাধে এরকম গরম একটা বাক্সে আটকে রাখবে, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল রানা।

'মানুষ যে কত ইতর হতে পারে, তুমি জানো না।'

দু'জনেই দুর্বল বোধ করছে, কথাবার্তা বেশিক্ষণ এগোল না। মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই, তারপরও কাজ করছে মাথা। মূল সমস্যা চেইন। কোনভাবে যদি স্টীম পাইপ থেকে খুলে ফেলা যেত!

ডেক থেকে নেমে এসে মেঝের একটা প্লেট খুলে সরিয়ে ফেলল গার্ড। বেল্ট থেকে চাবি বের করল, চেইনের সঙ্গে আটকানো হ্যাণ্ডকাফও খুলে দিল। এঞ্জিন রূমে চারজন ক্রু দাঁড়িয়ে। ঝুঁকল তারা, ধরাধরি করে রানা আর মুরল্যাণ্ডকে দাঁড় করাল, টেনে নিয়ে চলল এঞ্জিন রূমের ভেতর দিয়ে।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠল তারা, পৌঁছুল কার্পেট মোড়া হলওয়েতে। টোকা দিয়ে একটা দরজা খুলল, ঠেলে দিল কামরার ভেতর।

লম্বা একটা লেদার কাউচে বসে সরু একটা সিগার ফুঁকছেন স্যাভয় গাসকিল, বাঁ হাতে কনিয়াক ভরা গ্লাস। তাঁর মুখোমুখি চেয়ারে মিলিটারি ইউনিফর্ম পরা একজন অফিসার বসে আছেন, হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস। ঝড়ো কাকের মত তাঁদের সামনে দাঁড়াল ওরা দু'জন, ঘামে ভিজে আছে চুল আর চামড়া।

'নদী থেকে এই নমুনা তুলেছেন?' সকৌতুকে জানতে চাইলেন অফিসার।

'আসলে নিজেদের ইচ্ছায় এসেছেন ওঁরা,' বললেন গাসকিল। 'আমার কমিউনিকেশন ফ্যাসিলিটি ব্যবহার করছিলেন, হাতে-নাতে ধরে ফেলি।'

'তারমানে কি ওরা কোন মেসেজ পাঠাতে পেরেছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন গাসকিল। 'আমার পৌঁছুতে দেরি হয়ে যায়।'

টেবিলে গ্লাস রেখে চেয়ার ছাড়লেন অফিসার, হেঁটে এসে রানার সামনে দাঁড়ালেন। 'আপনাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন?'

রানার কপাল নিভাঁজ হলো। 'আপনি নিশ্চয়ই জেনারেল ভিনসেন্ট।'

'অবশ্যই।'

'গলার আওয়াজ শুনে ভেবেছিলাম প্রকাণ্ড পুরুষ হবেন, চোখ হবে আগুনের বল...' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনি যথেষ্ট লম্বা, কিন্তু গায়ে মাংস বলতে কিছু নেই কেন? আর এরকম সরু কাঠামো থেকে এমন ভরাট আওয়াজই বা বেরোয় কিভাবে?'

ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল জেনারেলের চেহারা, দাঁতে দাঁত চাপলেন তিনি, বুট পরা পা তুলে লাথি ছুঁড়লেন রানার তলপেট লক্ষ্য করে।

লাথিটা সর্বশক্তি দিয়ে মারলেন ভিনসেন্ট। বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে,

হাত দুটো লোহার আঙটার মত আটকে ফেলল জেনারেলের পা। রানা নড়ল না, পাটাও একপাশে সরিয়ে দিল না। জেনারেলকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখল ও। তারপর ধীরে ধীরে ঠেলে দিল পিছন দিকে, দেখা গেল আবার নিজের চেয়ারে বসে পড়েছেন জেনারেল।

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। হতভম্ব দেখাচ্ছে জেনারেলকে। এক দশক ধরে মালির ডিকটেটর তিনি, তাঁর মন অধস্তন লোকদের বেয়াদবি মেনে নিতে রাজি নয়। সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপবে মানুষ, এটাই নিয়ম, এতদিন দেখেও এসেছেন তাই। হাঁপাচ্ছেন তিনি, চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। ধীরে ধীরে সাইড হোলস্টার থেকে অস্ত্রটা বের করলেন। রানা দেখল, ওটা একটা নাইন-মিলিমিটার বেরেটা। সেফটি অফ করে রানার দিকে লক্ষ্যস্থির করলেন জেনারেল।

আড়চোখে তাকিয়ে রানা দেখল মুরল্যাণ্ড লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। জেনারেলের হাতের দিকে তাকাল আবার, আঙুল সামান্য একটু নড়লেই লাফ দেবে নিজেও। তবে জানে, এ যাত্রা প্রাণ বাঁচানো সম্ভব নাও হতে পারে।

উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, একটা হাত নেড়ে কর্তৃত্বের সুরে কথা বলে উঠলেন গাসকিল, 'কিছু যদি মনে না করো, জেনারেল, মৃত্যুদণ্ড তুমি অন্য কোথাও কার্যকর করো, এখানে নয়।'

'ওই লোকটা মরতে যাচ্ছে,' হিসহিস করে বললেন ভিনসেণ্ট, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

'কিন্তু আমার দামী কার্পেটের কথা ভাববে না তুমি?'

'আমি নতুন একটা কিনে দেব,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললেন ভিনসেণ্ট।

'ব্যাপারটা তুমি ধরতে পারোনি, বন্ধু,' হাসলেন গাসকিল। 'উনি তোমাকে উত্তেজিত করছেন– কেন বলো তো? নির্যাতন সহ্য করে ধীরে ধীরে মরার চেয়ে এক পলকে বিনা যন্ত্রণায় মরতে চাইছেন উনি।'

পিস্তলটা নামিয়ে নিলেন জেনারেল। নেকড়ের হাসি ফুটল ঠোঁটে। 'ঠিক ধরেছ। ওকে কথা বলাতে পারলে আমরা দু'জনেই উপকৃত হতে পারি।' চেয়ার ছাড়লেন তিনি, এবার দাঁড়ালেন মুরল্যাণ্ডের সামনে। অটোমেটিকটা মুরল্যাণ্ডের পেটে চেপে ধরে বললেন, 'বোট সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন।'

'কোন বোট?'

'বিস্ফোরিত হবার কয়েক মিনিট আগে যেটা আপনারা ত্যাগ করলেন।'

'ও, ওটা!'

'আপনাদের মিশন কি? নাইজার থেকে মালিতে কেন এলেন?'

'জোড়া লেজ বিশিষ্ট মৎসকুলের অভিবাসন সম্পর্কে রিসার্চ করছি আমরা।'

'বোটে যে অস্ত্র ছিল তার কি ব্যাখ্যা?'

'অস্ত্র? অস্ত্র? কি বলছেন!'

'বেনিন নেভির সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করলেন, ভুলে গেছেন নাকি?'

মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড। 'দুঃখিত, আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি না।'

'বামাকো হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে জুতিয়ে পাছার ছাল তুললে সব বুঝতে পারবেন।'

গাসকিল বললেন, 'ওখানে একবার ঢুকলে সহজে কেউ বেরুতে পারে না।'

'রসিকতা বাদ দিয়ে যা সত্যি বলে ফেলো,' মুরল্যাণ্ডকে বলল রানা।

ঝট করে রানার দিকে ফিরল মুরল্যাণ্ড। 'তুমি কি পাগল হলে!'

'তুমি হয়তো নির্যাতন সহ্য করতে পারো, আমি পারি না। ব্যথার কথা ভাবলেই অসুস্থ বোধ করি আমি। জেনারেল যা জানতে চান বলে ফেলো, তা না হলে আমিই বলব।'

'আপনার বন্ধু বুদ্ধিমান,' ভিনসেণ্ট বললেন। 'তাঁর কথা মেনে নিলে নিজের উপকার করা হবে।'

মুরল্যাণ্ড গালাগালি শুরু করল, 'তুমি শালা ভীতুর ডিম! শালা বেঈমান...'

জেনারেল তার মুখে পিস্তল চেপে ধরতে থামল সে। দু'পা পিছাল মুরল্যাণ্ড, ঠোঁট কেটে রক্ত বেরুচ্ছে। তারপর খেপা ষাঁড়ের মত আবার সামনে বাড়ল।

এবার মুরল্যাণ্ডের দু'চোখের মাঝখানে পিস্তল তাক করলেন ভিনসেন্ট। গাসকিলের ইঙ্গিতে নিঃশব্দে এগিয়ে এল দু'জন ক্রু, তাদের একজন পিছন থেকে মুরল্যাণ্ডের ঘাড়ে হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড।

পিস্তলটা এবার রানার দিকে তাক করলেন জেনারেল। 'নাম?'

'মাসুদ রানা।'

গাসকিল বললেন, 'ওদেরকে সার্চ করা হয়েছে, কোন কাগজ-পত্র পাওয়া যায়নি।'

'পাসপোর্ট ছাড়া মালিতে আপনারা কেন এসেছেন?' প্রশ্ন করলেন ভিনসেণ্ট।

'আমরা আর্কিওলজিস্ট, জেনারেল। এক ফ্রেঞ্চ ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে, নাইজার নদীতে প্রাচীন জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করব। আপনাদের একটা পেট্রল ভেসেল আমাদের বোটে গুলি চালিয়েছিল, পাসপোর্টগুলো তখনই হারাই।'

'ইনিও অভিনয় করছেন, দিনকে রাত বানাতে চাইছেন,' গাসকিলকে বললেন ভিনসেণ্ট। 'সাত ঘাটের জল খাওয়া ঘাগু লোক, তারমানে ট্রেনিং পাওয়া এনিমি এজেণ্ট না হয়ে যায় না।'

'ফাউণ্ডেশনের নাম বলুন,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন গাসকিল।

'দ্য সোসাইটি অভ ফ্রেঞ্চ হিস্টোরিকাল এক্সপ্লোরেশন।'

'এই নামে কোন প্রতিষ্ঠান আছে বলে শুনিনি।'

অসহায় ভঙ্গিতে হাত ঝাঁকাল রানা। 'কি বলতে পারি আমি!'

'আর্কিওলজিস্টদের বোটে রকেট লঞ্চার আর অটোমেটিক উইপন থাকবে কেন?' জেনারেলের গলায় বিদ্রূপ।

'জলদস্যু বা টেরোরিস্টদের কথা ভেবে কেউ যদি তৈরি থাকে, সেটা কি অপরাধ?'

নক হলো দরজায়। একজন ক্রু ভেতরে ঢুকে গাসকিলের হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল, বলল, 'রিপ্লাই, স্যার?'

কাগজটার ওপর চোখ বুলালেন গাসকিল। 'আমার কৃতজ্ঞতা জানাবে, বলবে তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে।'

ক্রু কামরা ছেড়ে চলে যেতে ভিনসেন্ট জানতে চাইলেন, 'ভাল খবর?'

'খুবই ভাল খবর।' রানার দিকে তাকিয়ে হাসলেন গাসকিল। 'জাতিসংঘে আমার এজেন্ট আছে। তিনি জানিয়েছেন, ওঁরা আসলে নুমার এজেন্ট। নুমা হলো ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির সংক্ষেপ। একটা কেমিকেল কনটামিনেশনের উৎস খুঁজতে এসেছেন ওরা।'

'একদম বাজে কথা,' বললেন জেনারেল ভিনসেন্ট। 'ওদের আসার পিছনে আরও তাৎপর্যপূর্ণ কোন কারণ আছে। আমার ধারণা তেল।'

'আমার এজেন্টও তাই বলছেন। বলছেন, এটা ওদের কাভার হতে পারে।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে গাসকিলের দিকে তাকালেন জেনারেল। 'ফোর্ট ফরোর কোন লিক নয়তো?'

'না, তা কি করে সম্ভব,' দ্রুত জবাব দিলেন গাসকিল। 'আমার প্রজেক্ট এত দূরে যে কোনভাবেই নাইজারকে প্রভাবিত করতে পারে না। ওরা এসেছেন তোমার কোন গোপন ভেঞ্চার সম্পর্কে তদন্ত করতে। কত কিছুই তো করো তুমি, সব কথা কি আর আমাকে বলো!'

অপমানে ও রাগে লাল হয়ে উঠল জেনারেলের চেহারা। 'মালিতে কনটামিনেশন ছড়াবার জন্যে কেউ যদি দায়ী হয় তো সে তুমি, স্যাভয়।'

'সম্ভব নয়,' দৃঢ় কণ্ঠে বললেন গাসকিল। রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'আমাদের আলাপ ইন্টারেস্টিং লাগছে, কি বলেন?'

'বুঝতে পারলে তো।'

'আপনারা দু'জন নিশ্চয়ই খুব দামী মানুষ।'

'বন্দীদের আবার দাম কি?'

'দামী বলতে কি বোঝাতে চাও তুমি?' জিজ্ঞেস করল জেনারেল।

হাসলেন গাসকিল। 'আমার এজেন্ট আরও জানিয়েছেন, ওদেরকে উদ্ধার করার জন্যে জাতিসংঘের তরফ থেকে একটা স্পেশাল ট্যাকটিকাল টীম পাঠানো হচ্ছে।'

সাদা হয়ে গেল ভিনসেন্টের চেহারা। 'কি বলছ!'

'মি. রানা যোগাযোগ করতে পেরেছেন, কাজেই ধরে নিতে হবে টীমটা এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে।

'তা, মি. রানা, ইউএন টীমের সঙ্গে কোথায় আপনাদের দেখা হবার কথা?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল।

রানা ভাবছে। সম্ভবত গাও এয়ারপোর্টে এসে নামবে টীমটা। টীমের লীডার আশা করবে, মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে রানাও ওখানে থাকবে বা সময়মত পৌঁছুবে। জেনারেল ভিনসেন্ট বোকা নন, তিনিও তাই ধরে নেবেন। 'গাও এয়ারপোর্টে,' বলল ও। 'ওরা ভোরে আসছে। এয়ারপোর্টের পশ্চিম প্রান্তে অপেক্ষা করার কথা

আমাদের।'

'মিথ্যেবাদী!' হুঙ্কার ছাড়লেন জেনারেল, হাতের পিস্তলটা দিয়ে রানার কপালে মারলেন।

ঝট করে মাথাটা সরিয়ে নিল রানা, মুখ ঢাকল হাত দিয়ে। 'খোদার কসম, যা সত্যি তাই বলছি।'

'মিথ্যেবাদী!' আবার গর্জে উঠলেন জেনারেল। 'গাও এয়ারপোর্ট উত্তর দক্ষিণে লম্বা। পশ্চিম প্রান্ত বলে কিছু নেই।'

হাসল রানা, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'চেষ্টা করে দেখলাম আপনাকে ভুল বোঝানো যায় কিনা। অ্যাডমিরালের নির্দেশ আছে বোটটা ধ্বংস করে দেয়ার পর গাও থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে একটা অগভীর শাখা নদীর দিকে রওনা হব আমরা। নাইজার থেকে একটা হেলিকপ্টার এসে তুলে নেবে আমাদের।'

'কখন?'

'ভোর চারটেয়।'

'এরপর যদি মিথ্যে কথা বলেন, আপনার হাত আমি ভেঙে দেব।' হোলস্টারে বেরেটা ভরে গাসকিলের দিকে ফিরলেন জেনারেল। 'নষ্ট করার মত সময় নেই। অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন করতে হবে।'

'সাবধান, পিয়েত্রো। জাতিসংঘের সঙ্গে লাগতে যেয়ো না। ওরা এসে যদি মি. রানা আর ওঁর বন্ধুকে দেখতে না পায়, বাধ্য হয়ে নাইজারে ফিরে যাবে। কিন্তু তুমি যদি হেলিকপ্টারে গুলি করো, সেটা হবে মৌমাছির চাকে ঢিল ছোঁড়া।'

'ওরা আমার দেশ আক্রমণ করতে যাচ্ছে।'

'বাজে কথা রাখো। জাতিসংঘের বিরুদ্ধে কিছু করলে তোমার দিন শেষ। লোন পাবে না, মানবিক সাহায্য পাবে না, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ঝামেলায় পড়বে।'

'স্যাভয়, আমার জীবনের সমস্ত আনন্দ তুমি কেড়ে নিতে চাও,' জেনারেলের ঠোঁটে শুকনো হাসি।

'বিনিময়ে তোমার পকেটে ভরে দিচ্ছি মিলিয়ন মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক।'

'তা দিচ্ছ।'

রানার দিকে তাকালেন গাসকিল। 'তাছাড়া, আনন্দ-ফুর্তি থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হচ্ছ তা-ও তো নয়। এঁরা দু'জন তোমাকে অনেক গান শোনাবেন। আশা করি অনেক কিছু জানতেও পারবে তুমি।'

'দুপুরের আগেই মুখ খুলবেন ওরা,' দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন জেনারেল।

'এবার আমাকে ক্ষমা করতে হবে,' বললেন গাসকিল। 'মেহমানদের কাছে যেতে হয়।'

'স্যাভয়, আমার একটা উপকার করবে?'

'বলে দেখো না।'

'মি. রানা আর তাঁর বন্ধুকে আরও কিছুক্ষণ তোমার স্টীম রূমে রাখো। আমি

চাই আরও একটু নরম হোন ওঁরা, তারপর বামাকোয় পাঠাব।'

'তুমি যা বলো।'

'ধন্যবাদ, মাই ফ্রেণ্ড, আমি কৃতজ্ঞ।' এক গাল হাসলেন ভিনসেণ্ট।

মাথা নত করলেন গাসকিল। 'মাই প্লেজার।'

রানার দিকে তাকালেন জেনারেল। 'স্টীম রুমে আরও কিছুক্ষণ ঘাম ঝরা মি. রানা। তারপর আপনাকে ভুগতে হবে। এমন ভোগাই ভুগবেন, মা-বাবার ন পর্যন্ত ভুলে যাবেন।'

ভিনসেণ্ট ভেবেছিলেন ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে যাবে রানার চেহারা, কিন্তু সেরক কিছু ঘটল না। রানাকে বরং অস্বাভাবিক শান্ত দেখাচ্ছে। মনে মনে দারুণ উৎস বোধ করছে ও, কারণ নিজের অজান্তে জেনারেল ভিনসেণ্ট ওকে পালাবার এক পথ বাতলে দিয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, গেট খুলে গেছে, এখন শুধু বেরি যাবার অপেক্ষা।

***

কালকূট-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

এক

বিজ্ঞানীদের মধ্যে সিলভিয়া ওয়াকম্যানই প্রথম বুঝতে পারল ওদের প্লেন নিচে নামছে। কন্ট্রোলে পাইলটদের হাত যতটা সম্ভব নরম হলেও, এঞ্জিনের পাওয়ার কমে যাওয়াটা ধরা পড়ল তার কানে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্ধকার ছাড়া কিছুই সে দেখতে পেল না। সীমাহীন মরুভূমির কোথাও কোন আলো নেই। হাতঘড়ি দেখল সে। ইকুইপমেন্ট আর কনটামিনেশন স্যাম্পল নিয়ে অ্যাসেলার নামের গোরস্থান থেকে মাত্র দেড় ঘণ্টা আগে প্লেনে চড়েছে তারা।

সীট ছেড়ে উঠে পড়ল সিলভিয়া। কেবিনের পিছনে চলে এল সে। ড. মাইকেল সুনারিল ঘুমাচ্ছেন। তাঁর গায়ে হাত রেখে ঝাঁকাল সে। 'মাইকেল, শুনছ, কিছু একটা ঘটেছে।'

চোখ মেলে তাকালেন সুনারিল। 'কি বললে?'

'প্লেন নিচে নামছে। মনে হচ্ছে ল্যাণ্ড করতে যাচ্ছি আমরা।'

'ননসেন্স!' বিরক্ত হলেন সুনারিল। 'কায়রো পাঁচ ঘণ্টার পথ।'

'কিন্তু এঞ্জিনের আওয়াজ কমে গেছে, মাইকেল!'

সিলভিয়ার গলা শুনে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন সুনারিল, কান পাতলেন। 'হ্যাঁ, তাই তো!'

ককপিটের দিকে ইঙ্গিত করল সিলভিয়া। 'প্লেন ছাড়ার পর পাইলটরা সারাক্ষণ দরজা খোলা রেখেছিল। এখন সেটা বন্ধ।'

'অদ্ভুতই মনে হচ্ছে,' বলে গা থেকে চাদর সরিয়ে সীট ছাড়লেন সুনারিল। 'চলো, দেখা যাক।'

ককপিটের সামনে এসে দরজার হাতল ধরে ঘোরালেন তিনি। তাঁর চেহারা থমথমে হয়ে উঠল। 'দরজায় তালা দেয়া।' ঘুসি মারলেন কবাটে। ভেতর থেকে কেউ সাড়া দিচ্ছে না। দু'জনেই অনুভব করল, প্লেন আরও নিচে নামছে। 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না,' বললেন তিনি। 'তুমি বরং বাকি সবাইকে জাগাও।'

ছুটে এসে টীমের বাকি সবার ঘুম ভাঙাল সিলভিয়া। সবার আগে সুনারিলের কাছে পৌঁছুলেন অ্যালান বুন। 'আমরা নামছি কেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'কি জানি, বুঝতে পারছি না। পাইলটরা চুপ মেরে আছে।'

'ইমার্জেন্সী ল্যাণ্ডিং?'

'কিন্তু আমাদেরকে জানাবে না?'

একটা সীটের ওপর ঝুঁকে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সিলভিয়া। প্লেনের নাক থেকে কয়েক কিলোমিটার সামনে হলদেটে আলোর একটা গুচ্ছ মত দেখতে পেল সে। 'সামনে আলো দেখা যায়।'

'দরজাটা আমরা ভাঙতে পারি না?' জিজ্ঞেস করলেন বুন।

'কি লাভ?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন সুনারিল। 'পাইলটরা ল্যাণ্ড করতে চাইলে আমরা বাধা দিতে পারব না। একটা জেটলাইনার চালাবার যোগ্যতা আমাদের কারও আছে?'

'সেক্ষেত্রে সীটে বসে সীটবেল্ট বাঁধা দরকার,' বলল সিলভিয়া।

তার কথা শেষ হওয়ামাত্র ল্যাণ্ডিং আলো জ্বলে উঠল, আলোকিত হয়ে উঠল ফাঁকা মরুভূমি। ঝুলে পড়ল ল্যাণ্ডিং গিয়ার, প্লেন এমন ভঙ্গিতে বাঁক নিতে শুরু করল শুধু পাইলটরাই যেন এয়ারফিল্ড দেখতে পাচ্ছে। সীটবেল্ট বাঁধা শেষ হয়েছে, শক্ত জমাট বালির ওপর ঘষা খেলো প্লেনের চাকা, পাইলট এয়ার ব্রেক এনগেজ করায় গর্জে উঠল এঞ্জিন। রানওয়ে পাকা না হওয়ায় গতি খুব দ্রুত কমে গেল। এয়ারস্ট্রিপের দু'পাশে দু'সারি ফ্লাডলাইট জ্বলছে, সেগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল প্লেন।

'এ আমরা কোথায় ল্যাণ্ড করলাম?' ফিসফিস করল সিলভিয়া।

'একটু পরই জানা যাবে।' ককপিটের দিকে এগোলেন সুনারিল, ইচ্ছে লাথি মেরে ভেঙে ফেলবেন ওটা। তবে তার আগেই খুলে গেল কবাট, একজন পাইলট কেবিনে পা রাখল। 'কি ঘটছে জানতে পারি?' প্রশ্ন করলেন সুনারিল।

'আপনাদেরকে এখানেই নামতে হবে,' নিচু গলায়, ধীরে ধীরে বলল পাইলট।

'মানে? কি বলছেন আপনি! আপনার তো আমাদেরকে কায়রোয় পৌঁছে দেয়ার কথা।'

'আমার ওপর নির্দেশ আছে আপনাদেরকে তেবেজায় নামিয়ে দিতে হবে।'

'এটা জাতিসংঘের চার্টার করা প্লেন। আপনাকে ভাড়া করা হয়েছে আমরা যেখানে নামতে চাইব সেখানে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। তেবেজা না কি যেন বললেন, ওখানে কেন নামব আমরা?'

'ধরে নিন আনশিডিউল্‌ড্ স্টপ।'

'কি আশ্চর্য, মরুভূমির মাঝখানে এভাবে আপনি আমাদেরকে নামিয়ে দিতে পারেন না। আমরা কায়রোয় ফিরব কিভাবে?'

'সে ব্যবস্থা করা হবে।'

'কিন্তু আমাদের ইকুইপমেন্ট?'

'ওগুলো পাহারা দিয়ে রাখা হবে।'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যারিসের ওয়ার্ল্ড হেলথ ল্যাবরেটরিতে স্যাম্পলগুলো পৌঁছুতে হবে...'

'এ বিষয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। এখন আপনারা যদি দয়া করে শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র নিয়ে নেমে যান, বড় খুশি হই।'

'অসম্ভব, আমরা নামছি না।'

সুনারিলকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগোল পাইলট, প্লেনের পিছন দিকে এসে শ্যাফট লক খুলে বড় একটা সুইচে চাপ দিল। হাইড্রলিক পাম্পের যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল, সেই সঙ্গে মেঝের একটা অংশ ডেবে গিয়ে পরিণত হলো ঢালু সিঁড়িতে, নেমে গেছে জমিনে। পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করে হতভম্ব

বিজ্ঞানীদের দিকে উঁচু করল সে। 'বেরিয়ে যান, এখুনি প্লেন থেকে বেরিয়ে যান!'

এগিয়ে আসছিলেন সুনারিল, থামলেন না। পাইলটের নাকের সামনে চলে এলেন, থামলেন পেটে রিভলভারের নল ঠেকার পর। 'কে আপনি? এ কাজ কেন করছেন?'

'নাম জেনে কি করবেন। মালিয়ান এয়ারফোর্সে আছি আমি, মালিয়ান সুপ্রীম কাউন্সিলের নির্দেশ পালন করছি।'

'তারমানে জেনারেল পিয়েত্রো ভিনসেন্টের নির্দেশ পালন করছেন। তিনিই তো এই এলাকার কর্তা...' তলপেটে রিভলভারের গুঁতো খেয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেন সুনারিল।

পাইলট বলল, 'ঝামেলা পাকাবেন না, প্লীজ, ডক্টর। প্লেন থেকে বেরিয়ে যান, তা না হলে আমি গুলি করব।'

সুনারিলকে জড়িয়ে ধরে সরিয়ে আনল সিলভিয়া। 'যা বলছে শোনো, মাইকেল। বোকার মত মরতে চেয়ো না।'

সুনারিল টলছেন, এক হাতে খামচে ধরে আছেন তলপেট। পাইলটকে নির্লিপ্ত ও ঠাণ্ডা দেখাচ্ছে, যদিও তার চোখে আক্রোশ বা ঘৃণার চেয়ে ভয়ের ছায়াই বেশি দেখতে পেল সিলভিয়া। আর কোন কথা না বলে সুনারিলের পিঠে ধাক্কা দিল লোকটা, নামিয়ে দিল সিঁড়িতে।

বিশ সেকেণ্ড পর প্লেন থেকে নেমে এসে চারদিকে তাকালেন সুনারিল, সিলভিয়া এখনও তাঁকে ধরে আছে। ছ'জন মানুষকে দেখা গেল, নীল পাগড়িতে মুখ প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা, অর্ধ বৃত্ত রচনা করে ঘিরে ফেলল ওদেরকে। ছ'জনই তারা অসম্ভব লম্বা, মৌন ভাবভঙ্গি ভীতিকর লাগল। কালো ঢোলা আলখেল্লা পরে আছে সবাই, কোমরের খাপে তলোয়ার। হাতে অটোমেটিক রাইফেলও আছে, সবগুলো সুনারিলের বুকের দিকে তাক করা।

আরও দু'জন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। একজন টাওয়ারের মত লম্বা, খুব রোগা, পাগড়িতে মাথা ও মুখ এমনভাবে ঢাকা যে শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছে। তার পরনের আলখেল্লা রক্তবর্ণ, তবে পাগড়িটা সাদা। তার সঙ্গী একজন মহিলা। মহিলার কাপড়চোপড় নোংরা ও ছেঁড়া, কোন রকমে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে, পাগুলো টেলিফোন পোলের মত মোটা। তার মাথায় কিছু নেই, চুলগুলো উলের মত, চোয়াল বেশ উঁচু, চিবুকটা গোল, খাড়া নাক। চোখ দুটো খুব বড় নয়, চকচকে ভাব আছে। মুখটা যতটুকু চওড়া, মনে হলো ঠোঁট জোড়াও প্রায় সমান চওড়া। সব মিলিয়ে ঠাণ্ডা, স্যাডিস্টিক কি যেন আছে তার মধ্যে; ভাঙা নাক আর দাগে ভরা কপাল ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক করে। এ এমন একটা মুখ, বোঝাই যায় যে এক সময় নির্যাতন চালানো হয়েছে। হাতে মোটা একটা লেদার থং রয়েছে, সেটার অপর প্রান্তে ছোট একটা নট। সুনারিলের দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেয়েটা, যেন অনেক দিন ক্ষুধার্ত থাকার পর হিংস্র বাঘিনী নধর একটা শিকার পেয়ে গেছে।

'এই জায়গার নাম কি?' পরিচয় বিনিময় না করেই জানতে চাইলেন সুনারিল।

'তেবেজা,' জবাব দিল টাওয়ার। তার ইংরেজি উচ্চারণে উত্তর-আয়ারল্যাণ্ডের টান আছে বলে মনে হলো।

'সেটা আগেই জানানো হয়েছে। তেবেজা কোথায়?'

'তেবেজা হলো মরুভূমি শেষ হবার পর যেখানে নরক শুরু হয়েছে। এখানে কয়েদী আর ক্রীতদাসরা খনি থেকে সোনা তোলে।'

'অস্ত্রগুলো নিচু করলে হয় না?' বললেন সুনারিল।

'এগুলোর প্রয়োজন আছে, ড. সুনারিল।'

'আপনি আমার নাম জানেন?' ফিসফিস করলেন সুনারিল।

'হ্যাঁ, আপনাদের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছিলাম।'

'কে আপনি?'

'আমার নাম এরিক শানিন, মাইনিং অপারেশনের চীফ এঞ্জিনিয়ার।' দশাসই মহিলার দিকে ইঙ্গিত করল সে। ও আমার হাতিয়ার মোরেট অলিভা। আপনারা ওর নির্দেশ মেনে চলবেন।'

সম্ভবত দশ সেকেণ্ড নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল, শব্দ আসছে শুধু প্লেনের ধীরগতি টারবাইন থেকে। তারপর সুনারিল বিস্ফোরিত হলেন, 'নির্দেশ? কি বলতে চাইছেন আপনি?'

'খাতির-যত্ন পাবার জন্যে জেনারেল পিয়েত্রো ভিনসেণ্ট এখানে আপনাদেরকে পাঠিয়েছেন। তাঁর নির্দেশ হলো, খনিতে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে।'

'দিস ইজ কিডন্যাপিং!' প্রতিবাদ করলেন সুনারিল।

'কিডন্যাপিঙের সংজ্ঞা আপনি ভুলে গেছেন, ডক্টর সুনারিল। আপনাদের জন্যে মুক্তিপণ চাওয়া হচ্ছে না বা আপনাদেরকে জিম্মি করাও হবে না। আপনাদের শাস্তি হলো তেবেজা খনিতে শ্রম দেবেন, মালির সরকারী কোষাগারের জন্যে সোনা তুলবেন।'

'এ দেশে কি জোর যার মুল্লুক তার...!' ভারি থং দিয়ে সুনারিলের মুখে আঘাত করল অলিভা, ঠোঁটের পাশে হাত দিয়ে রক্ত স্পর্শ করলেন তিনি।

'ক্রীতদাসদের এখানে এভাবেই শিক্ষা দেয়া হয়।' অলিভার গলার স্বর এত কর্কশ ও অমার্জিত, রীতিমত ঘিন ঘিন করে উঠল শরীর। 'অনুমতি না পেলে কথা বলা নিষেধ।' মারার জন্যে আবার থং তুলল সে।

বাধা দিল শানিন। 'সবুর করো, ডার্লিং। মেনে নেয়ার সময় দাও ওদের।' বাকি বিজ্ঞানীদের দিকে তাকাল সে, প্লেন থেকে নেমে এসে সুনারিলের পাশে জড়ো হয়েছেন। সবাইকে হতভম্ব দেখাচ্ছে, চোখে আতঙ্ক। 'মেরেই যদি কাহিল করে ফেলো, খনিতে ওরা কাজ করবে কিভাবে?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও থং নামাল অলিভা। 'তুমি নরম হয়ে গেছ, শানিন। ওরা চীনামাটির তৈরি পুতুল নয়।'

'আপনি আমেরিকান,' বলল সিলভিয়া।

হাসল অলিভা। 'ঠিক ধরেছ, হানি। ক্যালিফোর্নিয়ার উইমেন'স ইনস্টিটিউটে দশ বছর ছিলাম চীফ অভ গার্ডস হিসেবে। যারা জানে তাদেরকে

জিজ্ঞেস করে দেখো, মেয়েদেরকে ওখানে নিখাদ ইস্পাত বানানো হয়।'

'অলিভা বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের দেখাশোনা করে,' বলল শানিন। 'আপনার খাতির-যত্নও সেই করবে।'

'খনিতে আপনারা মেয়েদের কাজ করাচ্ছেন?' সুনারিলের গলায় অবিশ্বাস।

'মেয়েদের, সেই সঙ্গে তাদের বাচ্চাদেরও।' হাসছে শানিন।

রেগে গেল সিলভিয়া। 'আপনি হাসছেন? এ তো মানবাধিকার আইনের গুরুতর লংঘন।'

শানিনের দিকে তাকিয়ে অনুমতি চাইল অলিভা, 'মারি?'

মাথা ঝাঁকাল শানিন। 'আমার আপত্তি নেই।'

হাতের থং দিয়ে সিলভিয়ার পেটে প্রচণ্ড গুঁতো মারল অলিভা, কাতর একটা শব্দ করে কুঁজো হয়ে গেল সিলভিয়া। থংটা এবার তার ঘাড়ের পিছনে নামিয়ে আনল অলিভা। ভিজে চাদরের মত ভাঁজ হয়ে গেল সিলভিয়া, সুনারিল তার কোমরটা জড়িয়ে না ধরলে বালির ওপর পড়ে যেত।

'হাড়ে হাড়ে টের পাবেন, প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই,' বলল শানিন। 'বরং সহযোগিতা করুন, যে ক'টা দিন বাঁচবেন ব্যথা খুব কম পাবেন।'

সুনারিল বললেন, 'আমরা জাতিসংঘের বিজ্ঞানী, আমাদের একটা সম্মান আছে। পাগলামি করে আপনারা আমাদেরকে মেরে ফেলতে পারেন না।'

'কে বলল মেরে ফেলব?' বিস্মিত দেখাল শানিনকে। 'এখানে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় না। শুধু কাজ করানো হয়। তবে কাজ করতে করতে কেউ মরে গেলে কার কি করার আছে!'

যেমনটি আশা করেছিল মাসুদ রানা ঠিক তেমনটিই ঘটল। গার্ড ওদেরকে আবার বাষ্প ভর্তি বিলজ-এ ঠেলে দিল, সহযোগিতা করার ভঙ্গিতে হাত দুটো উঁচু করল ও, গার্ড যাতে ওর কাফ চেইন স্টীম পাইপের সঙ্গে লক করতে পারে। তবে এবার রানা পাইপ ব্রাকেটের উল্টোদিকে তুলল হাতটা। কাজ সেরে স্টীল ট্র্যাপ-ডোর বন্ধ করে ফিরে গেল গার্ড।

ভেজা ডেকে বসে মাথার পিছনটা হাত দিয়ে ডলছে ববি মুরল্যাণ্ড। ঘন বাষ্পের ভেতর তাকে আবছা মত দেখতে পাচ্ছে রানা। 'কি ঘটল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জেনারেল ভিনসেণ্ট আর স্যাভয় গাসকিল, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। ওরা দল পাকিয়ে খুব খারাপ কিছু করছে। উপকারের বিনিময়ে জেনারেলকে টাকা দিচ্ছে গাসকিল। আর কিছু জানতে পারিনি।'

'এখান থেকে বেরুতে চাও কিভাবে?' বন্ধুকে প্রশ্ন করল মুরল্যাণ্ড।

হাত উঁচু করে রানা বলল, 'স্রেফ কব্জি মুচড়ে।'

ব্রাকেটের উল্টোদিকে বাঁধা থাকায় চেইন সহ হাত দুটোর পাইপ বেয়ে উঠতে বাধা থাকল না, বাল্কহেডের নাগাল পেতেও অসুবিধে হলো না। ওখানে একটা র‍্যাক রয়েছে, তাতে বিভিন্ন সাইজের রেঞ্জ। একটা রেঞ্জ ধরল রানা, বাল্কহেডে বসানো ফিটিঙে আটকাল—স্টীম পাইপ প্যাসেজকে সাপোর্ট দিচ্ছে এই ফিটিং।

রেঞ্জটা দু'হাতে ধরে ঘোরাল ও, কিন্তু মরচে থাকায় সহজে ঘুরছে না ফিটিং, সিকি পাক ঘোরাতে জান বেরিয়ে যাবার অবস্থা হলো ওর। তারপর অবশ্য সহজ হয়ে গেল।

'তৈরি হও, দোস্ত,' বলল রানা। দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড, আড়মোড়া ভেঙে শিথিল করে নিল পেশীগুলো।

ফিটিংটা দ্রুত কয়েক বার পাক খাওয়াল রানা, আলগা হয়ে পিছলে গেল সেটা। চেইনটা পাইপের গায়ে ঝুলিয়ে দিল ও, শরীরের ভর চাপিয়ে খুলে আনতে চাইছে। একরাশ বাষ্প বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পরস্পরকে হারিয়ে ফেলল ওরা। পাইপ খুলে গেছে, সেটা থেকে চেইনটা বের করে নিল রানা।

দু'জন একযোগে চিৎকার জুড়ে দিল, সেই সঙ্গে নিচের ডেক প্লেটে পা ঠুকছে। রানা যেমন আশা করেছিল, প্লেটিং খুলে ভেতরে তাকাল গার্ড। নিচে থেকে রানার অদৃশ্য হাত ধরল তাকে, টেনে নামিয়ে আনল বাষ্প ঢাকা বিলজ-এ। নিচের দিকে মাথা দিয়ে পড়ল গার্ড, চোয়ালটা ঠুকে গেল একটা স্টীল বীমের সঙ্গে। অজ্ঞান লোকটার হাত থেকে অটোমেটিক রাইফেলটা ছিনিয়ে নিল রানা, তার পকেট হাতড়ে চাবি বের করল মুরল্যাণ্ড। প্রথমে নিজের, তারপর রানার হাত কাফ-মুক্ত করল সে। লাফ দিয়ে আপার ডেকে উঠে পড়ল রানা, রাইফেলের ব্যারেল একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাল। এঞ্জিন রুমে নেই কেউ, একা গার্ডই শুধু ডিউটি দিচ্ছিল।

ভুরু থেকে পানি ঝরছে, হাত দিয়ে মুছল রানা। 'ববি, আসছ তুমি?'

'গার্ডকে সঙ্গে নিই,' বাষ্পের ভেতর থেকে বলল মুরল্যাণ্ড। 'বেচারাকে এখানে মরতে দিই কিভাবে!'

নিচে নেমে অজ্ঞান লোকটাকে ওপরে তুলতে সাহায্য করল রানা, ফেলে রাখল ডেকে। রানা বলল, 'তাপমাত্রা কমে গেলে গাসকিলের আরোহীরা অভিযোগ করবে, বিশেষ করে যে-সব মহিলা কাঁধ খোলা ড্রেস পরে আছে। মেরামত করতে এসে ক্রুরা দেখবে আমরা নেই।'

একটা হ্যাচ খুলল, বাইরের ডেকে বেরিয়ে এসে হাউজবোটের পিছন দিকে ছুটল। রেইলিং-এর কাছে এসে ওপর দিকে মুখ তুলল, লাউঞ্জের বড় বড় জানালার ভেতর লোকজন দেখা যাচ্ছে, হাস্যমুখর, হাতে গ্লাস– জানে না প্রায় সরাসরি নিচের এঞ্জিন রুমে রানা ও মুরল্যাণ্ড কি ভোগাটাই না ভুগেছে।

ডেক ধরে এগোল ওরা, পোর্টহোলগুলো পেরুল মাথা নিচু করে। একটা সিঁড়ি পড়ল সামনে, ছায়ায় দাঁড়িয়ে তাকাল ওপরদিকে। উজ্জ্বল আলোর বন্যার ভেতর, মেইন সেলুনের রুফ ডেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাসকিলের প্রাইভেট হেলিকপ্টার। আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা। একটু থেমে দেখে নিল চারদিক। তারপর ছুটে চলে এল কপ্টারের কাছে। কপ্টারের বাঁধন খুলে রানার পাশে চলে এল মুরল্যাণ্ড। রানা ইতিমধ্যে ভেতরে উঠে বসেছে।

স্টার্ট দিতে মূল্যবান দুটো মিনিট বেরিয়ে গেল। অবশেষে ব্রেক রিলিজ করল

রানা, রোটর ব্লেড ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল। একজন ক্রুকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, চওড়া উইণ্ডশীল্ডের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা করল। হাত নাড়ল মুরল্যাণ্ড, হাসল। ক্রু নড়ছে না, চেহারায় অনিশ্চিত ভাব।

'ব্যাটা বুঝতে পারছে না আমরা কে।'

'সঙ্গে অস্ত্র আছে?' জানতে চাইল রানা।

'নেই, তবে সিঁড়ি বেয়ে ওর বন্ধু যারা ছুটে আসছে তাদের ভাবসাব আমার ভাল ঠেকছে না।'

'পালাবার সময় হয়েছে।'

'সবগুলো গজ সবুজ দেখছি আমি।'

হেলিকপ্টার শূন্যে তুলল রানা। হাউজবোট পিছিয়ে পড়ল দ্রুত। আকাশ যান দশ মিটার উঁচুতে সিধে করে নিয়ে ভাটির দিকে যাচ্ছে ও। মুরল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'গন্তব্য?'

'নদীর যেখানে কনটামিনেশন এসে মিশছে,' বলল রানা।

'কিন্তু রেডক্লিফ টক্সিন এণ্ট্রি আবিষ্কার করেছিলেন উল্টোদিকে, একশো কিলোমিটার দূরে।'

'হ্যাঁ, উল্টোদিকে যাচ্ছি আপাতত, শিকারী কুকুরগুলোকে বোকা বানানোর জন্যে। গাও থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যাই আগে, তারপর কোর্স বদল করব, মরুভূমির ওপর দিয়ে ঘুরপথে ফিরে যাব ওখানে।'

'তারচেয়ে এয়ারপোর্টে গেলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'রেডক্লিফকে তুলে নিয়ে শালার এই দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে পারতাম।'

'অত ফুয়েল নেই, খুব বেশি হলে দু'শো কিলোমিটার যেতে পারব। অত সময়ও নেই, কারণ বেশিক্ষণ আকাশে থাকলে ভিনসেন্টের জেট ফাইটারগুলো আমাদেরকে পেয়ে যাবে। আরও একটা ব্যাপার হলো, ভিনসেন্ট জানেন আমরা মাত্র দু'জন। রেডক্লিফকে নিরাপদে স্যাম্পল নিয়ে পালাবার সুযোগ দেয়ার জন্যেই তাঁর কাছাকাছি যাওয়া উচিত হবে না আমাদের।'

'এত কথা তুমি কখন চিন্তা করলে?' মুরল্যাণ্ডকে বিস্মিত দেখাল।

জবাব না দিয়ে সীটে আটকানো হোল্ডার থেকে একটা চার্ট বের করল রানা। 'কোর্স ঠিক করব, ততক্ষণ তুমি কন্ট্রোল সামলাও।'

খানিক পর নির্দেশ দিল রানা, 'একশো মিটারে তোলো, নদীর ওপর পাঁচ মিনিট থাকো, তারপর ঘুরে যাও টু-সিক্স-ওহ্ ডিগ্রীতে।' নির্দেশ পালন করল মুরল্যাণ্ড।

বিশ মিনিট পর আবার নাইজার নদীর পানি দেখতে পেল ওরা। মুরল্যাণ্ড জানতে চাইল, 'স্টারবোর্ড সাইডে কিসের আলো ওটা? উত্তর দিকে?'

'সম্ভবত ছোট একটা শহর, বাউরেম হতে পারে।'

নদীর মাঝখানে চলে এল কপ্টার।

'নিচে নামো,' নির্দেশ দিল রানা।

পানি থেকে দু'মিটার ওপর থাকতে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল মুরল্যাণ্ড, সমস্ত ফুয়েল সুইচ আর ইলেকট্রিকাল বার বন্ধ করল রানা। আহত প্রজাপতির মত

লাগছে গাসকিলের কপ্টারটাকে, খানিকটা পানি ছিটিয়ে নেমে পড়ল পানিতে, ঢেউয়ের সঙ্গে দোল খাচ্ছে। দরজা থেকে ডাইভ দিল ওরা।

খোলা দরজা দিয়ে পানি ঢুকল, কপ্টারে। অন্ধকারের ভেতর কেউ ওটাকে ডুবে যেতে দেখল না।

অন্ধকার মরুভূমিতে দু'ঘণ্টা পথ চলার পর হঠাৎ সুপ্রসন্ন হলো ভাগ্য, মনে হলো ওরা একটা গুহার ভেতর ঢুকছে। দেয়ালগুলো মাটির তৈরি, মেঝেটা লেপা। কংক্রিটের ওপর একটা তক্তা ফেলা, মাঝখানটা ডেবে আছে, তাতে একটা গ্লাস শুইয়ে দিলে গড়িয়ে মাঝখানে চলে আসবে বলে মনে হলো। তক্তার পিছনে একটা শেলফ, দেয়ালে গাঁথা, তাতে কফি ও চা ভর্তি কিছু পাত্র ও বোতল রয়েছে। বোতলে বিয়ার ও হুইস্কি। একদিকের দেয়ালে ছোট একটা স্টোভ দেখা গেল, যথেষ্ট তাপ ছড়াচ্ছে। বাতাসে একটা দুর্গন্ধও আছে, উটের বিষ্ঠা বলে এখনও চিনতে পারছে না ওরা। চেয়ারগুলো বিভিন্ন আকৃতির, একটার সঙ্গে অপরটা মেলে না। টেবিলটার অবস্থা ক্ষতবিক্ষত। সরু একটা তার থেকে ঝুলছে নগ্ন দুটো বালব, আলো খুব কম, শক্তি পাচ্ছে শহরের প্রায় অচল জেনারেটর থেকে।

খালি একটা টেবিলে বসে খদ্দেরদের দিকে তাকাল রানা। কারও পরনে ইউনিফর্ম নেই দেখে স্বস্তিবোধ করল ও। খদ্দেরদের বেশিরভাগই নাইজার নদীর মাঝি বা জেলে, দু'একজনকে দেখে চাষী বলেও মনে হলো। আগন্তুকদের দিকে একবার তাকিয়ে খেলায় মন দিল তারা। খেলাটা আগে থেকেই চলছে, দেখে মনে হলো ষোলো ঘুঁটি টাইপের।

মালিক লোকটা কালো ভূত। চুলে সম্ভবত তেল-পানি পড়েনি জন্মের পর থেকে, গোঁফ জোড়া পাকানো। একটা হাত তুলে রানা বলল, 'চা।'

মালিক একটা হাত তুলে হাসল।

'জানতে পারি, বিল দেবে কিভাবে?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

জুতোর ভেতর হাত ভরে কি যেন বের করল রানা, মুরল্যাণ্ডের সামনে ধরল। এক তাড়া নোট, মালিয়ান কারেন্সি। 'অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে তুমি এখনও চিনতে পারোনি। কোন কৌশলই উনি বাদ দেন না।'

'মানলাম। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমাকে বিশ্বাস না করে উনি তোমাকে বিশ্বাস করলেন কেন?'

'আমার পা তোমার চেয়ে বড়।'

মালিক নিজেই চা নিয়ে এল ওদের টেবিলে। তার হাতে একটা নোট গুঁজে দিল রানা। লোকটা চলে যেতে মুরল্যাণ্ড বলল, 'ও চাইল দশ ফ্রাঙ্ক, তুমি দিলে বিশ ফ্রাঙ্ক। কি কারণ?'

'লোকে জানুক আমরা টাকা ওড়াচ্ছি,' বলল রানা। 'ভুলে যেয়ো না আমাদের বাহন দরকার।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে মুরল্যাণ্ড বলল, 'এত বুদ্ধি নিয়ে তুমি ঘুমাও কিভাবে। ভাল কথা, আমার খিদে পেয়েছে।'

'যা খুশি খেতে পারো, তবে আমি এখানকার কিছু মুখে দেব না।'

দ্বিতীয় কাপ চা শেষ করছে ওরা, ভেতরে ঢুকল এক তরুণ। খুব লম্বা সে, রোগা-পাতলা, কাঁধ দুটো সামান্য ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। মুখটা প্রায় গোল, চোখে বিষণ্ন দৃষ্টি। পরে আছে হলুদ টি-শার্ট, খাকি প্যান্ট, শার্টের ওপর গায়ে জড়িয়েছে সাদা সুতির একটা চাদর। খদ্দেরদের ওপর চোখ বুলাল সে, রানা আর মুরল্যাণ্ডের ওপর স্থির হলো দৃষ্টি। তারপর এগিয়ে এল সে, জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা বিদেশী?'

'ল্যাটিন আমেরিকান,' বলল রানা।

'আমি মাসারদি অঁবে। টাকা বদল করতে চাইলে আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারি।' রানা মাথা নাড়ছে দেখেও হতাশ হলো না তরুণ, নতুন উৎসাহে শুরু করল, 'আপনাদের হয়তো একজন গাইড দরকার, নানা রকম সমস্যার সমাধান দরকার।'

'কিছুই দরকার নেই,' বলল রানা। 'তবে খুশি হব তুমি যদি আমাদের সঙ্গে বসে এক কাপ চা খাও।'

'আমি বিয়ার পছন্দ করি।'

মুরল্যাণ্ড বলল, 'তুমি এত ভাল ইংরেজি শিখলে কিভাবে?'

তরুণ জানাল, সে তার মাতৃভাষা ছাড়াও আরও তিনটে ভাষা জানে—ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান। তার বাবা কাছাকাছি একটা গ্রামের সর্দার, তাদের ট্র্যান্সপোর্ট ও এক্সপোর্ট বিজনেস আছে। শখের গাইড সে, বিদেশী ভাষায় কথা বলার সুযোগ খোঁজে, ফরেনারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। হ্যাঁ, তাদের ট্রাক আছে, তবে সেগুলো আজ বিকেলে মোপটি-র উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে অঁবে জানাল, ট্রাক পেলেও রানা ওর বন্ধুকে নিয়ে মরুভূমিতে যেতে পারবে না, কারণ বিশেষ পাস ছাড়া ঘুরে বেড়ানো নিষেধ। তার প্রশ্নের উত্তরে রানা জানাল, টিমবাকটু থেকে ওরা এখানে পৌঁচেছে বাসে চড়ে।

'আপনি বলতে চাইছেন ট্রাকে করে?' বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিল অঁবে।

তাড়াতাড়ি ভুলটা সংশোধন করে নিল রানা। 'হ্যাঁ।'

অঁবে বলল, 'আপনারা কাল দুপুরের আগে টিমবাকটুতে ফিরতে পারবেন না। বাউরেম খুব গরীব শহর, খুব কম লোকেরই গাড়ি আছে, তা-ও বেশিরভাগ অচল হয়ে পড়ে রাস্তায়।' কি যেন চিন্তা করল সে, তারপর আবার বলল, 'আজকের দিনে সচল গাড়ি বলতে একটাই আছে, সেটা হলো জেনারেল ভিনসেন্টের প্রাইভেট অটো।'

রানা ও মুরল্যাণ্ড পরস্পরের দিকে তাকাল না। তবে তথ্যটা হজম করতে তিন সেকেণ্ড সময় নিল ওরা। তারপর মুরল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'জেনারেলের গাড়ি এখানে কি করছে? কাল তো আমরা তাঁকে গাওতে দেখলাম।'

'জেনারেল সব সময় হেলিকপ্টার বা মিলিটারি জেট নিয়ে আসা-যাওয়া করলেও, শোফার সহ নিজের একটা গাড়ি নাগালের মধ্যে রাখতে পছন্দ করেন,' জবাব দিল অঁবে। 'বামাকো থেকে গাও যাচ্ছিল তার শোফার, বাউরেমের কাছাকাছি এসে নষ্ট হয়ে যায়। মেরামতের জন্যে টো করে আনা হয়েছে।'

'ও, আচ্ছা, তারপর?'

কথায় পেয়েছে অঁবেকে। 'একটা পাথর লেগে রেডিয়েটর ফেটে গিয়েছিল। আজ সন্ধ্যার পর মেরামত করা হয়েছে। গাও রোডে কাজ চলছে তো, তাই রাতে রওনা হয়নি শোফার, কাল সকালে ফিরে যাবে।'

রানা হাসছে। 'তুমি দেখছি দুনিয়ার খবর রাখো।'

'গ্যারেজটা আমাদের, মেকানিক আমাদের লোক। শোফার আজ রাতে আমাদের সঙ্গে খেয়েছে, রাতে থাকবেও আমাদের বাড়িতে।'

এতক্ষণে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা ও মুরল্যাণ্ড। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল ওরা। রানা জানতে চাইল, 'এদিকে কোন কেমিকেল কোম্পানি আছে নাকি?'

'আরে না! এদিকে হস্তশিল্প ছাড়া আর কিছু পাবেন না।'

'ক্ষতিকর বর্জ্য ফেলার কোন জায়গা?'

'সে তো ফোর্ট ফরোতে, এখান থেকে কয়েকশো কিলোমিটার উত্তরে।'

এরপর কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ কাটল। হঠাৎ অঁবে জানতে চাইল, 'আপনাদের সঙ্গে টাকা আছে কিরকম?'

'কি জানি,' বলল রানা। 'গুণে দেখিনি।'

মুরল্যাণ্ড নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল, ধরতে পেরে এক কোণে ফেলা একটা টেবিলের দিকে তাকাল রানা। চারজন লোককে দেখল ও, তাকাতেই চোখ ফিরিয়ে নিল তারা। সন্দেহ হলো, ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র হতে পারে। মালিকের দিকে তাকাল ও, একমনে খবরের কাগজ পড়ছে। নির্বোধ বা নির্বিরোধী, আন্দাজ করল রানা। বাকি খদ্দেররা খেলা ও গল্পে মেতে আছে। ধরে নিতে হয় পাঁচজনের বিরুদ্ধে লড়তে হবে দু'জনকে। চা শেষ করে উঠে দাঁড়াল ও, বলল, 'এবার যেতে হয়।'

'সর্দারকে শুভেচ্ছা জানিয়ো।' অঁবের আঙুলগুলো মুচড়ে দিল মুরল্যাণ্ড।

অঁবে আগে যেমন হাসছিল এখনও তেমনি হাসছে, শুধু তার চোখ দুটো কঠিন হলো। 'আপনারা যেতে পারবেন না।'

'আমাদের কথা ভেবে চিন্তা কোরো না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'রাস্তার ধারে ঘুমানো অভ্যাস আছে।'

খুব নরম সুরে অঁবে বলল, 'টাকাগুলো বের করে দিন।'

'সর্দারের ছেলে ভিক্ষা করছে?' রানার চোখে কৃত্রিম বিস্ময়।

'আমাকে অপমান করবেন না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল অঁবে। 'টাকা বের করুন, তা না হলে মেঝেতে আপনাদের রক্ত গড়াবে।'

মুরল্যাণ্ডের ভাব দেখে মনে হলো ভয় পেয়ে পিছু হটছে সে। টেবিলের লোক চারজন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, অঁবের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সঙ্কেত পাবার আশায়। কিন্তু অঁবে কোন সঙ্কেত দিতে পারল না। নিরীহ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে অঁবের চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানা। চেয়ার সহ পিছন দিকে পড়ে গেল সে, দু'তিনটে টেবিলের লোক একযোগে লাফ দিল। সবচেয়ে অদ্ভুত দেখাল মালিক। খুব ব্যস্ততার সঙ্গে খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছে সে, যেন জরুরী একটা খবর খুঁজছে গভীর আগ্রহে। চোখের সামনে মারপিট বেধে গেছে অথচ সেদিকে তার কোনই খেয়াল নেই।

অঁবে আক্রান্ত হতে তার সঙ্গী চারজন ছুরি হাতে ছুটে এল। মুরল্যাণ্ডকে তারা গ্রাহ্যই করল না, ছুটে এল রানার দিকে। সময় মত পা বাড়াল মুরল্যাণ্ড, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল দু'জন, তাদের মাথায় একটা চেয়ার ভাঙল রানা। খদ্দেররা সব দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাদের পিছু নিল তৃতীয় লোকটা। অঁবে উঠে দাঁড়াচ্ছে দেখে তার মাথায় লাথি মারল রানা। চতুর্থ লোকটা ছুরি চালাল মুরল্যাণ্ডের পাঁজর লক্ষ্য করে। এক পাশে সরে যাবার ভান করে ঝট করে বসে পড়ল মুরল্যাণ্ড, লোকটার পা ধরে টান দিল। প্রতিপক্ষ ধপাস করে বসল, এক ঘুসিতে তার নাকটা ফাটিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড।

'দরজার দিকে খেয়াল রাখো,' মুরল্যাণ্ডকে বলল রানা, এগিয়ে এসে কাউন্টারে থামল, মালিককে জিজ্ঞেস করল, 'লা গ্যারাজ?'

কাগজ থেকে মুখ তুলল মালিক, গোঁফ পাকাল, আঙুল তুলে বাম দিকের দেয়ালটা দেখিয়ে দিল। একটা দরজা খুলে রেস্তোরাঁর পিছন দিকে বেরিয়ে এল ওরা। ছায়ার ভেতর থাকল, বাঁক ঘুরে চলে এল আরেক রাস্তায়। রানা বলল, 'ভোর হতে চার ঘণ্টা বাকি। তার আগেই এই শহর ছেড়ে সরে পড়তে হবে।'

মুরল্যাণ্ড বলল, 'আমাদের কি যেন একটা খোঁজার কথা না?'

'বোধহয় পেয়েও গেছি।' হাত তুলে রাস্তার পাশের সবচেয়ে বড় বাড়িটা দেখাল রানা।

মাটিরই পাঁচিল, তবে খুব উঁচু আর অনেক লম্বাও। মাঝখানে একটা লোহার গেট। দেখে মনে হলো ওয়্যারহাউস হতে পারে। গেটে দাঁড়াতে ভেতরে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা একটা বড়সড় উঠন দেখা গেল, ভাঙাচোরা অনেকগুলো গাড়ি এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আলো খুব কম, তারপরও বোঝা গেল বেশিরভাগই শুধু খোল, ভেতরে এঞ্জিন নেই। খুলে এক কোণে রাখা হয়েছে এঞ্জিনগুলো, কয়েকটা ড্রামের পাশে। নাকে ঢুকল পেট্রলের গন্ধ।

গেট টপকে ভেতরে ঢুকল রানা, সেটা খুলে দিতে ওর পিছু নিল মুরল্যাণ্ড। কাঁটাতারের বেড়াতেও একটা গেট আছে, রশি দিয়ে বাঁধা। কোন পাহারাদার নেই, থাকলে এতক্ষণে দেখা যেত তাকে। গ্যারেজের এক প্রান্তে খোলা একটা গহ্বর দেখল ওরা, নিচে দাঁড়িয়ে গাড়ির তলায় কাজ করার জন্যে। পাশেই ছোট একটা অফিস, ভেতরে নানা রকম টুলস আর মেশিনারি। দুটো ট্রাক আর তিনটে গাড়ি ছাড়া গ্যারেজের বাকি অংশে তেমন কিছু নেই। রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল মাঝখানের গাড়িটা। একটা ট্রাকের ভেতর হাত গলিয়ে হেডলাইট অন করল ও, সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও আগে তৈরি গোলাপী-ম্যাজেন্টা কালারের একটা ঝলমলে অটোমোবাইল। 'মাই গড!' বিস্ময়ে বিড়বিড় করল ও। 'এ তো দেখছি অ্যাভিয়নস ভয়সিন।'

'কি?'

'এটা একটা ভয়সিন। ফ্রান্সের গ্যাব্রিয়েল ভয়সিন উনিশশো উনিশ থেকে উনিশশো উনচল্লিশ পর্যন্ত এই গাড়ি তৈরি করেছিলেন। অত্যন্ত দুর্লভ গাড়ি।'

এক বাম্পার থেকে আরেক বাম্পার পর্যন্ত হেঁটে এল মুরল্যাণ্ড, অদ্ভুতদর্শন গাড়িটা খুঁটিয়ে দেখছে। দরজার এরকম অলংকৃত হাতল আগে কখনও দেখেনি

সে। উইণ্ডশীল্ডের কাচে তিনটে ওয়াইপার। ক্রোম স্ট্রার্ট ফ্রন্ট ফেণ্ডার থেকে রেডিয়েটর পর্যন্ত বিস্তৃত। রেডিয়েটর শেল-এর ওপর ডানা সহ লম্বা একটা ম্যাস্কট। 'এ তো দেখছি আজব এক বস্তু।'

'ওকে ব্যঙ্গ কোরো না। এই আজব বস্তুই এখান থেকে বেরিয়ে যাবার টিকিট আমাদের।' স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে উঠে বসল রানা, সেটা ডান দিকে। ইগনিশনে একটাই মাত্র চাবি ঝুলছে। সেটা ঘুরিয়ে ফুয়েল গজের কাঁটার দিকে তাকাল ও। কাঁটাটা 'ফুল' লেখা লাইনে উঠে এল। আরেকটা বোতাম টিপল ও, সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে গেল ইলেকট্রিক্যাল মোটর, রেডিয়েটরের তলায় লম্বা হয়ে আছে, কাজ করে স্টার্টার ও জেনারেটর হিসেবে। এঞ্জিন ঘুরতে শুরু করলেও কোন শব্দই হলো না। খুক করে অস্পষ্ট একটু কাশির আওয়াজ আর এগজস্ট পাইপ থেকে সামান্য ধোঁয়া বেরুতে দেখে বোঝা গেল সচল হয়েছে ওটা।

'মান্ধাতা আমলের এই বাহন নিয়ে সত্যি তুমি সাহারা পাড়ি দিতে চাও?'

'উটের চেয়ে খারাপ কিসে? পরিষ্কার কণ্টেইনার পাও কিনা দেখো, পানি দরকার। আর দেখো কিছু খাবার যোগাড় করা যায় কিনা।'

খানিক পর অফিস থেকে স্থানীয় সফট ড্রিঙ্কস আর পানির বোতল নিয়ে বেরিয়ে এল মুরল্যাণ্ড। 'অন্তত দিন কয়েক পানির অভাবে মরব না। খাবার বলতে সারডিন-এর দুটো ক্যান পেয়েছি, আর এক বাক্স ক্যাণ্ডি।'

'চলবে।'

প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল মুরল্যাণ্ড। গিয়ার লিভারে চাপ দিল রানা, আসলে বলা উচিত সুইচ টিপল, স্টিয়ারিং কলাম থেকে বেরিয়ে আসা একটা বাহুতে বসানো রয়েছে। চাপ দিল পেডালে, সেই সঙ্গে ছেড়ে দিল ক্লাচ। ষাট বছরের পুরানো ভয়সিন চুপচাপ সামনে এগোল।

শহর ছেড়ে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে এসে হেডলাইট জ্বালল রানা। মুরল্যাণ্ড বলল, 'একটা রোড ম্যাপ পেলে ভাল হত।'

'সামনে নাইজার নদী,' বলল রানা। 'ওটাই পথ দেখাবে। রেডক্লিফের ইন্সট্রুমেন্ট একটা নালায় কনটামিনেশন ডিটেক্ট করেছিল, ওখানে পৌঁছে ওটাকে অনুসরণ করে উত্তর দিকে যাব।'

'তুমি ধরেই নিচ্ছ ওরা আমাদের পিছু ধাওয়া করবে না?'

'জেনারেল আর গাসকিল ধরে নেবেন আমরা সীমান্তের দিকে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'ভুলেও ভাববেন না যে গভীর মরুভূমির দিকে যেতে পারি।'

'ভাবছি, না জানি কি বিপদ আছে সামনে।'

সে ভয় রানারও। মরুভূমিতে কখন কি ঘটে কিছুই বলা যায় না।

আবার বিড়বিড় করল মুরল্যাণ্ড, 'এখানে আমি মরতে চাই না, রানা। জায়গাটা খুব নির্জন।'

রানা কিছু বলল না।

দু

সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে, সকাল দশটার মধ্যে তাপমাত্রা দাঁড়াল বত্রিশ সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ নব্বুই ডিগ্রী ফারেনহাইট। একটু বাতাস ছাড়তে সামান্য আরাম বোধ করলেন জর্জ রেডক্লিফ। ব্যাকপ্যাক থেকে প্লাস্টিকের ছোট একটা বোতল বের করে পানি খেলেন তিনি, অর্ধেকটা খালি করে ফেললেন। টার্মিনালের পাশে একটা ট্যাপ দেখেছেন, সংযমী হবার এখন আর কোন প্রয়োজন নেই।

কাল রাতের মতই নির্জন আর ফাঁকা লাগছে এয়ারপোর্ট। সামরিক অংশে গার্ডদের পালাবদল ঘটেছে, তবে ফ্লাইট লাইন বা হ্যাঙ্গারে কোনরকম তৎপরতা নেই। কমার্শিয়াল এয়ার টার্মিনালের সামনে এক লোককে মোটর সাইকেলে চড়তে দেখলেন রেডক্লিফ, কণ্ট্রোল টাওয়ারের নিচে এসে থামল, তারপর উঠে পড়ল ওপরে। তারমানে একটা প্লেন আসবে।

এক মিনিট পর টার্মিনালের সামনে টারমাকে এসে দাঁড়াল একটা ট্রাক। দু'জন লোক কাঠের এক সেট গোঁজ নামাল, ল্যাণ্ড করার পর প্লেনের টায়ারে গুঁজে দেবে। সতর্ক হয়ে গেলেন রেডক্লিফ, আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন ঠিক কোথায় এসে থামবে প্লেনটা।

ঝোপের ভেতর চিৎ হলেন তিনি, একটা শকুনকে চক্কর দিতে দেখে ভাবলেন এত গরমে ওরা বাঁচে কিভাবে? খানিক পর প্লেনটাকে দেখত পেলেন। সিভিলিয়ান এয়ারবাস, গায়ে হালকা ও গাঢ় সবুজ ডোরার ওপর লেখা রয়েছে এয়ার আফ্রিকা।

টার্মিনাল ভবনের সামনে থামল ওটা। টায়ারে গোঁজ বসানো হলো, মেইন এগজিট ডোরে ঠেকানো হলো সিঁড়ির মাথা। এঞ্জিন বন্ধ হয়নি। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল লোক দু'জন, আশা করছে দরজা খুলে বেরিয়ে আসবে প্যাসেঞ্জাররা। কিন্তু দরজা খুলতে দেরি হচ্ছে।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে সামনে বাড়লেন রেডক্লিফ, তারপর রানওয়ের কিনারা ধরে ছুটলেন, মাথাটা নিচু করে রেখেছেন। ত্রিশ মিটার এগিয়ে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অবশেষে প্যাসেঞ্জার ডোর সরে গেল এক পাশে। ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট, একটা মেয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে মালিয়ান গ্রাউণ্ড ক্রুদের পাশ কাটাল, সোজা চলে যাচ্ছে কণ্ট্রোল টাওয়ারের দিকে। লোক দু'জন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সেদিকে।

টাওয়ারের গোড়ায় পৌঁছে থামল মেয়েটা। ব্যাগ থেকে ছোট একজোড়া ওয়্যার কাটার বের করে শান্ত ভাবে পাওয়ার ও কমিউনিকেশন লাইন কেটে দিল। কণ্ট্রোল টাওয়ার আর টার্মিনাল ভবনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঘুরল মেয়েটা, হাত নেড়ে সঙ্কেত দিল প্লেনের পাইলটকে।

ফিউজিলাজের পিছন থেকে বিকট ঝন ঝন শব্দে ঝুলে পড়ল একটা র‍্যাম্প,

সেই সঙ্গে কান ঝালাপালা করে দিল অটোমোবাইল এঞ্জিনের কর্কশ আওয়াজ। অকস্মাৎ প্লেনের গেট থেকে র‍্যাম্প বেয়ে নেমে এল অদ্ভুতদর্শন একটা ভেহিকেল। নেমেই গতি পেয়ে গেল সেটা, এয়ারফিল্ডের সামরিক অংশের দিকে ছুটছে, গার্ডদের তাঁবু লক্ষ্য করে।

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন রেডক্লিফ, এরকম ভেহিকেল জীবনে কোনদিন দেখেননি তিনি। গাড়ির শরীর বা চেচিস বলতে কিছু নেই। একগাদা টিউব আকৃতির সাপোর্ট ঝালাই করে একটা কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, শক্তি যোগাচ্ছে একটা সুপারচার্জড ডি-এইচ রোডেক– পাঁচশো একচল্লিশ কিউবিক-ইঞ্চি এঞ্জিন, সাধারণত আমেরিকান ড্রাগ রেসাররা ব্যবহার করে। ভেহিকেলের সামনে ছোট্ট একটা ককপিটে বসে রয়েছে ড্রাইভার, গানার বসেছে তার সামান্য একটু ওপরে, কুৎসিতদর্শন একটা সিক্স-ব্যারেলের পিছনে– দেখে মনে হলো ওটা সম্ভবত লাইটওয়েট ভলকান-টাইপ মেশিনগান। আরেকজন গানার বসেছে রিয়ার অ্যাক্সেল-এর ওপর, পিছন ফিরে, তার সামনে একটা ৫.৫৬-মিলিমিটার স্টোনার সিক্সটি-থ্রী মেশিনগান।

ভেহিকেলের পিছু নিয়ে প্লেন থেকে বেরিয়ে এল অচেনা ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র এক প্লাটুন সৈনিক। হতভম্ব মালিয়ান দু'জনকে বন্দী করল তারা, টার্মিনাল ভবন দখল করে নিল।

এয়ারফিল্ডের সামরিক অংশে দাঁড়ানো মালিয়ান এয়ারফোর্সের দু'জন গার্ড হাঁ করে তাকিয়ে ভেহিকেলটাকে ছুটে আসতে দেখছে। একশো মিটারের মধ্যে এসে পড়ার পর ওটাকে তারা হুমকি বলে চিনতে পারল। হাতের রাইফেল তুলল বটে, তবে গুলি করার সুযোগ পেল না, তার আগেই সামনের গানার তার ভলকান থেকে এক পশলা গুলি করে ভবলীলা সাঙ্গ করল তাদের।

ভেহিকেল ঘুরিয়ে নিল ড্রাইভার। গানাররা এবার টারমাকে পার্ক করা আটটা মালিয়ান জেট ফাইটারকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল। যুদ্ধের কোন হুমকি না থাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয়নি ওগুলো, ইন্সপেকশনের জন্যে দু'সারিতে সাজানোর ভঙ্গিতে রাখা হয়েছে। মেশিনগানের বিরতিহীন গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেল প্রতিটি জেট ফাইটার, এক এক করে প্রতিটিতে আগুন ধরে গেল। বিস্ফোরণ, আগুন, ধোঁয়া, সবই খুব দর্শনীয় হলো।

রেডক্লিফের অবস্থা হয়েছে, দেখিলেও না হয় প্রত্যয়। গাছের আড়ালে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেলেন তিনি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাত্র ছ'মিনিট লাগল। অদ্ভুতদর্শন ভেহিকেল কাজ সেরে ফিরে যাচ্ছে জেটলাইনারের দিকে। পজিশন নিল টার্মিনাল ভবনের প্রবেশমুখের সামনে। অফিসারের ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোক নিচে নামলেন প্লেন থেকে, হাতে একটা বুলহর্ন। সেটা ঠোঁটে তুলে চিৎকার করলেন, 'মি. রেডক্লিফ। দয়া করে আপনি আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবেন? আমাদের হাতে সময় খুব কম।'

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন রেডক্লিফ। ফাঁদ নয় তো? নাহ্, তা কি করে হয়! তাঁকে ধরার জন্যে, একজন মাত্র লোককে ধরার জন্যে, জেনারেল ভিনসেন্ট অবশ্যই নিজের গোটা এয়ারফোর্স ধ্বংস করবেন না। তারপরও দ্বিধা আর ভয়

কাটে না।

'মি. রেডক্লিফ।' অফিসার আবার চিৎকার করলেন। 'আপনি যদি এখানে থাকেন তো দয়া করে বেরিয়ে আসুন। তা না হলে আপনাকে ছাড়াই আমরা চলে যাব।'

'হোল্ড অন! অ্যা'ম কামিং।' রানওয়ে ধরে ছুটলেন রেডক্লিফ।

'আপনিই নুমার জর্জ রেডক্লিফ?' প্রশ্ন করলেন অফিসার। 'গুড মর্নিং।'

'হ্যাঁ, আমিই,' হাঁপাচ্ছেন রেডক্লিফ, দর দর করে ঘামছেন। 'আপনি কে?'

'কর্নেল মিরাক।' হ্যাণ্ডশেক করলেন ওঁরা।

রেডক্লিফ দেখলেন একদল এলিট ফোর্স প্লেনটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। চেহারাই বলে দেয়, কঠিন পাত্র। 'এটা কোন গ্রুপ?' জানতে চাইলেন তিনি।

'জাতিসংঘের একটা ট্যাকটিকাল টীম,' জবাব দিলেন মিরাক।

'আপনি আমার নাম বা কোথায় আছি জানলেন কিভাবে?'

'মাসুদ রানা নামে কেউ একজন একটা মেসেজ পাঠান অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে। মেসেজে বলা হয় এয়ারপোর্টের আশপাশে কোথাও লুকিয়ে থাকবেন আপনি, আপনাকে উদ্ধার করা নাকি সাংঘাতিক জরুরী।'

'আপনাকে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন পাঠিয়েছেন?'

'সেক্রেটারি জেনারেলের অনুমতি নিয়ে,' জবাব দিলেন কর্নেল মিরাক। 'আমি বুঝব কিভাবে আপনিই রেডক্লিফ?'

'আমার কাগজ-পত্র সম্ভবত নাইজার নদীর তলায় পানি খাচ্ছে। আমার কথাই আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, কর্নেল।'

একজন এইডকে ডাকলেন কর্নেল মিরাক, কঠিন সুরে রেডক্লিফকে বললেন, 'প্লেনে উঠুন।' এইডের দিকে তাকালেন। 'সবাইকে ডেকে নাও, উঠে পড়ো প্লেনে।'

রেডক্লিফ জানতে চাইলেন, 'আমাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'প্যারিসে। প্যারিস থেকে কনকর্ড চেপে ওয়াশিংটন পৌঁছুবেন, ওখানে আপনাকে ডিব্রিফ করার জন্যে গুরুত্বপূর্ণ একদল মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। ব্যস, শুধু এইটুকুই আপনার জানা দরকার। এবার দয়া করে প্লেনে উঠুন। সময় বড়ই মূল্যবান।'

'এত ব্যস্ততার কারণ কি? ওদের এয়ারফোর্স তো ধ্বংসই করে দিয়েছেন।'

'মাত্র একটা স্কোয়াড্রন। রাজধানী বামাকোর চারধারে আরও তিন স্কোয়াড্রন আছে। সতর্ক করা হলে এখনও ওরা মালিয়ান আকাশে আমাদেরকে বাধা দিতে পারে।'

প্লেন আকাশে ওঠার পর কর্নেল মিরাক জিজ্ঞেস করলেন, 'এত কি ভাবছেন আপনি? উদ্ধার পেয়ে খুশি হননি?'

ম্লান হাসলেন রেডক্লিফ। 'না, আমি আমার বন্ধুদের কথা ভাবছি। যাদের ফেলে যাচ্ছি।'

'মি. রানা ও মি. মুরল্যাণ্ড? ওঁরা আপনার বন্ধু?'

'বহু বছরের পুরানো বন্ধু।'
'ওঁরা আপনার সঙ্গে এলেন না কেন?'
'ওদের কাজ এখনও শেষ হয়নি।'
মাথা নাড়লেন কর্নেল মিরাক। 'হয় ওঁরা খুব সাহসী মানুষ, নয়তো খুবই বোকা।'
রেডক্লিফও মাথা নাড়লেন। 'বোকা নন।'
'এই এলাকা সম্পর্কে জানি আমি, ওঁদের নরকবাস নিশ্চিত।'
'আপনি ওদের চেনেন না,' বললেন রেডক্লিফ। 'নরকে ঢুকে আবার কেউ যদি বেরিয়ে আসতে পারে, তার নাম মাসুদ রানা।'

নিজের লঞ্চ থেকে ডকে নামতেই জেনারেল ভিনসেন্টের ছ'জন বডিগার্ড স্যালুট করল স্যাভয় গাসকিলকে। একজন মেজর এগিয়ে এল। 'মসিয়ে গাসকিল?'
'কি ব্যাপার?'
'জেনারেল ভিনসেন্ট এখুনি আপনাকে এসকর্ট করে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন।'
'তিনি কি জানেন না ফোর্ট ফরোতে আমার পৌঁছুনোটা জরুরী?'
সবিনয়ে মাথা নত করল মেজর। 'তাঁর অনুরোধ, মীটিংটাও খুব জরুরী।'
কাঁধ ঝাঁকালেন গাসকিল। 'আফটার ইউ।'
পথ দেখিয়ে বড়সড় একটা ওয়্যারহাউসের দিকে গাসকিলকে নিয়ে আসা হলো। 'প্লীজ, এদিকে,' বলে একটা সরু গলির ভেতর ঢুকল মেজর। গলির ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মার্সিডিজ-বেঞ্জ ট্রাক ও ট্রেইলার, জেনারেল ভিনসেন্টের প্রাইভেট মোবাইল কমাণ্ড ও সেই সঙ্গে লিভিং কোয়ার্টার। সশস্ত্র গার্ডদের কড়া পাহারা দেখা গেল চারপাশে।
দরজা খুলে ভেতরে ঢোকানো হলো গাসকিলকে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিছনে বন্ধ হয়ে গেল সেটা। 'জেনারেল তাঁর অফিসে আছেন,' বলল মেজর, আরেকটা দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল।
বাইরের প্রচণ্ড গরমের তুলনায় অফিসের ভেতরটাকে মনে হলো বরফের তৈরি ইগলু। গাসকিল ধারণা করলেন, পুরোদমে এয়ার কণ্ডিশনিং চালু রাখা হয়েছে। বুলেট-প্রুফ জানালার পর্দা সরানো হলো, আবছা অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে সময় লাগছে।
'ভেতরে ঢুকুন, গাসকিল, বসুন।' ডেস্কে চারটে ফোন, একটা ফোন নামিয়ে রেখে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন জেনারেল ভিনসেন্ট।
হাসলেন গাসকিল, তবে বসলেন না। 'এত গার্ড কেন? আপনি কি কোন খারাপ কিছু আশা করছেন?'
হাসলেন ভিনসেন্টও। 'গত কয়েক ঘণ্টায় যা ঘটে গেছে, অতিরিক্ত সিকিউরিটি দরকার বলে মনে হলো।'
গাসকিল সরাসরি জানতে চাইলেন, 'আপনি আমার হেলিকপ্টার পেয়েছেন?'
'এখনও পাইনি।'

'মরুভূমিতে একটা হেলিকপ্টার আপনি হারান কিভাবে? মাত্র আধ ঘণ্টা চলার মত ফুয়েল ছিল।'

'দেখেশুনে মনে হচ্ছে আপনি বিদেশী চর দু'জনকে পালাতে দিয়েছেন...'

'আমার হাউজবোটে বন্দী রাখার ব্যবস্থা নেই,' কঠিন গলায় বললেন গাসকিল। 'যখন সুযোগ ছিল আপনি ওদেরকে আমার হাত থেকে চেয়ে নিতে পারতেন।'

তাঁর দিকে সরাসরি তাকালেন জেনারেল ভিনসেন্ট। 'ভুল যা হবার তা তো হয়েছেই। আর ওই একটাই ভুল নয়। এখন জানা গেছে, নুমার ওই লোক দু'জন বাউরেম থেকে আমার গাড়িটাও চুরি করে নিয়ে গেছে। আপনার হেলিকপ্টার সম্ভবত নাইজারে ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা।'

'আপনার গাড়ি মানে...আপনার ভয়সিন?' গাসকিল উচ্চারণ করলেন 'ভাসান'।

'হ্যাঁ,' গম্ভীর সুরে বললেন জেনারেল। 'আমার অত শখের ক্লাসিক গাড়িটা ওরা চুরি করেছে।'

এতক্ষণে বসলেন গাসকিল। নিজের হেলিকপ্টার হারিয়ে রেগে আছেন তিনি, তবে জেনারেল তাঁর ক্লাসিক কার হারিয়েছেন শুনে খানিকটা আনন্দও পাচ্ছেন। 'ওরা না বলছিল গাও-এর দক্ষিণে একটা হেলিকপ্টার ওদেরকে নিতে আসবে–তার কি হলো?'

'ওদের মিথ্যে কথার ফাঁদে ধরা খেয়েছি আমি। বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে শুধু শুধু ফোর্স পাঠিয়েছিলাম। হেলিকপ্টার আসেনি, রাডার ফিল্ড ইউনিট কোন এয়ারক্রাফটও ডিটেক্ট করেনি। তার বদলে গাও এয়ারপোর্টে একটা কমার্শিয়াল এয়ারলাইনার ল্যাণ্ড করে।'

'আপনাকে সতর্ক করা হয়নি কেন?'

'সতর্ক করার মত বলে মনে হয়নি,' জবাব দিল ভিনসেন্ট। 'সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা আগে গাও-এর এয়ার আফ্রিকার অফিসাররা জানায় যে তাদের একটা প্লেন অনিয়মিত ফ্লাইটে ওখানে ল্যাণ্ড করবে, একদল ট্যুরিস্ট নিয়ে।'

'এয়ারপোর্টের অফিসাররা কথাটা বিশ্বাস করল?' রেগে যাচ্ছেন গাসকিল।

'কেন করবে না? তারপরও তারা কোম্পানির হেডকোয়ার্টার আলজিয়ার্সে যোগাযোগ করে। সেখান থেকেও একই কথা বলা হয়।'

'তারপর কি ঘটল?'

হাত দিয়ে কপাল চাপড়ালেন জেনারেল। 'জিজ্ঞেস করবেন না। সিকিউরিটি গার্ডদের মেরে ফেলেছে ওরা। আমার আটটা জেট ফাইটার সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি শেষ হয়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, বিস্ফোরণের আওয়াজে হাউজবোটের সবার ঘুম ভেঙে যায়। এয়ারপোর্টের দিকে ধোঁয়াও দেখেছি আমরা, ধরে নিই কোন প্লেন ক্র্যাশ করেছে। অ্যাসল্ট ফোর্সের পরিচয় জানা গেছে?'

'ইউনিফর্ম চেনা যায়নি, কোনও ব্যাজ ছিল না।'

গাসকিল গম্ভীর হলেন। 'কনটামিনেশন আবিষ্কারের জন্যে এই মাপের হামলা

অসম্ভব। আমার মনে হচ্ছে, এ আপনার বিদ্রোহী প্রতিপক্ষের কাজ।'

'আপনি দেখছি প্রলাপ বকতে শুরু করলেন! অল্প কয়েকজন টুয়ারেগ, যাদের সম্বল বলতে উট আর তলোয়ার, তারা এভাবে আক্রমণ করবে কিভাবে!'

'হয়তো মার্সেনারি ভাড়া করেছে।'

'ফাণ্ড কোথায় পাবে?' মাথা নাড়লেন জেনারেল। 'না, এটা কোন প্রফেশনাল ফোর্সের সুপরিকল্পিত আক্রমণ। ফাইটারগুলো ধ্বংস করা হয়েছে পালাবার সময় কেউ যাতে ওদেরকে বাধা দিতে না পারে। নুমার একজন এজেন্টকে তুলে নিয়ে গেছে ওরা।'

'আসল কথাটাই দেখছি বলতে ভুলে গিয়েছিলেন!' তিক্তকণ্ঠে অভিযোগ করলেন গাসকিল।

'গ্রাউণ্ড ক্রুরা রিপোর্ট করেছে, লোকটার নাম রেডক্লিফ, মরুভূমি[illegible] লুকিয়ে ছিল। তাকে নিয়ে প্লেনটা আলজেরিয়ার দিকে চলে গেছে।'

'অবিশ্বাস্য!'

'বিদেশী কোন শক্তি তেল খুঁজছে, এ আমি এখন আর বিশ্বাস করি না,' বললেন জেনারেল। 'আমার বিশ্বাস, আমাদের দু'জনের স্বার্থেই বাইরের কোন শক্তি আঘাত হানছে।'

'আপনার এরকম মনে করার কারণ?' গাসকিলের গলায় খানিকটা বিদ্রূপ প্রকাশ পেল।

'আমরা জানি নদীতে যে বোট বিস্ফোরিত হলো তাতে তিনজন লোক ছিল। বিস্ফোরণটা ছিল ডাইভারশন। দু'জন আপনার হাউজবোটে ওঠে। তৃতীয়জন, নিশ্চয়ই রেডক্লিফ, সাঁতার দিয়ে তীরে ওঠে, তারপর মরু পেরিয়ে এয়ারপোর্টে চলে যায়। প্রশ্ন হলো, প্লেনটা রেডক্লিফকে নিতে এল কিভাবে? কে খবর দিল? অবশ্যই সেই লোকটার কাজ, নিজেকে যে মাসুদ রানা বলছে।'

'কিভাবে জানছেন?'

'ভুলে গেছেন, মাসুদ রানা আপনার স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করেছিল, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে?'

'তাহলে ওরাও রেডক্লিফের সঙ্গে পালায়নি কেন?'

'পালায়নি নয়, পালাতে পারেনি, কারণ আপনার হাতে ধরা পড়ে যায় ওরা।'

'তাহলে আমার হেলিকপ্টার চুরি করার পর পালায়নি কেন? মাত্র দেড়শো কিলোমিটার দূরে নাইজেরিয়ান সীমান্ত। ফুয়েলেও কুলিয়ে যেত। তা না করে মরুভূমির গভীরে কেন চলে যাবে? মান্ধাতা আমলের একটা গাড়ি চুরি করে কোথায় তারা পৌঁছুতে চায়? ওদিকে নদীর ওপর কোন ব্রিজ নেই, কাজেই দক্ষিণ সীমান্তের দিকে যেতে পারবে না। তাহলে কোথায় যেতে চাইছে ওরা?'

জেনারেলের চোখে পলক পড়ছে না। 'হয়তো আমরা যেখানে আশা করছি না।'

ভুরু কুঁচকে গাসকিল জিজ্ঞেস করলেন, 'উত্তরে?'

'আর কোথায়?'

'অসম্ভব!'

‘তাহলে আপনার ধারণাটা শুনি।’

‘উত্তরে যাওয়া মানে মরুভূমিতে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলা। এ স্রেফ আত্মহত্যার সামিল।’

‘ওরা গোপন কোন মিশন নিয়ে এসেছে, মসিয়ে গাসকিল। সেটা কি তা অবশ্য আমি ধরতে পারছি না।’

‘ওরা কি ফোর্ট ফরো বা তেবেজায় পৌঁছুতে চাইছে?’

জেনারেল ভাবছেন, ওয়েস্ট ডিসপোজাল ইউনিট ও স্বর্ণখনির সঙ্গে এই আক্রমণের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? ‘সেক্ষেত্রে তিনশো মাইল দক্ষিণে কেন ঘোরাফেরা করবে ওরা?’

‘বুঝতে পারছি না,’ বললেন গাসকিল। ‘তবে জাতিসংঘ থেকে আমার এজেন্ট কি মেসেজ পাঠিয়েছে, আপনিও তা জানেন। নাইজারে একটা কেমিকেল কনটামিনেশনের উৎস খুঁজছে ওরা, সাগরে পড়ার পর ওটা নাকি রেড টাইড সৃষ্টি করছে।’

‘আমি মনে করি এ-সবই মিথ্যে অজুহাত, স্রেফ কাভার।’

‘তাহলে ফোর্ট ফরোতেই অনুপ্রবেশ করতে চাইছে ওরা,’ বললেন গাসকিল। ‘সেই সঙ্গে তেবেজায়ও যাবে, মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে রিপোর্ট করবে জাতিসংঘে।’

‘আমার সন্দেহ হচ্ছে, রেডক্লিফের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিল। তা না হলে তাকে উদ্ধার করার জন্যে এরকম একটা ফোর্স পাঠানো হবে কেন?’ একটু থেমে আবার তিনি বললেন, ‘রানা আর মুরল্যাণ্ডকে ধরাটাই এখন আসল কাজ। ওদেরকে ধরতে পারলে সব কথা জানা যাবে।’

‘ধরার ব্যবস্থা করেছেন?’

‘সবগুলো মিলিটারি আর পুলিস ইউনিটকে কাজে লাগানো হয়েছে,’ জবাব দিলেন জেনারেল ভিনসেন্ট। ‘দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার প্রতিটি রাস্তার ওপর কড়া নজর রাখছে তারা। উত্তর মরুর ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছি এয়ার ফোর্সকে।’

‘ভেরি গুড।’

‘সাপ্লাই ছাড়া মরভূমিতে দু'দিনের বেশি টিকতে পারবে না ওরা।’

‘আপনার ওপর আমার আস্থা আছে, জেনারেল। আশা করি কাল এই সময়ের মধ্যে আপনার ইন্টারোগেশন সেলে ওদের দু'জনকে পাওয়া যাবে।’

কর্নেল সাদিক জিবরিলকে স্যালুট করল ক্যাপটেন ফয়সল, রিপোর্ট করল, ‘জাতিসংঘের বিজ্ঞানীদের তেবেজায় বন্দী করা হয়েছে, স্যার।’

‘নতুন শ্রমিক পাওয়ায় শানিন আর অলিভা নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছে।’ হাসলেন জিবরিল।

ফয়সল শিউরে মত উঠল। ‘ওই মেয়েলোকটাকে আমি ভয় পাই, কর্নেল। ওটা একটা ডাইনী।’

‘আমরাও কেউ ফেরেশতা নই, ফয়সল,’ বললেন কর্নেল। ‘জেনারেল

আমাদেরকে বেতনের দ্বিগুণ উপরি দিচ্ছেন, কাজেই ডাইনীর সঙ্গেও কাজ করতে হবে। অলিভার হাতে যখন পড়েছে, ডক্টর সুনারিল আর তার দল বড়জোর মাস চারেক বেঁচে থাকবে।'

'ওরা মারা গেলে জেনারেল ভিনসেণ্ট কাঁদবেন না।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল একজন লেফটেন্যাণ্ট, মালিয়ান এয়ার ফোর্সের পাইলট সে, জাতিসংঘ বিজ্ঞানীদের প্লেনটা সেই চালিয়েছে। কর্নেলকে স্যালুট করল সে। কর্নেল জানতে চাইলেন, 'সব ঠিকঠাক মত ঘটেছে তো?'

লেফটেন্যাণ্ট হাসল। 'জ্বী, স্যার। প্লেন নিয়ে অ্যাসেলারে ফিরে যাই আমরা, যতগুলো লাশ দরকার ছিল লোড করি, তারপর উত্তরে এসে আমি আর কো-পাইলট বেইল আউট করি, কাছাকাছি ক্যামেল ট্র্যাক থেকে একশো কিলোমিটার দূরে।'

'ক্র্যাশ করার পর প্লেনটা ঠিকমত পুড়েছে তো?' জানতে চাইলেন কর্নেল জিবরিল।

'জ্বী, স্যার।'

'তুমি নিজে কাছে গিয়ে দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যাণ্ট। 'ডেজার্ট ভেহিকেলের ড্রাইভার নিয়ে এল আমাদের, আপনি যাকে পাঠিয়েছেন। তাকে নিয়ে প্লেনটা দেখতে গেলাম আমরা। কন্ট্রোল আমি সেট করেছিলাম, প্লেনটা ডাইভ দিয়েছিল খাড়াভাবে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ হয়, দশ মিটার গভীর একটা গর্ত তৈরি করে। এঞ্জিন ছাড়া আর যে-সব আবর্জনা দেখলাম, কোনটাই জুতোর বাক্সের চেয়ে বড় হবে না আকারে।'

কর্নেলের মুখে সন্তুষ্টির হাসি ফুটল। 'জেনারেল ভিনসেণ্ট খুশি হবেন। তোমরা দু'জনেই প্রমোশন আশা করতে পারো।' লেফটেন্যাণ্টের দিকে তাকালেন তিনি। 'এবার, তুমি, লেফটেন্যাণ্ট, ড. সুনারিলের প্লেনটাকে খুঁজে বের করবে। মানে সার্চ অপারেশনের লিডার নির্বাচন করা হলো তোমাকে।'

'স্যার? কি বলছেন? আমি তো জানিই প্লেনটা কোথায়, সার্চ করতে হবে কেন?' লেফটেন্যাণ্ট হতভম্ব।

'ভেবে দেখো, প্লেনে তোমরা লাশ তুলেছিলে কেন?'

মাথা চুলকে লেফটেন্যাণ্ট বলল, 'ক্যাপটেন ফয়সল প্ল্যানটা আমাকে ব্যাখ্যা করেননি, স্যার।'

'প্লেনটা খুঁজে পাবার ভান করব আমরা,' ব্যাখ্যা করলেন কর্নেল। 'তারপর ওখানে নিয়ে যাব ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেটরদের। লাশগুলো ওরা চিনতে পারবে না, দুর্ঘটনার কারণও বের করতে পারবে না।' লেফটেন্যাণ্টের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'তুমি যদি কাজটা নিখুঁতভাবে করে থাকো।'

লেফটেন্যাণ্ট আশ্বস্ত করল, 'আমি নিজে ফ্লাইট রেকর্ডার সরিয়েছি, স্যার।'

'গুড। এখন আমরা ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়াকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে পারি যে জাতিসংঘের বিজ্ঞানীদের নিয়ে প্লেনটা নিখোঁজ হয়ে গেছে।'

*

রোদে পুড়ে শক্ত হয়ে গেছে বালি। বালির সঙ্গে পাথরও রয়েছে, গায়ে ফোস্কা পড়া দুপুরের উত্তাপ প্রতিফলিত হচ্ছে ওতে। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, ধু-ধু মরুপ্রান্তর। সরু একটা খাদের কাঁকর ছড়ানো মেঝেতে বসে রয়েছে রানা, ভয়সিনের ছায়ায়। রোদ এত বেশি উজ্জ্বল, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। গাড়ির ট্রাংক থেকে কিছু টুল পেয়েছে মুরল্যাণ্ড, সেগুলোর সাহায্যে ভয়সিনের এগজস্ট পাইপ আর মাফলার খুলে নিয়েছে সে, গাড়িটাকে আরও বেশি গ্রাউণ্ড ক্লিয়ারান্স দেয়ার জন্যে। ওরা ইতিমধ্যে টায়ার প্রেশারও কমিয়েছে, চাকা যাতে আরও ভালভাবে কামড় বসাতে পারে বালিতে। মরুভূমিতে সম্পূর্ণ বেমানান হলেও, বৈরী পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে সাবলীল ভঙ্গিতেই ওদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে পুরানো ভয়সিন।

তারার আলোয় শুধু রাতে পথ চলেছে ওরা, গতি ছিল ঘণ্টায় দশ কিলোমিটার। এক ঘণ্টা পর পর থেমেছে, হুড খুলে ঠাণ্ডা হতে দিয়েছে এঞ্জিনকে। হেডলাইট জ্বালার কথা ভাবেইনি ওরা, জানে দূরের কোন প্লেন থেকেও আলোটা দেখা যেতে পারে। মাঝে মধ্যেই গাড়ির সামনে হাঁটতে হয়েছে আরোহীদের, জমিনের কি অবস্থা দেখার জন্যে। একবার তো খাড়া একটা নালায় একটুর জন্যে খসে পড়েনি। আর দু'বার নরম বালি থেকে টেনে তুলতে হয়েছে চাকা।

দিনের বেলা খাদ আর নালার তলায় আশ্রয় নিয়েছে ওরা। প্রতিবার থেমেই গাড়ির গায়ে বালি ছড়িয়েছে, দূর থেকে দেখে যাতে মরুরই একটা অংশ বলে মনে হয়।

'সফট ড্রিঙ্ক চাই, সফট ড্রিঙ্ক!' ফেরিঅলা সাজল মুরল্যাণ্ড। তার হাতে গ্রামের গ্যারেজ থেকে সংগ্রহ করা দুটো বোতল, একটায় পানি, অপরটায় সফট-ড্রিঙ্ক।

'মাফ করো, ভাই, সালফারের গন্ধ আমার সহ্য হয় না,' বলল রানা। 'আমাকে বরং এক ঢোক পানি দাও।'

'আর ডিনারে কি খাবে? সারডিন চলবে?'

খাওয়া শেষ হলো ওদের, মুরল্যাণ্ড এখনও আঙুল চাটছে। 'মরুভূমিতে বসে মাছ খাচ্ছি, ভাবতে গেলেই নিজেকে আমার ইডিয়ট মনে হচ্ছে।'

রানা হাসল।

'কিছু শুনতে পাচ্ছ?' এক মুহূর্ত পর জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'প্লেন।' কানের পিছনে হাত তুলল রানা। 'আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে নিচু দিয়ে একটা জেট উড়ে যাচ্ছে।' নালার ঢাল বেয়ে উঠল ও, শক্ত একটা শুকনো ঝোপ ধরে মাথা তুলল কিনারার ওপর। চোখ বুলাল চারদিকের আকাশে।

নীল আকাশে প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। চোখ আরও নিচে নামাল রানা। তিন কিলোমিটার দূরে কি যেন একটা নড়ল। ভাল করে তাকাতেই চিনতে পারা গেল। আমেরিকায় তৈরি একটা ফ্যান্টম, গায়ে মালিয়ান এয়ার ফোর্সের প্রতীকচিহ্ন, জমিন থেকে একশো মিটার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। ঠিক উড়ে যাচ্ছে না, বৃত্ত রচনা করছে।

'দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।
'দক্ষিণে চক্কর দিচ্ছে।'
'তারমানে আমাদের খুঁজছে।'
ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। গাড়ির বাম্পারে এক করে বাঁধা কয়েকটা ঝোপ ঝুলছে, গাড়ির পিছনে চাকার দাগ মোছার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। খাদে আসার পথে সমান্তরাল দাগ পুরোপুরি অদৃশ্য হয়নি। 'হেলিকপ্টার থেকে হয়তো দেখা যাবে, প্লেন থেকে দেখতে পাবে না,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল ও।
বৃত্তটা খাদের দিকে সরিয়ে আনছে জেটের পাইলট। গাড়ির তলায় চলে গেল মুরল্যাণ্ড। কয়েকটা ঝোপ ছিঁড়ে মাথা আর কাঁধ ঢাকল রানা। উত্তেজনায় দম বন্ধ করল ও। পরবর্তী বৃত্ত শুরু হতে যাচ্ছে, এবার সরাসরি ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে প্লেন।
ঝোপের ভেতর থেকে তাকিয়ে থাকল রানা। চলে গেল প্লেন, তারপর আবার ফিরে এল। ধীরে ধীরে বৃত্তটা দূরে সরে যাচ্ছে। এভাবে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। চেসিসের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল মুরল্যাণ্ড। 'ব্যাটারা এদিকে খুঁজছে কি মনে করে? তারমানে কি আমরা ওদেরকে বোকা বানাতে পারিনি?'
'কিংবা হয়তো জেনারেল ভিনসেন্ট কোন ঝুঁকি নিচ্ছেন না।'
মুরল্যাণ্ড হঠাৎ হাসল। 'ভদ্রলোক নিউক্লিয়ার বোমা হয়ে গিয়েছিলেন, যখন খবর পেলেন যে তাঁর গাড়িটা চুরি হয়ে গেছে।'
পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়া সূর্যের দিকে তাকাল রানা। 'আর এক ঘণ্টা পর রওনা হতে পারব আমরা।'
'সামনেটা কি রকম দেখছ?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।
'সমতল বালি, কাঁকর থাকলেও বোল্ডার খুব কম।'
'বাউরেম থেকে রওনা হবার পর কত দূর এলাম, বলতে পারবে?'
'একশো ষোলো কিলোমিটার, অন্তত অডোমিটার তাই বলছে। আমি ধরে নিচ্ছি নব্বুই।'
'অথচ এখনও কেমিকেল বা ওয়েস্ট ফ্যাসিলিটির কোন চিহ্ন নেই।'
'খালি একটা ড্রামও চোখে পড়ছে না।'
'আরও এগোবার আমি তো কারণ দেখছি না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'কেমিকেল কোথাও যদি লিক হয় বা ফেলা হয়, শুকনো নালা ধরে নব্বুই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কিভাবে তা নাইজার নদীতে পড়বে?'
'হ্যাঁ, সম্ভাবনাটা খুব উজ্জ্বল নয়।'
'আমরা কিন্তু এখনও আলজিরিয়ান সীমান্তের দিকে যেতে পারি।'
মাথা নাড়ল রানা। 'গ্যাসে কুলাবে না। ট্র্যান্স-সাহারান মোটর ট্র্যাক-এ পৌঁছুতে হলে দু'শো মাইল হাঁটতে হবে। অর্ধেক পথও যেতে পারব না, এক্সপোজারে মারা পড়ব।'
'তুমি বলতে চাইছ মরি মরব, তা-ও সামনে এগোতে হবে আমাদের?'

খাদের নিচে নেমে এল রানা। 'দোস্ত, শুনতে পাচ্ছ? কে যেন গান গায় মনে হচ্ছে!'

'আমরা হয়তো বেঁচে নেই,' ফিসফিস করল মুরল্যাণ্ড। 'স্বর্গে চলে এসেছি।'

'ঠিক জানো, স্বর্গের ভাষা ইংরেজি?'

দিগন্ত ছুঁই ছুঁই করছে সূর্য, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গানটা শুনছে ওরা। একটা ক্যাম্প সং, 'মাই ডারলিং ক্লেমেনটাইন...'

প্রতি মুহূর্তে আওয়াজটা বাড়ছে, কাছাকাছি চলে আসছে গায়ক। 'ইউ আর লস্ট অ্যাণ্ড গন ফরএভার, ড্রেডফুল সরি ক্লেমেনটাইন।'

তাড়াতাড়ি একটা রেঞ্চ হাতে নিল মুরল্যাণ্ড। 'খাদের দিকেই আসছে!'

রানার হাতে অস্ত্র হিসেবে চলে এল কয়েকটা পাথর। গাড়ির আড়ালে বসে পড়ল ওরা।

খাদের কিনারায় ছায়া পড়ল একটা। প্রথমে মানুষের, তারপর একটা মানবেতর প্রাণীর। খাদের তলায় গাড়িটা দেখে ফেলেছে, থেমে গেল গান। লোকটা যে খুব অবাক হলো তা নয়, তাকে বরং কৌতূহলী মনে হলো। ঢাল বেয়ে নিচে নেমে এল সে, মোটেও ভয় পাচ্ছে না। নামার সময় প্রাণীটিকে টেনে আনল। হাত তুলে গাড়ির গা থেকে বালি আর ঝোপ সরাল। গাড়ির উল্টোদিক ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা ও মুরল্যাণ্ড।

কাপড়চোপড় দেখে মনে হলো ওয়েস্টার্ন ছবির ডেজার্ট প্রসপেক্টর। মাথায় তোবড়ানো স্টেটসন হ্যাট, সাসপেণ্ডার দিয়ে উঁচু করা ডেনিম প্যান্ট, লেদার বুটের ভেতর গোঁজা। ঘাড়ে লাল একটা ব্যানডানা– রুমাল, মুখের নিচের অংশ আড়াল করে রেখেছে। তার পিছনে প্রাণীটি উট নয়, মালবাহী গর্দভ, পিঠে প্রায় তারই সমান আকারের একটা বোঝা, বোঝায় রয়েছে নানা রকম সাপ্লাই– চাদর, খাবার ভরা টিনের কৌটা, শাবল, কুড়াল, লিভার-অ্যাকশন উইনচেস্টার রাইফেল ইত্যাদি।

লাল রুমালটা মুখ থেকে খুলল আগন্তুক, সাদা গোঁফ আর দাড়ি বেরিয়ে পড়ল। বৃদ্ধ মানুষ, চোখ দুটো সবুজ। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে কুর্নিশ করলেন, মুখে বন্ধুত্বের হাসি। কথা বললেন ইংরেজিতে, 'দেখে মনে হচ্ছে আপনারা আমার ভাষা বুঝবেন। ভালই হলো দেখা হয়েছে, নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলাম।'

তিন

'এরকম জেরা করলে আমি কিন্তু চলে যাব।'

বৃদ্ধকে কেন যেন ভাল লোক বলে মনে হলো রানার, ভাবল বিশ্বাস করা যায়। নিজেদের নাম বলল ও, স্বীকার করল যে মালিয়নরা ওদেরকে খুঁজছে।

বৃদ্ধ কাঁধ ঝাঁকালেন। 'আশ্চর্য হচ্ছি না। এদিকে বিদেশীদের ভাল চোখে দেখা হয় না।' আবার গাড়িটার দিকে তাকালেন। 'রাস্তা নেই, তারপরও এটাকে এতদূর আনলেন কিভাবে?' একটা হাত বাড়াল সে। 'সবাই আমাকে বণ্ড বলে, জেমস বণ্ড।'

হেসে ফেলল রানা। 'তার বয়েস আরও কম হবার কথা, গল্পের নায়করা তো চিরতরুণ।'

'অনেক বছর আগের কথা, অ্যারিজোনার প্রসপেক্টিং ট্রিপ থেকে ফিরলে সেলুনের পুরানো বন্ধুরা আমাকে জেমস বণ্ড বলে অভ্যর্থনা জানাত। তখন সিরিজটা মাত্র জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। বয়স? আমি আপনার চেয়ে তরুণ, মিস্টার রানা।'

গাধার দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'এদিকে তো গাধা অচল। সঙ্গে উট রাখেননি কেন?'

'এর একটা ইতিহাস আছে, মিস্টার মুরল্যাণ্ড,' বললেন বৃদ্ধ। 'আট বছর আগে নেভাডায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিল মি. এম। ওকে আমি ট্রেনিং দিয়েছি। ইয়ান ফ্লেমিং যাই লিখুন, বাস্তব জীবনে মি. এমের বস্ জেমস বণ্ড,' নিজের বুকে আঙুল ঠুকলেন, 'আমি।'

'দেখতে ভারি সুন্দর,' প্রশংসা করল মুরল্যাণ্ড।

'দেখে মনে হচ্ছে আপনারা রওনা হতে যাচ্ছিলেন। এক হপ্তা আগে দু'জন আরবকে দেখেছি, উট নিয়ে টিমবাকটু যাচ্ছে কেনা-বেচা করতে। ইচ্ছে ছিল এখানে বসে একটু গল্প-গুজব করব। বিশেষ করে আপনাদের মধ্যে একজন যখন আমেরিকান...'

গাড়ির দরজা খুলে দিল মুরল্যাণ্ড। 'আসুন না, বসুন।' রানার দিকে তাকাল সে। 'দেশী মানুষ, একটু খাতির করি।'

লেদার সীটে বসলেন বণ্ড। 'ধন্যবাদ। শেষ কবে নরম চেয়ারে বসেছি মনে নেই।'

'দেখুন, আমাদের কাছে সারডিন ছাড়া এমন কিছু নেই যে খেতে দিই আপনাকে,' হাত কচলাচ্ছে মুরল্যাণ্ড।

'ডিনার খাওয়াব আমি, আপনারা আমার মেহমান হয়ে যান। বীফ স্টু-শুনতে কেমন লাগছে?'

'আপনার মেহমান হতে পেরে আমরা যে কতটুকু খুশি তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়,' বলল রানা।

'আপনাদের পানির কি অবস্থা?' জানতে চাইলেন বণ্ড। 'প্রয়োজন হলে বলবেন, দশ মাইল উত্তরে আমি একটা কুয়া দেখাতে পারব।'

রানার দিকে তাকিয়ে হাসল মুরল্যাণ্ড। 'বিপদের সময় কোত্থেকে সাহায্য আসে কেউ বলতে পারে না!'

*

সূর্য অস্ত গেলেও দিনের ম্লান আলো এখনও অদৃশ্য হয়নি। তাপমাত্রা অনেক কমে গেছে, শ্বাস নিতে এখন আর কষ্ট হচ্ছে না। ছোট একটা কোলম্যান স্টোভ জ্বেলে স্টু তৈরি করলেন বণ্ড, স্টুর সঙ্গে বিস্কিটও পরিবেশন করলেন। প্লেট, চামচ ইত্যাদি সবই তাঁর কাছে আছে। খাওয়া শেষ হতে বণ্ড বললেন, 'এবার বলুন, এরকম একটা গাড়ি নিয়ে মরুভূমিতে আপনারা কি করছেন।'

সত্যি কথাই বলল রানা। 'টক্সিক কনটামিনেশনের উৎস খুঁজছি। জিনিসটা নাইজার নদীর পানি দূষিত করছে, সাগরে সৃষ্টি করছে রেড টাইড।'

'নতুন কথা শুনছি। কোত্থেকে আসছে?'

'হয় কোন কেমিকেল প্ল্যান্ট, নয়তো কোন ওয়েস্ট ডিসপোজাল ফ্যাসিলিটি থেকে।'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'এদিকে ওরকম কিছু নেই।'

'ভারি ধরনের কোন কনস্ট্রাকশনও নেই?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'এক ফোর্ট ফরো ছাড়া আর কিছুর কথা জানা নেই আমার। কিন্তু সেটা তো অনেক দূরে...উত্তর-পশ্চিমে।'

'ফোর্ট ফরো তো ফ্রেঞ্চদের একটা সোলার ডিটক্সিফিকেশন প্ল্যান্ট, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন বণ্ড। 'বিশাল ব্যাপার। ছ'মাস আগে মি. এমকে নিয়ে পাশ কাটিয়েছিলাম। আমাদের ধাওয়া করা হয়। চারদিকে গার্ড। মনে হবে ওখানে যেন ওরা গোপনে নিউক্লিয়ার বোমা বানাচ্ছে।'

'ফোর্ট ফরো থেকে নাইজার অনেক দূরে,' বলল রানা। 'মাঝখানে এত দূরত্ব থাকলে নদীর পানি দূষিত হয় কিভাবে?'

হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল বৃদ্ধ জেমস বণ্ডের চেহারা। 'সম্ভব ছিল, প্ল্যান্টটা যদি উয়েদ জারিত-এ হত।'

সামনে ঝুঁকল রানা। 'উয়েদ?'

'সে এক কিংবদন্তীর নদী, প্রবাহিত হত মালির ভেতর দিয়ে। একশো ত্রিশ বছর আগে বালিতে শুকিয়ে যেতে শুরু করে। স্থানীয় যাযাবরদের ধারণা উয়েদ জারিত মাটির তলায় এখনও বইছে, মিশে আছে নাইজারের সঙ্গে। আমারও তাই বিশ্বাস।'

'অন্তঃসলিলা,' বিড়বিড় করল রানা।

'অর্থ না বুঝলেও আপনার ভাষাটা মিষ্টি লাগল,' বার কয়েক মাথা দুলিয়ে প্রশংসা করলেন বৃদ্ধ।

'ধন্যবাদ,' বলে মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল রানা। 'তোমার কি ধারণা?'

মাথা ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। 'মাটির নিচের একটা প্রবাহ টক্সিক ওয়েস্ট প্ল্যান্ট থেকে রওনা হয়ে নাইজারে পড়তে পারে, অসম্ভব নয়। বর্জ্য হয়তো এই পথেই যাচ্ছে।'

মাটিতে পা ঠুকলেন বণ্ড। 'আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই খাদ পুরানো নদীর তলার সঙ্গে মিশেছে?'

'তা জানি,' বলল রানা। 'নাইজারের তীর থেকে এটাকে অনুসরণ করেই

এখানে আমরা পৌঁচেছি।'

মুরল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'এবার আপনার গল্পটা শোনা যাক। আপনি কি গোল্ড প্রসপেক্টর?'

'সোনা খুঁজছি? হ্যাঁ। প্রসপেক্টর? না। আপনাদেরকে বলতে আপত্তি নেই।' তারপরও মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন বণ্ড। 'আমি আসলে অনেক পুরানো একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ খুঁজছি।'

পাগল নাকি? রানার চোখে তীব্র সন্দেহ। 'জাহাজ? সাহারার মাঝখানে?'

'আরও পরিষ্কার করে বলি, জাহাজটা ছিল একটা কনফেডারেট আয়রনক্ল্যাড।'

রানা ও মুরল্যাণ্ড দৃষ্টি বিনিময় করল, দু'জনেই ভাবছে বৃদ্ধ হঠাৎ কামড়ে দেবেন না তো? নিস্তব্ধতা ভাঙল মুরল্যাণ্ড, আমেরিকার ইতিহাস তারই ভাল জানা আছে। 'দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন কি, আন্তঃরাজ্য গৃহযুদ্ধের সময়কার একটা আমেরিকান যুদ্ধ জাহাজ এখানে কি করে আসে?'

একটা চুরুট ধরালেন জেমস বণ্ড। 'আঠারো শো পঁয়ষট্টি সালের কথা। এপ্রিল মাস। আর এক হপ্তা পর গ্রান্টের কাছে লী আত্মসমর্পণ করবেন। রিচমণ্ড, ভার্জিনিয়ার কয়েক মাইল ভাটিতে কনফেডারেট আয়রনক্ল্যাড "টেক্সাস" মুমূর্ষু কনফেডারেড সরকারের রেকর্ড-পত্র লোড করছে। অন্তত তারা রেকর্ড-পত্রের কথাই বলেছিল, যদিও আসলে লোড করেছিল সোনা।'

'গুপ্তধনের আরও সব গল্পের মত মিথ নয় তো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিস স্বয়ং মারা যাবার আগে বলে গেছেন যে কনফেডারেট স্টেটস ট্রেজারির সোনা গভীর রাতে লোড করা হয়েছে টেক্সাসে। তিনি এবং তাঁর কেবিনেট আশা করেছিলেন ইউনিয়ন নেভির ব্লকেড পার হয়ে ওগুলো তাঁরা অন্য কোন দেশে পাচার করতে পারবেন, ফলে তাঁদের পক্ষে প্রবাসী সরকার গঠন করা সম্ভব হবে, যুদ্ধও চালিয়ে যেতে পারবেন।'

'কিন্তু ডেভিস ধরা পড়ে জেলে যান,' বলল মুরল্যাণ্ড।

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ জেমস বণ্ড। 'এবং কনফেডারেসির মৃত্যু ঘটে, পুনর্জন্ম ঘটেনি।'

'টেক্সাসের কি হলো?' জানতে চাইল রানা।

'ইউনিয়ন নেভির সঙ্গে যুদ্ধ করে আটলান্টিকে বেরিয়ে আসে টেক্সাস। কুয়াশায় হারিয়ে যাচ্ছে, এই অবস্থায় ওটাকে শেষবার দেখা গেছে।'

'আপনার ধারণা সাগর পেরিয়ে এসে নাইজার নদীতে ঢুকে পড়ে টেক্সাস?'

'শুধু ধারণা নয়, আমার কাছে প্রমাণ আছে,' দৃঢ় সুরে বললেন বৃদ্ধ। 'তখনকার ফ্রেঞ্চ কলোনির অফিসার ও স্থানীয় লোকজন গ্রামের ভেতর দিয়ে নদী পথে পালবিহীন বিশাল এক দৈত্যকে আসতে দেখেছিল, সেই গল্প বংশপরম্পরায় আজও শোনা যায় এদিকের গ্রামগুলোয়। জাহাজটার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, আর ঘটনার সময়কাল হিসাব করলে বোঝা যায় যে ওটা অবশ্যই টেক্সাস ছিল।'

'অত বড় একটা জাহাজ, চিন্তা করুন কত ওজন ছিল,' বলল রানা। 'কোথাও আটকা না পড়ে কি করে সাহারার এতটা ভেতরে আসতে পারে?'

'সে সময় খরা ছিল না। মরুভূমির এই অংশে তখন বৃষ্টি হত। এখনকার চেয়ে অনেক গভীর ছিল নাইজার। উয়েদ জারিদ ছিল তার অন্যতম শাখা। সে সময় এখান থেকে ছয়শো মাইল উত্তর-পুবের আহাগার পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল উয়েদ জারিত। ফ্রেঞ্চ এক্সপ্লোরারদের জার্নাল থেকে জানা যায়, বড় বোট চলাচলের মত নাব্যতা উয়েদ জারিতের ছিল। আমার বিশ্বাস, নাইজার থেকে উয়েদ জারিতে ঢুকে পড়ে টেক্সাস, তারপর চরে আটকা পড়ে বর্ষার পর নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়ায়।'

'আঠারোশো ষাট-পঁয়ষট্টি সালের দিকে উত্তর ও সেণ্ট্রাল আমেরিকায় জনবসতিহীন অনেক এলাকা ছিল,' বলল রানা। 'সোনা হারাবার ঝুঁকি নিয়ে অচেনা-অজানা মহাদেশে তারা আসবে কেন?'

'আপনাকেও স্বীকার করতে হবে, টেক্সাসকে খোঁজার জন্যে এক হাজার মাইল পেরিয়ে আফ্রিকায় আসত না ইউনিয়ন নেভি।'

'তা হয়তো আসত না, তবু টেক্সাসের এদিকে আসাটা অবিশ্বাস্য লাগে।'

'আমিও তাই বলি। মরুভূমিতে কেন আসবে তারা? এখানে তো প্রবাসী সরকার গঠন করাও সম্ভব ছিল না।'

'একটা গুজবের কথা শোনা গেছে,' অত্যন্ত শান্ত গলায়, ধীরে ধীরে বললেন বৃদ্ধ। 'রিচমণ্ড ত্যাগ করার সময় টেক্সাসে লিংকন ছিলেন।'

'নিশ্চয়ই আব্রাহাম লিংকন নন?' খুক করে কাশল রানা।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ।

'গল্পের এই অংশটা কার বানানো?'

'একজন কনফেডারেট ক্যাভালরি ক্যাপেটন, নাম নেভাইল ব্রাউন, মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে চার্লসটনের এক ডাক্তারের কাছে জবানবন্দী দিয়ে গেছে। সাউথ ক্যারোলিনায় মারা যায় সে, উনিশশো আট সালে। সে দাবি করে, তার ট্রুপ লিংকনকে বন্দী করে, তারপর তুলে দেয় টেক্সাসে।'

'মৃত্যুপথযাত্রীর প্রলাপ,' বিড়বিড় করল মুরল্যাণ্ড। 'সেক্ষেত্রে জন উইলকিস বুথ-এর গুলি খেয়ে মরার জন্যে কনকর্ড সুপারসনিকে চড়ে সময় মত ফোর্ডস থিয়েটারে পৌঁছুতে হয়েছিল লিংকনকে।'

'পুরো ঘটনাটা আমি জানি না,' স্বীকার করলেন বৃদ্ধ।

'ফ্যানটাসটিক, তবে অস্বস্তিকর,' বলল রানা। 'সিরিয়াসলি নেয়া কঠিন।'

'গল্পের লিংকন অংশটুকু সম্পর্কে আমি কোন নিশ্চয়তা দিতে পারব না,' জেদের সুরে বললেন বণ্ড, 'তবে আমি আমার মি. এমকে বাজি রেখে বলতে পারি যে টেক্সাস, তার আরোহীদের হাড় এবং সোনা এখানকার বালিতে কোথাও লুকিয়ে আছে। আমি এই মরুভূমিতে পাঁচ বছর ঘুরে বেড়াচ্ছি ওটার খোঁজে, এবং ঈশ্বরের কিরে, যদি বেঁচে থাকি ওটাকে আমি খুঁজে বের করবই।'

রানার চোখে সহানুভূতি, খানিকটা বোধহয় শ্রদ্ধাও। এরকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও আত্মনিবেদন সাধারণত দেখা যায় না। মুরল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'যদি কোন বালিয়াড়ির ভেতর লুকিয়ে থাকে, কিভাবে খুঁজে বের করবেন?'

'আমার কাছে একটা মেটাল ডিটেকটর আছে।'

'আমরা আপনার সাফল্য কামনা করি।' আর কি-ই বা বলতে পারে রানা?

চাদরের ওপর কাত হলেন বৃদ্ধ। কি যেন চিন্তা করছেন। নিস্তব্ধতা ভাঙল মুরল্যাণ্ড। 'এবার রওনা হওয়া দরকার।'

বিশ মিনিট পর গাড়ি থামাল ওরা, জেমস বণ্ড আর মি. এমকে বিদায় জানাল। জোর করে ওদেরকে কয়েকটা খাবার ভরা প্যাকেট দিলেন বৃদ্ধ। প্রাচীন রিভারবেডের একটা স্কেচও এঁকে দিলেন, তাতে ট্রেইলের কাছাকাছি একমাত্র কুয়াটা দেখানো হয়েছে, যে ট্রেইল চলে গেছে ফোর্ট ফরোর ওয়েস্ট ফ্যাসিলিটির দিকে।

'কত দূর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'এই একশো দশ মাইলের মত।'

'হুম।'

'আশা করি যা খুঁজছেন আপনারা তা পাবেন।'

হ্যাণ্ডশেক করল রানা, হাসল। 'আমরাও আপনার সাফল্য কামনা করি।' ভয়সিনের সীটে উঠে বসল ও, বৃদ্ধকে ছেড়ে যেতে খারাপ লাগছে।

এয়ার ফ্রান্সের কনকর্ড ওয়াশিংটনের ডালেস এয়ারপোর্টে নামল, থামল কার্গো টার্মিনালের কাছাকাছি একটা সরকারী হ্যাঙ্গারের সামনে। প্লেন থেকে নেমে অপেক্ষারত কালো একটা ফোর্ড সেডানে চড়লেন রেডক্লিফ, ব্যাকপ্যাকটা এখনও এমনভাবে আঁকড়ে ধরে আছেন ওটা যেন তাঁর শরীরেরই একটা অংশ। সরাসরি নুমা হেডকোয়ার্টার নিয়ে আসা হলো তাঁকে। সশস্ত্র গার্ডরা পাঁচতলার কনফারেন্স রুমে পৌঁছে দিল।

লম্বা একটা মেহগনি টেবিলের দু'ধারে বেশ কয়েকজন বসে আছেন, সবার মনোযোগ ড. অজিত রায়ের ওপর। একটা স্ক্রীনের পাশে দাঁড়িয়ে লেকচার দিচ্ছেন তিনি। স্ক্রীনে একটা ম্যাপ ফুটে আছে, পশ্চিম আফ্রিকার পাশে আটলান্টিক সাগর দেখা যাচ্ছে তাতে।

রেডক্লিফ ভিতরে ঢুকতেই নিস্তব্ধ হয় গেল পরিবেশ। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, এগিয়ে এলেন দ্রুত, রেডক্লিফকে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন যেন লিভার ট্র্যান্সপ্লান্টের পর জীবিত দেখছেন আপন ভাইকে। 'থ্যাংক গড, আপনি বেরিয়ে আসতে পেরেছেন! কেমন লাগল প্যারিস ফ্লাইট?'

'কনকর্ডে একা বড় নিঃসঙ্গ লাগছিল।'

'কোন মিলিটারি প্লেন পাওয়া যায়নি। আপনাকে এখানে তাড়াতাড়ি আনার জন্যে কনকর্ড চার্টার না করে উপায় ছিল না।'

'মন্দ নয়, ট্যাক্স দাতারা জানতে না পারলেই হলো।'

'তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছে জানলে অভিযোগ করবে বলে মনে হয় না।' টেবিলে বসা লোকজনদের সঙ্গে রেডক্লিফের পরিচয় করিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। তারপর বললেন, 'তিনজন বাদে বাকি সবাইকে আপনি আগে থেকেই চেনেন।'

ড. অজিত রায় ও ল্যারি কিং এগিয়ে এসে হ্যাণ্ডশেক করল। ড. ক্যাণ্ডি

জোলার, নুমার মেরিন বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর মহিলা, হ্যাণ্ডশেক করার সময় মিষ্টি করে হাসলেন। এরপর এগিয়ে এলেন ড. মাইকেল পাউণ্ড, এনভায়রনমেন্টাল এক্সপার্ট। ডার্ক পিট, নুমার স্যাটেলাইট অ্যানালিস্ট, আগে থেকেই পরিচয় আছে। টমাস কীল, নুমার চীফ ওশেনোগ্রাফার, তাঁকেও চেনেন রেডক্লিফ। অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন তিনি। 'মালি থেকে আমাকে বের করে আনার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, তাই না?'

'সমস্ত কৃতিত্ব লায়লা লাজুলির, তিনিই সেক্রেটারি জেনারেলকে ইউএন ট্যাকটিকাল টীম পাঠাতে রাজি করান।' হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'এবার কাজের কথায় আসা যাক। রেড টাইডের জন্যে দায়ী কম্পাউণ্ড সম্পর্কে বলুন, শোনার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছি আমরা। কি আবিষ্কার করলেন আপনারা?'

টেবিলে বসে ব্যাকপ্যাক খুললেন রেডক্লিফ। পানির নমুনা ভরা গ্লাস ফাইলগুলো একটা কাপড়ের ওপর রাখলেন। প্যাক থেকে এরপর বের করলেন ডাটা ডিস্ক। 'এখানে পানির নমুনা দেখছেন। পরীক্ষা করে কম্পিউটর আর ইন্সট্রুমেন্ট কি রেজাল্ট দিয়েছে তাও রয়েছে এখানে। বলা যায় ভাগ্যগুণেই রেড টাইডের স্টিমুলেটর আইডেনটিফাই করতে পেরেছি আমি। ওটা একটা মোস্ট আনইউজুয়াল অর্গানোমেটালিক কম্পাউণ্ড, সিনথেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড ও কোবাল্ট-এর একটা মিশ্রণ। পানিতে আমি রেডিয়েশনের লক্ষণও দেখতে পেয়েছি, তবে রেড টাইডের সঙ্গে ওটার সরাসরি কোন যোগাযোগ আছে বলে মনে করি না।'

'এত বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও কনটামিনেশনে কারণ আবিষ্কার করতে পারা একটা মিরাকলই বলতে হবে,' মন্তব্য করলেন অজিত রায়।

'ভাগ্য ভাল যে বেনিন নেভির সঙ্গে সংঘর্ষের সময় আমার কোন ইন্সট্রুমেন্ট নষ্ট হয়নি।'

'সিআইএ বলছে, বেনিন নেভির অর্ধেকটা ধ্বংস হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে কয়েকটা হেলিকপ্টারও হারিয়েছে ওরা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'জিজ্ঞেস করা হয়েছে, আমরা কিছু জানি কিনা।'

'কি বলেছেন ওদেরকে আপনি?'

'মিথ্যে কথা। প্লীজ গো অন।'

'বেনিন গানবোটের হামলায় আমাদের ডাটা ট্রান্সমিশন সিস্টেম ধ্বংস হয়ে যায়,' বললেন রেডক্লিফ। 'ফলে আমার রেজাল্ট ল্যারি কিঙের কম্পিউটর নেটওঅর্কে পাঠাতে পারিনি।'

এগিয়ে এসে কম্পিউটর ডিস্কগুলো তুলে নিল ল্যারি কিং। পানির ফাইলগুলো নিলেন অজিত রায়। কিং বলল, 'মীটিঙে আমার কোন ভূমিকা নেই, আমি বরং কাজে বসি গে।'

টমাস কীলকে প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল। 'রেড টাইডের বিস্তার সম্পর্কে লেটেস্ট রিপোর্ট কি?'

বৃদ্ধ ওশেনোগ্রাফার কামানো চিবুকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'গত চার দিনে ছড়ানোর মাত্রা ত্রিশ পার্সেন্ট বেড়েছে। ছড়ানোর এই রেট ভয়াবহ।'

'কিন্তু ড. অজিত রায় যদি কনটামিনেশন নিউট্রালাইজ করার জন্যে একটা কম্পাউণ্ড উদ্ভাবন করতে পারেন, আর আমরা যদি উৎসমুখ বন্ধ করে দিতে পারি, রেড টাইডের এই বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না?'

'যা করার তাড়াতাড়ি করুন,' জবাব দিলেন টমাস কীল। 'যে হারে ছড়াচ্ছে, আর এক মাস পর দেখা যাবে নিজেই ওটা দূষণ প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে, নাইজার থেকে স্টিমুলেশন ফ্লোইং বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও।'

প্রতিবাদ করলেন ক্যাণ্ডি জোলার। 'একমাস বলছেন কেন, এ প্রক্রিয়া শুরু হতে চার মাস লাগার কথা।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন কীল। 'মানুষ যখন অজানা কোন বিষয় নিয়ে সংকটে পড়ে, নিশ্চয়তা দিয়ে কিছুই বলা যায় না।'

রেডক্লিফের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'নদীর কোন জায়গায় কম্পাউণ্ডটা ঢুকছে?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন রেডক্লিফ, মালির বড় করা স্যাটেলাইট ফটোর পাশে চলে এলেন। রঙিন পেন্সিল দিয়ে গাও-এর ওপর নাইজার নদীতে ছোট একটা বৃত্ত আঁকলেন। 'এই জায়গায়। পুরানো একটা রিভারবেড থেকে আসছে, এককালে নাইজারে এসে মিশেছিল।'

কনসোলের একটা বোতামে চাপ দিলেন ডার্ক পিট, বৃত্তের ভেতর এলাকাটা আকারে বড় হয়ে গেল। 'কোন কিছুর কাঠামো দেখা যাচ্ছে না। জনবসতিরও কোন চিহ্ন নেই।'

'তাহলে পচা জিনিসটা আসছে কোত্থেকে?' বিড়বিড় করলেন অজিত রায়।

'মি. রানা আর মুরল্যাণ্ড এখনও সার্চ করছেন,' মনে করিয়ে দিলেন রেডক্লিফ।

'তাঁদের অবস্থা বা অবস্থান সম্পর্কে শেষ খবর পাওয়া গেছে?' প্রশ্ন করলেন কীল।

'স্যাভয় গাসকিলের হাউজবোট থেকে যোগাযোগ করেছিল রানা, তারপর আর কোন খবর নেই,' জবাব দিলেন হ্যামিলটন।

নোটপ্যাড থেকে মুখ তুললেন কীল। 'স্যাভয় গাসকিল? সর্বনাশ, এ কি সেই দুর্গন্ধময় আবর্জনা?'

'আপনি তাঁকে চেনেন?'

মাথা ঝাঁকালেন কীল। 'চার বছর আগে স্পেনের কাছাকাছি ভূমধ্যসাগরে তাঁর একটা জাহাজ ডুবে যায়। জাহাজটায় ক্ষতিকর কেমিকেল বর্জ্য ছিল। আমার ধারণা ওটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না, ইচ্ছে করে ডুবিয়ে দেয়া হয়। এক ঢিলে দুই পাখি মারেন গাসকিল– ক্ষতিকর বর্জ্য খালাস করেন, বীমা কোম্পানির কাছ থেকে টাকাও আদায় করেন। আইনের ফাঁক দেখিয়ে ওই কেমিকেল তিনি পরিষ্কারও করেননি। যদি কোন দিন তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করেন, সঙ্গে সঙ্গে গুণে দেখবেন সবগুলো আঙুল ঠিক আছে কিনা।'

ডার্ক পিটের দিকে তাকালেন রেডক্লিফ। 'আকাশ থেকে স্যাটেলাইট তো আজকাল খবরের কাগজও পড়তে পারে, তাই না? গাও-এর উত্তর মরুতে মি.

রানা আর মুরল্যাণ্ডকে খোঁজা যায় না?'

মাথা নাড়লেন পিট। 'নেগেটিভ। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিতে আমার কনট্যাক্ট বলছে, এই মুহূর্তে তারা চীন আর ভারতের নতুন মিসাইল পরীক্ষার ওপর নজর রাখছে, নজর রাখছে ইউক্রেনের সিভিল ওঅর আর ইরাকের সৈন্য সমাবেশের ওপর। সাহারার দিকে খেয়াল দেয়ার সময় বা সুযোগ তাদের নেই। তবে আমি পেন্টাগনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখতে পারি।'

'প্লীজ।' রেডক্লিফ অনুরোধ করলেন।

ক্যাণ্ডি জোলার নতুন একটা প্রসঙ্গ তুললেন, 'ডিজিজ ইনভেস্টি-গেটরদের টীম সম্পর্ক আমরা কেউ কিছু বলছি না কেন?'

'মালির ওপর দিয়ে গতবার যাবার সময় স্যাটেলাইট তাদের দেখতে পায়নি,' জবাব দিলেন ডার্ক পিট।

'কাদের কথা বলছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ।

'হু-র একদল বিজ্ঞানী,' জোলার ব্যাখ্যা করলেন। 'যাযাবরদের গ্রামে অদ্ভুত একটা রোগ সম্পর্কে তদন্ত চালাতে গেছে ওরা। ওদের প্লেন মালি আর কায়রোর মাঝখানে কোথাও নিখোঁজ হয়েছে।'

'টীমে কি কোন মহিলা আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন রেডক্লিফ। 'একজন বায়োকেমিস্ট?'

'হ্যাঁ, সিলভিয়া ওয়াকম্যান,' জোলার বললেন। 'হাইতির একটা প্রজেক্টে তাঁর সঙ্গে একবার কাজ করেছি আমি।'

'আপনি তাঁকে চেনেন?' রেডক্লিফকে প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'আমি না, মি. রানা। কায়রোয় পরিচয় হয়েছিল।'

'ওরা নিখোঁজ হয়েছে এ-কথা রানার না জানাই ভাল,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এমনিতেই বিপদের মধ্যে আছে সে, দুশ্চিন্তায় ফেলার কোন মানে হয় না।'

মাইকেল পাউণ্ড বললেন, 'প্লেনটা ক্র্যাশ করেছে, এরকম কোন খবর এখনও আমরা পাইনি।'

'ফোর্স ল্যাণ্ডিং করে থাকতে পারেন,' বললেন জোলার। 'আবার, জেনারেল ভিনসেন্ট তাঁদের আটক করলেও আমি আশ্চর্য হব না।'

'মালিতে এর আগে যে-ক'জন হিউম্যান রাইটস অ্যাকটিভিস্ট ঢুকেছে, একজনও জীবিত বেরিয়ে আসতে পারেনি। ভিনসেন্ট আর গাসকিল দেশটাকে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলছে, অথচ সাধারণ মানুষ না খেয়ে মরছে।'

অ্যাডমিরালের চেহারা কঠিন হলো। 'সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। রেড টাইড থামাতে না পারলে মালি, পশ্চিম আফ্রিকা, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র- কোন দেশই থাকবে না। এই মুহূর্তে রেড টাইড ছাড়া আর কিছুর কোন গুরুত্ব নেই।'

অজিত রায় বললেন, 'ডাটা যখন পেয়েছি, একটা সমাধান বের করে ফেলব আমরা।'

'তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!' তাগাদা দিলেন জর্জ হ্যামিলটন। 'ত্রিশ দিনের মধ্যে একটা কিছু করা না গেলে দ্বিতীয়বার কিন্তু সুযোগ পাওয়া যাবে না।'

সূর্য উঠল. সেই সঙ্গে যেন এক ঝটকায় খুলে দেয়া হলো একটা আভনের দরজা। রাতের ঠাণ্ডা ভাব কোন সময় না দিয়েই ফুরিয়ে গেল, পুড়তে শুরু করল ধু-ধু মরু প্রান্তর।

নিচু একটা বালিয়াড়ির ওপরের ঢালে শুয়ে রয়েছে রানা, প্রায় ডুবে আছে বালির ভেতর. আকাশে চিল-শকুনের ওড়া দেখছে। খানিক পর ঘাড় ফিরিয়ে ফোর্ট ফরোর সোলার ডিটক্সিফিকেশনের বিশাল বিস্তৃতির দিকে তাকাল ও। এ যেন একটা অবাস্তব জগৎ। খরা আর উত্তাপে চারদিকের প্রকৃতি অনেক আগেই মারা গেছে. সেই মৃত প্রান্তরে এত বড় একটা নির্মাণ-কাঠামো কল্পনা করা যায় না।

পিছনে শব্দ শুনে তাকাল রানা, দেখল হামাগুড়ি দিয়ে ওর দিকে উঠে আসছে মুরল্যাণ্ড। 'প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছ, দোস্ত?'

'এসো. দেখলে বিশ্বাস হবে না,' বলল রানা।

মাথায় এক মুঠো বালি ছড়িয়ে রানার পাশে চলে এল মুরল্যাণ্ড. বালিয়াড়ির কিনারা ছাড়িয়ে দূরে তাকাল। 'মাই, মাই,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'সত্যি অবিশ্বাস্য! এ তো দেখছি ডিজনিল্যাণ্ডের চেয়েও বড় হবে।'

'আমার হিসেবে বিশ বর্গ কিলোমিটার।'

'ওটা কি?' হাত তুলে লম্বা একটা ট্রেন দেখাল মুরল্যাণ্ড, রেলপথের ওপর দিয়ে চারটে ডিজেল এঞ্জিন চালিয়ে আনছে।

'গাসকিলের টক্সিক ট্রেন,' বলল রানা। 'কারগুলো গুণেছি আমি। একশো বিশটা। সবগুলোয় বিষাক্ত বর্জ্য আছে।'

বিশাল একটা মাঠের দিকে হাত তুলল মুরল্যাণ্ড। মাঠ জুড়ে অসংখ্য নালা আকৃতির বেসিন দেখা যাচ্ছে, ভেতর দিকে বাঁকানো, তলা থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে রোদ— যেন আয়নার একটা সাগর। 'দেখে মনে হচ্ছে সোলার রিফ্লেক্টর।'

'কনসেনট্রেটর.' বলল রানা। 'ওগুলো সোলার রেডিয়েশন কালেক্ট ও কনসেনট্রেট করে, তৈরি হয় প্রচণ্ড হিট। এরপর রেডিয়্যান্ট এনার্জি ফোকাস করা হয় একটা কেমিকেল রিয়্যাক্টরের ভেতর, ক্ষতিকর বর্জ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে ওটা।'

'দিগগজ পণ্ডিত। সূর্যকিরণ সম্পর্কে কবে তুমি বিশেষজ্ঞ হলে?'

'সোলার এনার্জি ইন্সটিটিউটের এঞ্জিনিয়ার ছিল এক মেয়ে. ওদের রিসার্চ ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। এখানে গাসকিল একই টেকনিক ব্যবহার করছেন।'

'আমি মেনে নিতে পারছি না।'

'কি?'

'গোটা সেট-আপ। মরুভূমির মাঝখানে কেন? একটা সমুদ্রের অর্ধেক, তারপর ষোলোশো মাইল মরু পাড়ি দিয়ে ওই আবর্জনা এখানে আনা হয়। বিরাট খরচের ব্যাপার। কেন?'

'হ্যাঁ, কেন? আমিও কৌতূহলী।'

'তোমার এখনও ধারণা নাইজার নদীর দূষণের জন্যে এটা দায়ী?'

'আমরা অন্য কোন উৎস পাইনি।'

'তাহলে বিজ্ঞাপনে ফোর্ট ফয়রো সম্পর্কে যা বলা হয় তা সত্যি নয়?'

'সেটা জানতে হলে ভেতরে ঢুকতে হবে, ববি।'

আঁতকে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো? কিভাবে ভেতরে ঢুকবে? গেটে গিয়ে ভিজিটর'স পাস চাইবে?'

'ট্রেনে লুকিয়ে থাকব,' বলল রানা। 'ভয়সিনের ফুয়েল ট্যাংক প্রায় খালি হয়ে যাওয়ায় ফেরার পথে ট্রেন ছাড়া কোন বিকল্প নেই,' বলল রানা। 'মৌরিতানিয়ায় পৌঁছে...'

গম্ভীর হলো মুরল্যাণ্ড। 'টন টন টক্সিক কেমিকেল বহন করে ওই ট্রেন, তুমি ভেবেছ আমি ওটায় উঠতে রাজি হব?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'কিছু না ছুঁলেই হবে।'

'বাধাগুলোর কথা ভেবেছ?'

'বাধা তৈরিই হয় দূর করার জন্যে।'

'কি ধরনের বাধা দেয়া হবে, তোমার কোন ধারণা আছে?' মুরল্যাণ্ডের গলায় কৃত্রিম ঝাঁঝ। 'ইলেকট্রিফায়েড বেড়া থাকতে পারে। কুকুর নিয়ে গার্ড থাকতে পারে। মেশিনগান বসানো পেট্রল কার থাকতে পারে। নির্ঘাত ফ্লেয়ারও আছে, রাতের আকাশকে দিনের মত আলোকিত করে রাখবে।'

রানা বলল, 'অন্তত এ-সব আমাকে মনে করিয়ে দেয়ার জন্যে তোমার না গেলেই নয়।'

'তুমি ওই বুড়ো জেমস বণ্ডের চেয়েও বড় পাগল। ব্যাটার মাথা খারাপ, বলে কিনা লিংকনকে নিয়ে সাহারার বালিতে একটা জাহাজ পোঁতা আছে।'

'ওদিকে তাকাও,' বলে ছয় কিলোমিটার পুবে একটা কাঠামোর দিকে মুরল্যাণ্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। 'পুরানো দুর্গটা দেখতে পাচ্ছ?' রেললাইন থেকে খুব কাছে দুর্গটা। 'পরিত্যক্ত?'

'হ্যাঁ, পাচ্ছি। ওটাই তো ফ্রেঞ্চ আমলের কীর্তি।'

'ফোর্ট ফরো,' বলল রানা। 'দুর্গের পাঁচিল আর রেললাইনের মাঝখানে মাত্র একশো মিটার দূরত্ব। একটু পরই অন্ধকার হয়ে আসবে, ওটার আড়াল নিয়ে এগোব আমরা, তারপর একটা ট্রেনে উঠে পড়ব।'

'বেশ, উঠলাম, আরও সামনে ওটা কি? সিকিউরিটি স্টেশন মনে হচ্ছে না?'

'ঠিক ধরেছ, তবে আমি লক্ষ করেছি ট্রেন ওখানে থামে না, শুধু গতি কমে যায়।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল মুরল্যাণ্ড, কিছু একটা শুনতে পাওয়ায় টান ধরল তার পেশীতে। আওয়াজটা রানাও শুনতে পেল। দক্ষিণ থেকে আসছে, একটা

হেলিকপ্টার। সরাসরি ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, ফিউজিলাজের পাশে লেখা 'গাসকিল এন্টারপ্রাইজ'।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি,' আটকে রাখা দম ছাড়ল মুরল্যাণ্ড, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বালি ঢাকা ভয়সিনের দিকে। 'আরেকটু নিচে দিয়ে গেলে উড়ে যেত বালি, বেরিয়ে পড়ত গাড়িটা।'

প্রজেক্টের মেইন অফিস বিল্ডিঙের মাথায় ল্যাণ্ড করল হেলিকপ্টার। রোটর থামার পর প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে গেল, প্যাডে নেমে এল এক লোক। আধ কিলোমিটার দূর থেকেও তাকে চিনতে পারল রানা। 'শিকারের খোঁজে বন্ধুবর এখানেও চলে এসেছেন।'

'দুঃখ এই যে পিয়ানোয় বসা সেই সুন্দরী মেয়েটিকে সঙ্গে করে আনেননি।'

'মেয়েটাকে তুমি মাথা থেকে সরাতে পারছ না?'

রানার দিকে আহত দৃষ্টিতে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'কেন সরাব?'

'তুমি তো এমনকি তার নামও জানো না।'

'প্রেমে পড়তে হলে নাম জানতে হবে, এমন কোথাও লেখা আছে?'

উয়েদ জারিত-এর পুরানো রিভারবেড এক জায়গায় এসে বহুধা বিভক্ত হয়ে গেছে, ওই বিভক্তি পিছনে ফেলে সামনে এগোল ওরা। সঙ্গে পানি আছে আর মাত্র দুই লিটার, ভাগাভাগি করে তা-ও খেয়ে ফেলল। আশা, প্রজেক্টের কাছাকাছি যখন রয়েছে তখন পানি ঠিকই পাওয়া যাবে। পরিত্যক্ত দুর্গ থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণে ছোট একটা নালার ভেতর ভয়সিনকে দাঁড় করাল ওরা, রেলপথের পাশে, তারপর রোদ থেকে গা বাঁচানোর জন্যে গাড়ির তলায় আশ্রয় নিল। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড। রানার মন এত অস্থির হয়ে আছে যে ঘুম আসছে না।

মরু প্রান্তরে রাত খুব দ্রুত নেমে এল। চারদিকে অন্ধকার হবার আগে টোয়াইলাইট অল্পক্ষণ স্থায়ী হলো। বিশ্ব চরাচর যেন বোবা ও সম্পূর্ণ স্থির হয়ে আছে। শুকনো মরু-বাতাস থেকে অদৃশ্য হলো তাপ। গোটা আকাশ জুড়ে বসল তারার মেলা, এত উজ্জ্বল যে আলাদা আলাদা রঙের অনেকগুলোই চিনতে পারল রানা– লাল, নীল, সবুজ। মহাকাশের এই শোভা আগে কখনও লক্ষ করেনি ও, এমনকি খোলা সাগর থেকেও না।

গাড়িটা আবার বালিতে ঢেকে তারার আলোয় পথ দেখে এগোল ওরা, এক করে বাঁধা ঝোপ দিয়ে পায়ের দাগ মুছে ফেলছে। ফ্রেঞ্চদের একটা কবরস্থানকে পাশ কাটাল, তারপর দুর্গের পাঁচিল ধরে পৌঁছুল মেইন গেটে। কাঠের প্রকাণ্ড ফটক, এখনও নিরেট, রোদে পুড়ে সাদাটে হয়ে গেছে, সামান্য খোলা দেখতে পেল ওরা। সেটা পার হয়ে ঢুকল প্যারেড গ্রাউণ্ডে।

এখানে স্থানীয় টোয়ারেগদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে ফরাসী সৈন্যরা। দেয়ালগুলো, প্রতিটি ত্রিশ মিটার লম্বা, নিখুঁত একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি করেছে। পাঁচিলের চার মাথায় চারটে ঘর, ডিফেণ্ডাররা ওখানে আড়াল নিয়ে যুদ্ধ করত।

চারদিকে আবর্জনা ছড়িয়ে আছে, দীর্ঘদিন অযত্নে পড়ে থাকার ফল। রেললাইন তৈরি করার সময় এখানে নির্মাণ সামগ্রী রাখা হত, তার কিছু কিছু

এখনও পড়ে আছে– কংক্রিটের রেলরোড টাই, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ডিজেলের ড্রাম, একটা ফর্কলিফট ইত্যাদি।

ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা, সময় যেন কাটতে চাইছে না। রানা সিকিউরিটি স্টেশনের কথা ভাবছে। ওটাকে ফাঁকি দিয়ে শুধু ভেতরে ঢুকলেই হবে না, বেরিয়েও আসতে হবে।

এক সময় অপেক্ষার অবসান হলো। 'আসছে,' বলে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। ডোক্সা ডাইভওয়াচে চোখ বুলাল রানা, বলল, 'এগারোটা বিশ। ভেতরটা দেখা শেষ করে ভোর হবার আগে বেরিয়ে আসার জন্যে যথেষ্ট সময় পাব।'

'যদি ফিরতি ট্রেন পাই।'

'মুসোলিনীর মত ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করেন গাসকিল,' বলল রানা। 'আমি খেয়াল করেছি, তিন ঘণ্টা পর পর ট্রেন আসে। এসো, এগোই। মাথা নিচু করে রাখবে।'

'দুর্গের ফটক পেরিয়ে ছুটল ওরা।

দুর্গ আর রেললাইনের মাঝখানে একটা অচল ট্রাকের বডি কাত হয়ে পড়ে আছে, তীব্র আলো কাছে চলে আসার আগে সেটার আড়ালে গা ঢাকা দিল ওরা। ট্রেন এঞ্জিনের মাথায় রিভলভিং লাইট প্রায় এক কিলোমিটার পর্যন্ত প্রতিটি পাথর ও ঝোপের পাতা আলোকিত করে তুলল। এঞ্জিনটা ওদেরকে পাশ কাটিয়ে গেল, রানা গতি আন্দাজ করল ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল। সিকিউরিটি স্টেশনে পৌঁছুনোর প্রস্তুতি হিসেবে এঞ্জিনিয়াররা কমিয়ে আনল গতি। শেষ কারটা পরিত্যক্ত ট্রাকের কাছাকাছি চলে এসেছে, গতি কমে এখন পনেরো কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। এখন ওটার পাশাপাশি ছুটে লাফ দিয়ে ওপরে ওঠা কোন সমস্যা নয়।

কিন্তু শেষ কারটা আর্মারড, পিছনে বসানো রয়েছে হেভি মেশিনগান, মেশিনগানের পিছনে কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ডকে দেখা গেল।

কেমিকেল ওয়েস্ট প্রজেক্টের ট্রেনে মেশিনগান থাকবে কেন? তা-ও মরুভূমির মাঝখানে? এখানে তো বেদুইন ছাড়া কারও আসার কথা নয়। আর বেদুইন বা যাযাবরদের সম্বল বলতে স্রেফ তলোয়ার।

'কি করা হবে বলো!' তাগাদা দিল মুরল্যাণ্ড।

'দ্বিতীয় কার্গো কন্টেইনারে উঠি চলো,' বলল রানা। 'আর্মারড কারের সামনেরটায়। কেউ যদি লাইনের ওপর চোখ রেখে থাকে, সামনেরটায় উঠতে গেলে ধরা পড়ে যেতে পারি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো মুরল্যাণ্ড। 'গার্ডদের কাছাকাছি কারে ভালভাবে সার্চ করার সম্ভাবনা কম,' বলল সে। 'লেট'স গো!'

আড়াল থেকে বেরিয়ে ট্রেনের সঙ্গে ছুটল ওরা।

হিসেবে ভুল হয়ে গেছে, ট্রেনের গতি ঘণ্টায় বিশ কিলোমিটারের চেয়ে কম নয়। তাছাড়া, লাইনের পাশে কাঁকর থাকায় নিজেদের ছোটার গতি কমে গেল। তারপরও শেষ মুহূর্তে লাফ দিয়ে কার্গো কন্টেইনারের একটা হাতল ধরে ঝুলে পড়ল রানা। ধাপ বেয়ে ওপরে উঠতে যাবে, মুরল্যাণ্ডকে দেখতে না পেয়ে ছ্যাৎ

করে উঠল বুকটা। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল ও, দেখল আর্মারড কারের হাতল ধরে ঝুলছে মুরল্যাণ্ড। সে নড়ছে না, কারণ তার হাত থেকে তিন হাত ওপরে ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন গার্ড, চোখে বিষণ্ণ দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে দূরে। এখন যদি একবার নিচের দিকে তাকায় লোকটা, মুরল্যাণ্ড শেষ। এঞ্জিন থেকে আর মাত্র এক কিলোমিটার দূরে সিকিউরিটি স্টেশন।

আড়মোড়া ভাঙল গার্ড, ঘুরল, ফিরে গেল কারের ভেতর। মাথা তুলল মুরল্যাণ্ড, ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। প্ল্যাটফর্মে থামল না সে, সোজা উঠে পড়ল কারের ছাদে।

'এদিকে চলে এসো,' সচল ট্রেনের কর্কশ আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা।

হামাগুড়ি দিয়ে দুই কারের মাঝখানের ফাঁকটার কিনারায় চলে এল মুরল্যাণ্ড, তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল। বাতাসে বুক ভরল সে, নিচের দিকে একবারও না তাকিয়ে লাফ দিল। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, জানে প্রাণপ্রিয় বন্ধু তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু কোন সাহায্য এল না।

মুরল্যাণ্ডের অ্যাথলেটিক দক্ষতার ওপর আস্থা আছে রানার, এই মুহূর্তে কার্গো কন্টেইনারের মাঝখানে বসানো এয়ার কণ্ডিশনারটা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে ও। কেমিকেল ওয়েস্ট দাহ্য পদার্থ, মরুভূমি পাড়ি দেয়ার সময় আগুন ধরে যেতে পারে, কাজেই ঠাণ্ডা রাখার আয়োজন থাকাটা স্বাভাবিক। হেভি ডিউটি মডেল, ছোট একটা গ্যাস এঞ্জিনের সাহায্যে কমপ্রেসর সচল রাখা হয়, এঞ্জিনের এগজস্টে সাইলেন্সড মাফলার থাকায় শব্দ প্রায় হচ্ছেই না।

সামনে সিকিউরিটি স্টেশন। রানার মাথায় প্রশ্ন জাগল, ট্রেন থামে না কেন? কুকুর ব্যবহার করে? উঁহুঁ, কেমিকেল আর ডিজেলের গন্ধ থাকায় কুকুরের নাকে মানুষের গন্ধ ঢুকবে না।

তাহলে নিশ্চয়ই টিভি ক্যামেরা আছে। আছে স্টেশন বিল্ডিঙের ভেতরে। না থেমে পাশ কাটায়, টিভির স্ক্রীনে চোখ রেখে বসে থাকে গার্ডরা। মুরল্যাণ্ডকে আসতে দেখে ঘাড় ফেরাল রানা। 'স্ক্রু ঘোরাবার মত কিছু আছে?'

'আমার কাছে তুমি স্ক্রুড্রাইভার চাইছ?' হাঁ হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড।

'এয়ার কণ্ডিশনারের সাইড প্যানেলটা খুলতে চাইছি।'

পকেট হাতড়ে একটা কয়েন বের করল মুরল্যাণ্ড। 'হাউজবোটের ওরা বের করে নিয়েছে সব। এটা দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারো।'

সাইড প্যানেলে হাত বুলিয়ে দশটা স্ক্রু পেল রানা। একটার মাথায় কয়েনটা বসিয়ে ঘোরাতে শুরু করল, জানে না সবগুলো খোলার সময় পাবে কি না। তবু খুব দ্রুত হাত চালাচ্ছে ও।

'এয়ার কণ্ডিশনার মেরামত করার আর সময় পেলে না?' কৌতূহল চেপে রাখছে মুরল্যাণ্ড।

'আমাদের মত অবাঞ্ছিত লোকদের জন্যে গার্ডরা সম্ভবত টিভি ক্যামেরা ব্যবহার করছে,' হাত না থামিয়ে বলল রানা। 'প্যানেলটার পিছনে লুকাতে না পারলে ওরা আমাদের ঠিকই দেখে ফেলবে।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল মুরল্যাণ্ড।'

ট্রেনের গতি এখন কম, যেন ক্রল করে এগোচ্ছে। কারগুলো অর্ধেকের মত প্রজেক্টের রেল ইয়ার্ডে ঢুকে গেছে। কপালের ঘাম চোখের পাতায় জমা হচ্ছে, সেদিকে খেয়াল না দিয়ে স্ক্রু খোলায় ব্যস্ত রানা। প্রতি মুহূর্তে টিভি ক্যামেরার কাছাকাছি চলে আসছে ওদের কার। ট্রেনের তিন ভাগের এক ভাগ পাশ কাটাল সিকিউরিটি স্টেশনকে, এখনও তিনটে স্ক্রু খোলা বাকি।

এরপর বাকি থাকল দুটো, সবশেষে একটা। ওদের সামনের কারটা স্টেশনকে পাশ কাটাচ্ছে। মরিয়া হয়ে প্যানেলটা দু'হাতে ধরে টান দিল রানা, শেষ স্ক্রু সহ ছিঁড়ে আনল স্লট থেকে। 'জলদি!' মুরল্যাণ্ডকে তাগাদা দিল ও। 'এয়ার কণ্ডিশনারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ো।'

ভেতরে ঢুকে প্রথমে বসল ওরা, তারপর প্যানেলটা ঢালের মত টেনে আনল নিজেদের সামনে। মুরল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ধারণা এভাবে ওদেরকে বোকা বানানো সম্ভব?'

রানা জবাব দিল না। ওর মনেও ভয় ও সন্দেহ। দু'জনেই অপেক্ষা করছে—হয় ঝন ঝন শব্দে বেল বেজে উঠবে, নয়তো সাইরেনের আওয়াজ শোনা যাবে। কিছুই ঘটল না। কণ্টেইনার কার একটা সাইডিং-এ ঢুকল, থামল লম্বা কংক্রিট লোডিং ডকের পাশে। ডকের মাথার ওপর ডেরিক দেখা গেল, সমান্তরাল ট্রাকের ওপর নড়াচড়া করে।

'উফ!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল মুরল্যাণ্ড।

তার কাঁধে হালকা একটা ঘুসি মারল রানা, তাকাল ট্রেনের পিছন দিকে। 'এখুনি খুশি হবার কোন কারণ ঘটেনি। বন্ধুরা এখনও আমাদের সঙ্গে আছে।'

কণ্টেইনারের ছাদে বসে থাকল ওরা, সামনে প্যানেল। ট্রেন থেকে আলাদা করা হলো গার্ডদের আর্মারড কার, সেটাকে টেনে নিয়ে গেল ছোট একটা ইলেকট্রিক সুইচ এঞ্জিন। চারটে ডিজেল লোকোমোটিভও আলাদা করা হলো, সরে গেল একটা সাইডিং-এ, ওখানে অনেকগুলো খালি কারের দীর্ঘ লাইন দেখা গেল, মৌরিতানিয়া বন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে।

আপাতত নিরাপদ, তবু কিছু ঘটার অপেক্ষায় বসে থাকল ওরা। ডকটা আলোকিত হয়ে আছে আর্ক ল্যাম্পের আলোয়, দেখে মনে হলো আশপাশে লোকজন নেই। লোডিং ডকে অদ্ভুতদর্শন ভেহিকেলের লম্বা একটা লাইন, পেট ফোলা ছারপোকার মত বসে আছে। প্রতিটির চারটে করে হুইল, কিন্তু টায়ার নেই। সমতল কার্গো বেড। মাথার দিকে বাক্সের মত একটা ইউনিট, লাইট আর লেন্স সামনের দিকে তাক করা।

প্যানেলটা আবার জায়গা মত বসাতে যাবে রানা, মাথার ওপর কি যেন একটা দেখতে পেল ও। ভাগ্য ভাল যে পোলের মাথায় ঘুরন্ত টিভি ক্যামেরাটা ওদের দিকে ফেরার আগেই চোখে পড়ল। ডকের চারদিকে চোখ বুলাতে আরও চারটে পোল ও ক্যামেরা দেখতে পেল রানা। 'নড়বে না,' মুরল্যাণ্ডকে সাবধান করল ও। 'চারদিকে ওরা রিমোট সেনসিং ইকুইপমেন্ট বসিয়ে রেখেছে।'

প্যানেলের পিছনে আবার লুকাল ওরা। ভাবছে কি করা যায়। হঠাৎ করে

ডেরিক-এর আলোগুলো জ্বলে উঠল, জ্যান্ত হয়ে উঠল ইলেকট্রিক মোটর। কোন ডেরিকেই অপারেটরের জন্যে কেবিন নেই। প্রজেক্টের কোথাও কমাণ্ড সেণ্টার আছে, সেখান থেকে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে অপারেট করা হয়। ট্রেনের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে এসে মেটাল শ্যাফট নিচু করল ওগুলো, কণ্টেইনারের ওপর দিকের কিনারার স্লটে নিখুঁত ভাবে ঢুকে গেল। একটা হর্ন থেকে শব্দ বেরুল, রেইল কার থেকে কণ্টেইনার তুলে নিল ডেরিক, ডকের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে গেল একটা ফ্ল্যাটবেড ট্রাকে। লিফটিং শ্যাফট স্লট থেকে বেরিয়ে এল, ডেরিকগুলো রওনা হলো পরবর্তী কণ্টেইনার তোলার জন্যে।

ট্রাকের ওপর কণ্টেইনার শক্তভাবে বসার পর যান্ত্রিক একটা শব্দ শুনল ওরা, শব্দটা হতেই নিঃশব্দে চলতে শুরু করল ট্রাক, ডকের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসে লম্বা একটা র‍্যাম্প বেয়ে নামল। র‍্যাম্পটা চলে গেছে খোলা একটা গহ্বরে, তারপর বাঁক নিয়ে ঢুকে পড়েছে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে।

প্যানেলের আড়াল থেকে ওরা বেরুল না। এক সময় কাছাকাছি ডেরিকটা সরাসরি ওদের মাথার ওপর চলে এল, নিচে নামাল শ্যাফট, তুলে নিল ওদের কণ্টেইনার। মুগ্ধ হয়ে গেল রানা, মানুষের সাহায্য ছাড়া গোটা ব্যাপারটা কি সাবলীল ভাবে ঘটছে। ট্রাকের ওপর শক্তভাবে বসল কণ্টেইনার, একটা যান্ত্রিক আওয়াজ হলো, ডক ধরে র‍্যাম্পের দিকে এগোল ট্রাক।

'কে চালাচ্ছে?' ফিসফিস করল মুরল্যাণ্ড।

'রোবোটিক ট্র্যান্সপোর্টার,' জবাব দিল রানা। 'প্রজেক্টের ভেতর কমাণ্ড সেণ্টার আছে, সেখান থেকে কন্ট্রোল করা হচ্ছে।'

দ্রুত হাতে প্যানেলটা আগের জায়গায় বসাল ওরা, মাত্র তিনটে স্ক্রু আঁটল। ক্রল করে চলে এল কণ্টেইনারের মাথার দিকের কিনারায়, চোখ বুলাল সামনের দৃশ্যে। 'স্বীকার করছি,' নরম সুরে বলল মুরল্যাণ্ড, 'এরকম আয়োজন ও দক্ষতা অন্য কোথাও দেখিনি আমি।'

একমত হতে হলো রানাকে, দৃশ্যটা সত্যি তীব্র কৌতূহল না জাগিয়ে পারে না। বাঁকা র‍্যাম্প, এঞ্জিনিয়ারিঙের একটা বিস্ময়, মরুভূমির গভীর থেকে আরও গভীরে নেমে গেছে। এরইমধ্যে, ও আন্দাজ করল, কার্গো নিয়ে ট্র্যান্সপোর্টার সোজা একশো মিটার নিচে নেমে এসেছে, পেরিয়ে যাচ্ছে চারটে আলাদা লেভেল, যেগুলো দৃষ্টিপথের বাইরে মাটির গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্যাসেজগুলোর মাথায় বড় বড় ফ্রেঞ্চ হরফে লেখা সাইনবোর্ড রয়েছে, প্রতীক চিহ্ন সহ। ওপরের লেভেলগুলো বায়োলজিকাল বর্জ্যের জন্যে, আর নিচেরগুলো কেমিকেল বর্জ্যের জন্যে। রানা ভাবল, ওরা যে কণ্টেইনারে রয়েছে, কি আছে এটার ভেতর?

রহস্যটা জটিল লাগছে ওর। বর্জ্য পোড়ায় এমন একটা রিয়্যাক্টর মাটির এত গভীরে থাকবে কেন? ওটা তো সোলার কনসেনট্রেটর-এর কাছাকাছি মাটির ওপর থাকলেই সুবিধে। অবশেষে সিধে হলো র‍্যাম্প, ঢুকল বিশাল এক গুহার ভেতর, আকারে সেটা এত বড় যে শেষ মাথা দেখা যায় না। সিলিং চারতলা সমান উঁচু, পাথুরে টানেলগুলো সাইকেল স্পোকের মত সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। রানার মনে

হলো প্রকৃতির একটা কীর্তিকে খোঁড়াখুঁড়ির বিপুল আয়োজনের মাধ্যমে আরও বিস্তৃত রূপ দেয়া হয়েছে।

যত এগোচ্ছে ততই অবাক হচ্ছে রানা। কোথাও কোন লোকজন নেই, না শ্রমিক, না মেশিন অপারেটর। সীমাহীন গুহার ভেতর প্রতিটি কাজ বা নড়াচড়া নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অটোমেশন-এর দ্বারা। বিদ্যুৎচালিত ট্র্যান্সপোর্টার তার সামনেরটাকে অনুসরণ করছিল, বাঁক নিয়ে ঘুরে গেল একটা সাইড টানেলে। টানেলের মাথায়, সিলিং থেকে একটা কালো কাপড়ের ফালি ঝুলছে, লাল হরফ আঁকা। সামনের দিক থেকে বিভিন্ন শব্দ আর প্রতিধ্বনি ভেসে আছে।

নিঃশব্দে হাত তুলল মুরল্যাণ্ড, রানাকে অনেকগুলো ট্র্যান্সপোর্টার দেখাল, উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে। ওগুলোর কণ্টেইনারের দরজা খোলা, ভেতরে কিছু নেই।

প্রায় এক কিলোমিটার এগোবার পর ট্রাকের গতি কমল, শব্দগুলো আরও জোরাল হয়ে উঠেছে। বাঁক ঘুরে বিশাল এক চেম্বারে ঢুকল ওরা, ভেতরটা মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত হাজার হাজার বাক্স আকৃতির কংক্রিট কণ্টেইনারে বোঝাই, প্রতিটি হলুদ রঙ করা, মার্কিংগুলো কালো।

কার্গো কণ্টেইনার থেকে ব্যারেল নামাচ্ছে একটা রোবোটিক মেশিন, নামিয়ে সাজিয়ে রাখছে অন্যান্য কণ্টেইনারের সাগরে, যেগুলো উঁচু হয়ে সিলিং ছুঁয়েছে।

সাজানো কণ্টেইনারগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে রানা। হঠাৎ ওর মনে হলো, এখানে আসা উচিত হয়নি ওদের। ভুল করে মৃত্যুপুরীতে ঢুকে পড়েছে ওরা। ব্যারেলগুলোর গায়ে রেডিও অ্যাকটিভিটির চিহ্ন আঁকা। ফোর্ট ফরোর গোপন ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে ওর চোখে। ফোর্ট ফরো আসলে পারমাণবিক বর্জ্য পদার্থের আণ্ডারগ্রাউণ্ড ডাম্পিং সেন্টার।

টিভি মনিটরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন স্যাভয় গাসকিল। অবাক বিস্ময়ে আপনমনে মাথা নাড়লেন তিনি, তাঁর এইড জ্যাঁ ককরুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ফিসফিস করলেন, 'লোকগুলো সত্যি অদ্ভুত!'

'সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিয়ে কিভাবে ওরা ভেতরে ঢুকল?' বিস্মিত ককরুও।

কাঁধ ঝাঁকালেন গাসকিল, 'যেভাবে আমার হাউসবোটে উঠেছিল। আশ্চর্য, জেনারেলের ভয়সিন নিয়ে সাহারার অর্ধেকটা পাড়ি দিয়েছে ওরা!'

'আমরা কি স্টোরেজ চেম্বার থেকে ওদের বেরুনোর পথ বন্ধ করে দেব?' জানতে চাইল ককরু। 'রেডিয়েশন সিকনেসে মারা না যাওয়া পর্যন্ত থাকুক এখানে।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলেন গাসকিল, তারপর মাথা নাড়লেন। 'না, সিকিউরিটি গার্ডদের পাঠিয়ে বের করে আনো। ভাল করে ধোলাই দিতে বলো, গায়ে যেন এক বিন্দু কনটামিনেশন না থাকে, তারপর এখানে নিয়ে এসো। মসিয়ে মাসুদ রানার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি। মেরে ফেলার আগে।'

পাঁচ

বিশ মিনিট পর গাসকিলের সিকিউরিটি গার্ড আটক করল ওদের। কন্টেইনারের ছাদ থেকে নিচে নেমে এদিক ওদিক ঘুর ঘুর করছিল দু'জন, এক ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নেমে গার্ডরা ঘিরে ফেলল ওদের। বাধা দেয়ার বা লড়াই করার কোন সুযোগই পাওয়া গেল না। গুনল রানা, গার্ডরা সংখ্যায় দশজন। প্রত্যেকের হাতে মেশিনগান। রাগটা হলো রানার নিজের ওপর। গাসকিলের হাতে প্রথমবার ধরা পড়াটাকে হিসাবের ভুল ধরে নেয়া যায়, দ্বিতীয় বার ধরা পড়াটাকে অবশ্যই বোকামি ও আনাড়িপনা বলতে হবে। দু'জনের কারও চোখেই ভয় নেই, তবে মাথার ওপর হাত তুলল ধীরে ধীরে। নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'না বলে ভেতরে ঢুকে ভুল করেছি, আসলে আমরা বাথরুম খুঁজছিলাম।'

'আপনারা নিশ্চয়ই চান না যে আমরা কোন দুর্ঘটনায় পড়ি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'চুপ! কেউ নড়বেন না!' গার্ডদের অফিসার গর্জে উঠল, পরনে কড়া ভাঁজ করা ইউনিফর্ম, মাথায় ফ্রেঞ্চ আর্মির লাল পিলবক্স ক্যাপ। সুরটা কর্কশ, হুঙ্কার ছাড়ল ইংরেজিতে। 'আমাকে জানানো হয়েছে আপনারা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির মানুষ। পালাবার কথা ভেবে থাকলে ভুলে যান। বন্দীরা বাধা দিলে আমার লোকেরা আহত করার ট্রেনিং পায়নি।'

'ব্যাপারটা কি?' মুরল্যাণ্ডের চেহারায় শিশুসুলভ সরলতা। 'আপনার আচরণ দেখে মনে হচ্ছে আমরা ডায়োক্সিনের খালি ড্রাম চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছি।'

তার কথায় কান না দিয়ে অফিসার বলল, 'নিজেদের পরিচয় দিন।'

'আমি ফার্নান্দো আর আমার বন্ধু…'

'হটওয়াটার,' বাক্যটা পুরো করল মুরল্যাণ্ড।

'তাহলে মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যাণ্ড কি পটল তুলেছে?' হাসছে অফিসার।

'জানেনই যদি, জিজ্ঞেস করার কি মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মসিয়ে গাসকিল আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আপনারা আমাদের সিকিউরিটিকে ফাঁকি দিলেন কিভাবে?'

'ট্রেনে চড়ে চলে এলাম,' সত্যি কথাই বলল রানা। 'এয়ার কণ্ডিশনারের ভেতরে তো আর ক্যামেরার চোখ যায় না।'

'আচ্ছা!' পোর্টেবল রেডিওর সুইচ অন করল অফিসার। 'মসিয়ে গাসকিল?'

'শুনছি,' স্পীকার থেকে গাসকিলের গলা বেরিয়ে এল।

'ক্যাপটেন পল সমবেরি, স্যার, চীফ অব সিকিউরিটি।'

'মসিয়ে রানা আর মসিয়ে মুরল্যাণ্ড?'

'আমার হাতে, মসিয়ে।'

'গুড।'

গাভেয় গাসকিল খুব কমই হাসেন, তবে রানা আর মুরল্যাণ্ডকে তাঁর অফিসে ঢুকতে দেখে তাঁর মুখে চওড়া হাসি ছড়াল। লেদার চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি, হাতের কনুই আর্মরেস্টের ওপর, ভাঁজ করা আঙুল চিবুকের তলায়। একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিলিটির ওপর চোখ বুলাচ্ছে ককরু, তার চোখ দুটো ক্যামেরা অ্যাপারচার-এর মত, মুখের রেখাগুলো গম্ভীর, ঘৃণায় কুঁচকে আছে ঠোঁট।

সাদা কভারঅল পরানো হয়েছে রানা ও মুরল্যাণ্ডকে। ওদের ওপর চোখ বুলিয়ে ক্যাপটেন সমবেরির দিকে তাকালেন গাসকিল। 'ওঁরা কোন ঝামেলা করেননি তো?'

মাথা নাড়ল সমবেরি। 'আচরণে সুবোধ বালক, মসিয়ে। হাসি-ঠাট্টা করছিলেন।'

'খুবই বুদ্ধিমান প্রাণী,' বলে চেয়ার ছেড়ে রানার সামনে এসে দাঁড়ালেন গাসকিল। 'সাহারা পাড়ি দিয়ে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, সেজন্যে আপনাদের আমি অভিনন্দন জানাই, মি. রানা। জেনারেল ভিনসেন্টের ধারণা ছিল আপনারা দু'দিনের বেশি টিকতে পারবেন না।' এখনও হাসছেন তিনি।

'জেনারেল ভিনসেন্টের ভবিষ্যদ্বাণী? এক কানাকাড়িও দাম দিই না আমি।' হাসছে রানাও।

'আপনি আমার হেলিকপ্টার নদীতে ডুবিয়ে দিয়েছেন, মি. রানা। এর জন্যে আপনাকে চড়া মূল্য দিতে হবে।'

'হাউসবোটে আপনি আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেননি, ওটা ছিল তারই প্রতিশোধ।'

'আর জেনারেলের আন্টিক কার?'

'এঞ্জিন অচল হয়ে পড়ায় ওটাকে আমরা পুড়িয়ে ফেলেছি,' মিথ্যে বলল রানা।

'আপনার দেখা যাচ্ছে অন্য লোকের মূল্যবান জিনিস ধ্বংস করার জঘন্য একটা প্রবণতা আছে।'

'ছোটবেলা থেকে। সমস্ত খেলনা ভেঙে ফেলতাম।'

'আমি যে-কোন সময় আরেকটা হেলিকপ্টার কিনতে পারি, কিন্তু জেনারেলের ভয়সিনের রিপ্লেসমেন্ট সম্ভব নয়।' কাঁধ ঝাঁকালেন গাসকিল। 'যে-টুকু সময় পান উপভোগ করে নিন। আপনাদের ভবলীলা সাঙ্গ হবে জেনারেলের টরচার চেম্বারে। এ-সব ব্যাপারে তিনি আবার স্যাডিস্ট, জানেন তো?'

'আমার জন্যে একটা সুখবর,' সকৌতুকে বলল মুরল্যাণ্ড। 'কারণ আমি আবার মর্ষকামী।'

'কি পাবার আশায় অর্ধেক সাহারা পেরিয়ে ফোর্ট ফরোতে এলেন আপনারা?'

'হাউসবোটে আপনার সঙ্গ এত ভাল লেগেছিল, ভাবলাম যাই আরেকবার...'

বিদ্যুৎ খেলে গেল গাসকিলের শরীরে, রানাকে চড় মারতে গেলেন। খপ করে তাঁর হাতটা ধরে ফেলল রানা। 'আপনি কি আমাকে ডুয়েল লড়ার আহ্বান

জানাচ্ছেন?' নিঃশব্দ হাসিতে ফাঁক হয়ে গেছে ওর ঠোঁট।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন গাসকিল । 'না। কথা না বলা পর্যন্ত নাইট্রিক অ্যাসিড ভরা ড্রামে ধীরে ধীরে নামানো হবে আপনাকে।'

মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল রানা, তারপর গাসকিলের দিকে, অবশেষে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে শুনুন। একটা লিক আছে।'

গাসকিলের ভুরুতে ভাঁজ পড়ল।

'খুলে বলুন।'

'আপনার ক্ষতিকর বর্জ্য, যে কেমিকেল আপনার পুড়িয়ে ফেলার কথা, নিচের গ্রাউণ্ড ওয়াটারে মিশছে। মাটির তলা দিয়ে এসব প্রাচীন রিভারবেড ধরে চলে যাচ্ছে নাইজার নদীতে, সেখান থেকে আটলান্টিকে। এর প্রভাবে এক পর্যায়ে সী-লাইফ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রাচীন রিভারবেড অনুসরণ করেছি আমরা, জানতে পেরেছি এক সময় ওটা ফোর্ট ফরোর নিচ দিয়ে প্রবাহিত হত।'

'নাইজার থেকে প্রায় চারশো কিলোমিটার দূরে রয়েছি আমরা,' ককরু বলল। 'মরুভূমির তলা দিয়ে এখানকার পানি অত দূরে যেতে পারে না।'

'আপনি না জেনে কথা বলছেন,' বলল রানা। 'ফোর্ট ফরোই মালিতে একমাত্র প্রজেক্ট যেটা কেমিকেল ওয়েস্ট রিসিভ করে। যে কমপাউণ্ড সমস্যা সৃষ্টির জন্যে দায়ী তা কেবল এখান থেকেই আসতে পারে। সম্ভাব্য উৎস তো এই একটাই। এখন আর আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, কারণ জানি যে পোড়ানোর বদলে বর্জ্য আপনারা লুকিয়ে ফেলছেন।'

গাসকিল অস্বস্তি বোধ করছেন। 'আপনি ঠিক বুঝতে পারেননি, মসিয়ে রানা। ফোর্ট ফরোতে বর্জ্য আমরা অবশ্যই পোড়াই। পরিমাণেও তা বিপুল। পাশের কামরায় আসুন, আপনাকে দেখাই।'

পিছিয়ে গেল ক্যাপটেন সমবেরি, রানা ও মুরল্যাণ্ডকে ইঙ্গিত করল সামনে বাড়ার। হলের ভেতর দিয়ে ওদেরকে একটা কামরায় নিয়ে এলেন গাসকিল। কামরার মাঝখানে একটা থ্রী-ডাইমেনশন্যাল স্কেল রয়েছে, ফোর্ট ফরোর ক্ষতিকর ওয়েস্ট ডিসপোজাল প্রজেক্টের মডেল। লে আউটটা বিশাল, খুঁটিনাটি বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। গাস্কিল বললেন, 'আপনি আমাদের প্রজেক্টের হুবহু প্রতিচ্ছবি দেখছেন এখানে।'

'এবং এখন আপনি আমাদেরকে নিজের সপক্ষে লেকচার শোনাবেন?' মুরল্যাণ্ড বিদ্রূপ করল।

'কবরে নিয়ে যাবেন শুধু আমার এই লেকচারই।' লম্বা একটা আইভরি পয়েন্টার তুলে নিলেন গাসকিল, ডগাটা তাক করলেন প্রজেক্টের দক্ষিণ দিকের মাঠে, যে মাঠে বিশাল আকৃতির চ্যাপ্টা মডিউল রোদের দিকে কাত হয়ে রয়েছে। 'এনার্জিতে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ,' শুরু করলেন তিনি। 'এই ফটোভলটায়িক গ্রিড সিস্টেমের সাহায্যে নিজেরাই আমরা ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করি। ফ্ল্যাট-প্লেট সোলার সেল মডিউল সিলিকন দিয়ে তৈরি, সাজানো হয়েছে চার কিলোমিটার জায়গা জুড়ে। এ সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে, মসিয়ে রানা?'

'এটুকু জানি যে সারা দুনিয়ায় খুব দ্রুত ইকোনমিকাল এনার্জির উৎস হয়ে

উঠছে,' বলল রানা। 'আমি যতটুকু বুঝি, ফটোভলটিয়াক একটা সোলার টেকনোলজি, সূর্যের শক্তিকে সরাসরি ইলেকট্রিকাল এনার্জিতে পরিণত করে।'

'ঠিক তাই,' বললেন গাসকিল। 'সূর্য কিরণ, বিজ্ঞানীরা যেটাকে সোলার ফটোন এনার্জি বলেন, সূর্য থেকে একশো পনেরো মিলিয়ন কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে এই সেলগুলোর সারফেসে আঘাত করলে বিদ্যুতের যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়, এরচেয়ে তিনগুণ বড় প্রজেক্টও সচল রাখার জন্যে তা যথেষ্ট।' এরপর পয়েন্টারটা মডিউল গুচ্ছের পাশের একটা কাঠামোর দিকে তাক করলেন। 'এই বিল্ডিঙে রয়েছে জেনারেটর, শক্তি যোগায় মডিউলার ফিল্ড থেকে পাওয়া কনভার্টেড এনার্জি ও ব্যাটারি সাব-সিস্টেম। ব্যাটারি সাব-সিস্টেমে এনার্জি স্টোর করা হয়– যেদিন রোদ ওঠে না সেদিন এবং রাতের বেলা ব্যবহার করার জন্যে। সাহারায় রোদ অবশ্য রোজই পাই আমরা।'

'চমৎকার,' বলল রানা। 'চমৎকার একটা পাওয়ার সিস্টেম। তবে আপনার সোলার কনসেনট্রেটরগুলো ঠিক মত কাজ করে কি?'

গাসকিলকে চিন্তিত দেখাল, তাকিয়ে আছেন রানার দিকে। ভাবছেন, এই লোক সব সময় তারচেয়ে এক পা এগিয়ে থাকে কি করে? সোলার সেলের পাশের একটা মাঠের দিকে পয়েন্টার তাক করলেন তিনি। এই মাঠে রয়েছে অসংখ্য প্যারাবলিক ট্রফ কালেক্টর, গতকাল রানা ও মুরল্যাণ্ড দেখেছিল। 'কাজ করে,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিলেন তিনি। 'ক্ষতিকর বর্জ্য ধ্বংস করার জন্যে আমি যে সোলার থারমাল টেকনোলজি ব্যবহার করছি, যে-কোন শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্রের তুলনায় সেটা অনেক বেশি উন্নত। এই সুপারকনসেনট্রেটর যে সোলার কনসেনট্রেশন ডেলিভারি দেয় তা আশি হাজার সূর্যের স্বাভাবিক আলোর চেয়েও বেশি। এই হাই ইনটেনসিটি সূর্যকিরণ বা ফোটন এনার্জি এরপর দুটো কোয়ার্টজ রিয়্যাক্টরের একটায় ফোকাস করা হয়।' ছোট একটা বিল্ডিঙের ওপর পয়েন্টার ধরলেন গাসকিল। 'প্রথমটা টক্সিক ওয়েস্টকে নয়শো পঞ্চাশ ডিগ্রী সেলসিয়াসে পুড়িয়ে পরিণত করে অক্ষতিকর কেমিকেলে। দ্বিতীয় রিয়্যাক্টর প্রায় বারোশো ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পুড়িয়ে ফেলে অবশিষ্ট সূক্ষ্ম পদার্থ। এই পদ্ধতিতে মানুষের পরিচিত সমস্ত টক্সিক কেমিকেল সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যায়।'

রানার চোখে সন্দেহ, সেই সঙ্গে শ্রদ্ধাও। 'শুনতে খুব ভালই লাগল,' বলল ও। 'কিন্তু আপনার ডিটক্সিফিকেশন অপারেশন এতই যদি নিখুঁত হবে, লাখ লাখ টন বর্জ্য আণ্ডারগ্রাউণ্ডে লুকাচ্ছেন কেন?'

'মানুষের তৈরি কেমিকেল কম্পাউণ্ডের সংখ্যা কত জানেন, মসিয়ে রানা? সাত মিলিয়নের ওপর। প্রতি হপ্তায় এই সংখ্যা দশ হাজার করে বাড়ছে। এই হারে প্রতি বছর পৃথিবীর বুকে ছড়ানো হচ্ছে দুই মিলিয়ন টন বর্জ্য। তিনশো মিলিয়ন টন শুধু যুক্তরাষ্ট্রেরই। এর দ্বিগুণ ইউরোপ আর রাশিয়ায়। দ্বিগুণেরও বেশি দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা, জাপান, আর চীনে। কিছু তো অবশ্যই পোড়ানো হয়, তবে বেশিরভাগই বেআইনীভাবে মাটির তলায় পুঁতে ফেলা হয় বা পানিতে ঢেলে দেয়া হয়। বর্জ্য পৃথিবীরই উচ্ছিষ্ট, পৃথিবীর বাইরে কোথাও ফেলার উপায় নেই। এখানে, সাহারায়, খেত-খামার বা শহর এলাকা থেকে বহু দূরে,

ইন্টারন্যাশনাল ইনডাস্ট্রির জন্যে আমি একটা নিরাপদ জায়গা বাছাই করেছি, যেখানে তারা তাদের ক্ষতিকর বর্জ্য পাঠাতে পারে।

'এই মুহূর্তে ফোর্ট ফরো বছরে চার হাজার মিলিয়ন টক্সিক ওয়েস্ট ধ্বংস করতে পারে। কিন্তু সব আমি ধ্বংস করতে পারি না, অন্তত যতদিন না গোবি মরুভূমি আর অস্ট্রেলিয়ায় আমার ডিটক্সিফিকেশন প্রজেক্ট কমপ্লিট হচ্ছে। আপনি শুনে খুশি হবেন, যুক্তরাষ্ট্রেও একটা প্রজেক্ট করছি আমি, দু'হপ্তার মধ্যে চালু হবে।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু পোড়াবার দায়িত্ব নিয়ে ক্ষতিকর বর্জ্য আপনি পুঁতে ফেলতে পারেন না। আপনাকে টাকা দেয়া হচ্ছে পোড়াবার জন্যে, পোঁতার জন্যে নয়।'

'উপায় নেই, মসিয়ে রানা। পোড়ানোর চেয়ে পুঁতে ফেলা অনেক সহজ, খরচও কম।'

'নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট সম্পর্কেও এই একই যুক্তি দেবেন আপনি?'

'বর্জ্য বর্জ্যই। নিউক্লিয়ার আর টক্সিকে পার্থক্য হলো, একটায় মানুষ তেজস্ক্রিয়তায় মারা যায়, অপরটায় মারা যায় পয়জনে।'

'দুনিয়া জাহান্নামে যাক, মানুষ জাহান্নামে যাক, পয়সা কামানো নিয়ে কথা, তাই না?'

আবার চিন্তিত মনে হলো গাসকিলকে। 'আপনারা কি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ড. সুনারিল আর তাঁর টীমের সঙ্গে কাজ করছেন?'

'মাথা নাড়ল রানা। 'আমরা একা।'

'তবে টীমটার কথা জানেন।'

'ওদের বায়োকেমিস্টকে চিনি।'

'ড. সিলভিয়া ওয়াকম্যান,' ধীরে ধীরে বললেন গাসকিল, রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছেন।

'হ্যাঁ, আপনার অনুমান নির্ভুল।'

'আমি আরও একটা অনুমান করতে চাই,' বললেন গাসকিল। 'কায়রোর বাইরে ভদ্রমহিলাকে আপনিই বাঁচিয়েছিলেন। জেনারেল ভিনসেন্টের পাঠানো আততায়ীরা ব্যর্থ হয়, সেজন্যে আপনিই দায়ী।'

'কাছাকাছি ছিলাম, ল্যাং মারার স্বভাবটা কাজে লেগে যায়,' বলল রানা।

অপমান সহ্য করতে অভ্যস্ত নন গাসকিল। ককরুর দিকে তাকালেন তিনি। 'আমাদের খোশগল্প শেষ হয়েছে। এদেরকে জেনারেল ভিনসেন্টের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করো।'

'জ্বী, মসিয়ে।' এক গাল হেসে মাথা ঝাঁকাল ককরু।

বোঝা গেল ক্যাপটেন সমবেরি একই ছাঁচে গড়া নয়, ফ্রেঞ্চ আর্মির মর্যাদাবোধ এখনও তার মধ্যে খানিকটা হলেও আছে। সে বলল, 'মাফ করবেন, মসিয়ে গাসকিল। জেনারেল ভিনসেন্টের হাতে একটা পাগলা কুকুর তুলে দিতেও আমার মন সায় দেবে না। এই ভদ্রলোকেরা বেআইনীভাবে ঢুকে পড়েছেন ঠিকই, কিন্তু সেটা এমন কোন গুরুতর অপরাধ নয় যে জেনারেল ভিনসেন্টের হাতে তুলে দিতে হবে। তাঁর পোষা টুয়ারেগরা মানুষের ওপর এমন নির্যাতন চালায়, শুনলে

মরে যেতে ইচ্ছে করে।'

'কথাটায় যুক্তি আছে,' এক সেকেণ্ড চিন্তা করে বললেন গাসকিল। রানার দিকে তাকিয়ে আছেন, হঠাৎ চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তাহলে এক কাজ করা যাক। ওদেরকে তেবেজার সোনার খনিতে পাঠিয়ে দাও, ককরু। মসিয়ে রানা আর ড. সিলভিয়া পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করুন, সেই সঙ্গে খনিতে মাটিও খুঁড়বেন।

'কিন্তু জেনারেল ভিনসেন্ট?' জিজ্ঞেস করল ককরু। 'শাস্তি দেয়ার সুযোগ না পাওয়ায় তাঁর অভিমান হবে না?'

'হবে না,' বললেন গাসকিল। 'কারণ তিনি যখন জানবেন ওরা কোথায় আছেন তখন এ-কথাও জানবেন যে কেউ বেঁচে নেই।'

ডার্ক পিট, নুমার স্যাটেলাইট অ্যানালিস্ট, পেন্টাগন থেকে একটা ফোন পেলেন। 'কে, ডিন মোরান?' জিজ্ঞেস করলেন পিট।

'হ্যাঁ, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কোথায়? তোমাদের জন্যে খারাপ খবর আছে।'

'অ্যাডমিরাল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মীটিঙে বসেছেন,' বললেন পিট। 'কি খারাপ খবর?'

'তোমাদের লোক ফোর্ট ফরোতে ধরা পড়ে গেছে।'

'ওহ্ গড!'

'এখান থেকে আমি পরিষ্কার ছবি দেখতে পেয়েছি। হাতে চেইন বাঁধা, ঘিরে রেখেছে একদল সশস্ত্র গার্ড, একটা হেলিকপ্টারে তোলা হলো।'

পিট জানতে চাইলেন, 'হেলিকপ্টার কোন দিকে গেল জানা গেছে?'

'ওটা আকাশে ওঠার এক মিনিট পরই আমাদের স্যাটেলাইট ওদিক থেকে সরে আসে। তবে ধরে নিতে পারো উত্তর-পুব দিকে গেছে।'

'মরুভূমির আরও ভেতরে?'

'সেরকমই মনে হয়েছে,' ডিন মোরান বললেন। 'পাইলট অবশ্য পরে অন্যদিকেও যেতে পারে, জানার কোন উপায় নেই।'

'অ্যাডমিরালের মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'আমি লেগে আছি,' বললেন মোরান। 'নতুন কিছু জানা গেলে ফোন করব।'

'ধন্যবাদ, মোরান। তোমার একটা উপকার পাওনা হলো।'

তেবেজার কর্মকর্তারা ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে আসেননি। তাক করা রাইফেলের পিছন থেকে চুপচাপ অভ্যর্থনা জানাল দু'জন টুয়ারেগ, বাকি একজন ওদের কব্জি আর গোড়ালিতে লোহার চেইন পরিয়ে দিল। কাফ আর চেইনের অবস্থা দেখে বোঝা গেল আগেও বহু লোককে পরানো হয়েছে ওগুলো।

পিঠে ধাক্কা দিয়ে রানা আর মুরল্যাণ্ডকে একটা রেনোয়া ট্রাকে তোলা হলো। চালাচ্ছে একজন, বাকি দু'জন বসেছে বন্দীদের সঙ্গে পিছনে, অটোমেটিক রাইফেল উরুর ওপর ধরে আছে, মুখ ঢাকা পাগড়ির সরু ফাঁক দিয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখছে।

ল্যাণ্ডিং ফিল্ড থেকে রওনা হলো ট্রাক, সেই সঙ্গে ফিরতি পথে আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। চারদিকে চোখ বুলিয়ে এরইমধ্যে পালাবার উপায় করা যায় কিনা ভাবছে রানা। 'কোন দিকে কোথাও বেড়া বা পাঁচিল দেখা যাচ্ছে না, বালি থেকে মাথা তোলেনি কোন গার্ড হাউস। চারশো কিলোমিটার খোলা মরুভূমি, বন্দীদের হাতে পায়ে শেকল, কাজেই পালিয়ে যাবে কোথায় ওরা! তবু হতাশ হতে রাজি নয় রানা। এই মুহূর্তে হয়তো সুযোগ নেই, তবে আসতে কতক্ষণ।

এ যাকে বলে একেবারে নির্ভেজাল মরুভূমি, চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কিছু জন্মায়নি। নিচু ও ধূসর বালিয়াড়ি স্থির ঢেউয়ের মত সাজানো, মাঝখানে চোখ ধাঁধানো সাদা বালির বিস্তার। শুধু পশ্চিম দিকে উঁচু একটা পাথুরে মালভূমি দেখা গেল। হোক অনুর্বর, গাছপালাবিহীন, না থাক মানুষজন বা মানুষের তৈরি কোন কাঠামো, তারপরও এমন একটা সৌন্দর্য রয়েছে মরুভূমির যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন।

রাস্তা বলতে টায়ারের দাগ, চলে গেছে মালভূমির দিকে। গাড়ি বলতেও ওদের এই ট্রাক, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। খনি থেকে 'ওর' তুলে কিভাবে কোথায় নিয়ে যায় বোঝা যাচ্ছে না। তেবেজার খনি স্রেফ একটা গল্প কিনা সন্দেহ হলো রানার।

বিশ মিনিট পর গতি কমল, তারপর মালভূমিকে চেরা একটা সরু খাদে নামল ট্রাক। খাদের তলায় বালি এত নরম, চাকা ডেবে যাওয়ায় বন্দী ও প্রহরীদের ঠেলতে হলো। এক কিলোমিটার এগোবার পর বাঁক ঘুরে একটা গুহার ভেতর ঢুকল ড্রাইভার। পাথর কেটে দু'পাশে গ্যালারি তৈরি করা হয়েছে।

ট্রাক থামল একটা টানেলের মুখে, ভেতরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। লাফ দিয়ে নিচে নামল গার্ডরা। গান মাজলের নিঃশব্দ ইঙ্গিত পেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে রানা আর মুরল্যাণ্ডকেও নামতে হলো। টানেল ধরে এগোবার নির্দেশ দিল একজন গার্ড।

টানেলটাকে এখন করিডর বলা যেতে পারে, দু'পাশের দেয়াল খাঁজ কাটা, মেঝেতে চকচকে মোজাইক। খিলান আকৃতির কয়েকটা অ্যান্টিক ডোরকে পাশ কাটাল ওরা। করিডরের শেষ মাথার দরজার সামনে থামল গার্ডরা, খুলল সেটা, বন্দীদের ঠেলে দিল ভেতরে।

দামী কার্পেট মোড়া একটা কামরায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা, পাঁচ তারা হোটেলের রিসেপশনের মতই সাজানো। কার্পেটের সঙ্গে মিল রেখে দেয়ালের রঙ নীল, অলঙ্কৃত করা হয়েছে মরুর শ্বাসরুদ্ধকর সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের ফটোগ্রাফ দিয়ে। আলো আসছে লম্বা ক্রোম ল্যাম্প থেকে, কোমল ও ঠাণ্ডা।

কামরার ঠিক মাঝখানে একটা মেহগনি ডেস্ক, ম্যাচ করা সোফা আর চেয়ারগুলো ধূসর লেদারে মোড়া। পিছনের এক কোণে, যেন প্রহরী, দাঁড়িয়ে রয়েছে একজোড়া ব্রোঞ্জ মূর্তি– উদ্ভিন্নযৌবনা এক টুয়ারেগ যুবতী, সঙ্গে গর্বোদ্ধত এক টুয়ারেগ যুবক। কামরার বাতাসে ফুলের ক্ষীণ গন্ধও পেল রানা।

ডেস্কের পিছনে বসে রয়েছে এক মহিলা, বেশ সুন্দরী। তার চোখ নীল, চুল কালো। ফর্সাই সে, তবে ইউরোপিয়ান কিনা বোঝা গেল না। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে

বন্দীদের দিকে তাকাল সে, তারপর চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল। এতক্ষণ বোঝা গেল, মেয়েটা শাড়ি পরে আছে। মিষ্টি হাসি দেখে সন্দেহ হলো, ভারতীয় কিংবা বাংলাদেশী হতে পারে। ব্রোঞ্জ মূর্তির মাঝখানের দরজা খুলে ওদেরকে ইঙ্গিত করল ভেতরে ঢোকার।

বড় একটা চেম্বারে ঢুকল ওরা, অনেক ওপরে গম্বুজ আকৃতির সিলিং। নিরেট পাথর কেটে চারদিকের দেয়ালে বুকশেলফ তৈরি করা হয়েছে। গোটা চেম্বারটাই বিশাল এক স্কাল্পচার, পাথর কুঁদে তৈরি করা। ঘোড়ার খুর আকৃতির একটা ডেস্ক উঁচু হয়েছে মেঝে থেকে, যেন মেঝেরই একটা অংশ ওটা, ওপরে ছড়ানো রয়েছে এঞ্জিনিয়ারিং ডায়াগ্রাম ও কাগজ-পত্র। ডেস্কের দিকে মুখ করে ফেলা দুটো পাথরের বেঞ্চ, ডেস্ক আর ওগুলোর মাঝখানে জটিল নকশা করা একটা কফি টেবিল। শেলফের বই আর ডেস্কের ওপর ছড়ানো জিনিস-পত্র ছাড়া পাথর কেটে তৈরি নয় এমন বস্তু আর মাত্র একটাই দেখা গেল, সেটা হলো মাইন গ্যালারির কাঠের স্কেল মডেল, চেম্বারের একধারে দাঁড় করানো।

দূরবর্তী কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে অস্বাভাবিক লম্বা এক লোক, হাতে খোলা বই, গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। তার পরনে রক্তবর্ণ আলখেল্লা, মাথায় সাদা পাগড়ি। আলখেল্লার নিচে সাপের চামড়া দিয়ে বানানো কাউবয় বুট দেখা যাচ্ছে। রানা ও মুরল্যাণ্ড দাঁড়িয়ে আছে, কয়েক সেকেণ্ড কেটে যাবার পর চোখ তুলে একবার ওদের দিকে তাকাল সে, তারপর আবার মন দিল বইয়ের পৃষ্ঠায়, যেন ভিজিটররা কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

'জায়গাটা আপনাদের সুন্দর,' গলা চড়িয়ে শুরু করল মুরল্যাণ্ড, প্রতিধ্বনি তুলল তার কথা। 'সন্দেহ নেই তৈরি করতে বস্তা ভর্তি টাকা লেগেছে।'

'দু'একটা জানালা থাকলে ভাল হত,' বলল রানা, বুককেসগুলো দেখছে। তারপর সিলিঙের দিকে চোখ তুলল। 'কাচের একটা স্কাইলাইট থাকলে ভেতরে খানিকটা আলো আসত।'

হাতের বইটা শেলফে রেখে দিয়ে সকৌতুকে ওদের দিকে তাকাল এরিক শানিন। 'সারফেসে পৌঁছে রোদ পেতে হলে একশো বিশ মিটার নিরেট পাথর কাটতে হবে। খরচে পোষায় না। শ্রমিকদের দিয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করাই আমি।'

'শ্রমিক মানে কি ক্রীতদাস?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ দুটো সামান্য একটু উঁচু করল শানিন। 'ক্রীতদাস, বন্দী, লেবার–তেবেজায় সব সমান।' ওদের দিকে এগিয়ে এল সে।

ওর চেয়ে দুই মাথা বেশি উঁচু, এমন কারও সামনে আগে কখনও দাঁড়িয়েছে কিনা মনে পড়ল না রানার। লোকটার চোখের দিকে তাকাবার জন্যে মাথাটা পিছন দিকে কাত করতে হলো ওকে। 'কিন্তু আমরা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মসিয়ে গাসকিল আপনাদের বলেননি? জেনারেল ভিনসেন্টের নির্যাতন সহ্য করার চেয়ে এখানকার খনিতে কাজ করতে করতে মরে যাওয়াও ঢের ভাল। ভাগ্যকে আপনাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

'বেতন সম্পর্কে কিছু বলবেন না, মি...?'

'আমি এরিক শানিন, মাইনের অপারেশন দেখাশোনা করি। না, এখানে কোন বেতন দেয়ার নিয়ম নেই। টাকা তো কোন কাজে লাগবে না। খনিতে যে নামে সে কখনও উঠে আসে না।'

'কবর দেয়ার জন্যেও তোলা হয় না?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড, চেহারায় ভয়ের কোন ছাপ নেই।

'যারা পটল তোলে তাদের জন্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে একটা ভল্ট আছে,' জবাব দিল শানিন।

'তুমি দেখছি জেনারেলের মতই একজন খুনী,' বলল রানা। 'কিংবা বোধহয় আরও জঘন্য লোক।'

'আপনাদের সম্পর্কে কিছু কিছু জানি আমি, মি. রানা,' অপমান গায়ে না মেখে বলল শানিন। 'নুমায় অনেক দিন ধরে কাজ করছেন আপনি, আপনার কৃতিত্ব অনেক। খুশি লাগছে এই কথা ভেবে যে আমার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন লোককে এখানে পেয়েছি আমি। সন্দেহ নেই, সময়টা উপভোগ করব আমরা। মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে ডিনার খাবেন আপনি, আপনার আণ্ডারসী এঞ্জিনিয়ারিং অপারেশন সম্পর্কে গল্প শোনাবেন আমাকে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ধন্যবাদ, আমি বরং একটা উটের সঙ্গে খানা খাব, তবু তোমার সঙ্গে নয়।'

'এখন বলছেন বটে, কিন্তু অলিভার সঙ্গে দিন কয়েক কাজ করার পর আপনার সিদ্ধান্ত আপনি বদলাবেন।'

'কে?'

'আমার ওভারশিয়ার, মোরেট অলিভা। আনকমন এক নিষ্ঠুর মহিলা। আপনাদের দু'জনেরই শরীর-স্বাস্থ্য ভাল, কাজেই আমি ধরে নিচ্ছি পরের বার যখন দেখা হবে আপনাদের আমি কেঁচোর মত নরম অবস্থায় পাব।'

'এক মহিলা?' মুরল্যাণ্ডকে কৌতূহলী হতে দেখা গেল।

'এরকম মহিলার সঙ্গে জীবনে আর কখনও আপনাদের দেখা হবে না।'

রানা আর কোন কথা বলল না। মানুষ সাহারার কুখ্যাত সল্ট মাইন সম্পর্কে জানে। অমানবিক পরিশ্রমের কথা উঠলে সারা দুনিয়ায় দৃষ্টান্ত হিসেবে সাহারার সল্ট মাইনের কথা বলা হয়। কিন্তু সোনার একটা খনিতে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ক্রীতদাসদের কাজ করানো হচ্ছে, এ খবর কারও জানা নেই। লাভের অংশ জেনারেল ভিনসেন্টও যে পান তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে অপারেশনের ধরন দেখে মনে হয় এটাও স্যাভয় গাসকিলের কোন প্রজেক্ট। সোলার ডিটক্সিফিকেশন প্রজেক্ট, সোনার খনি...আল্লাই জানে আরও কি কি আছে। এ খুব বড় একটা খেলা, যে খেলায় চারদিকে অক্টোপাসের মত শুঁড় ছড়িয়ে দিয়েছেন গাসকিল আর ভিনসেন্ট। এই খেলা থেকে গাসকিল শুধু টাকা কামান না, অবিশ্বাস্য ক্ষমতাও অর্জন করেন।

নিজের ডেস্কের দিকে এগিয়ে এসে একটা বোতামে চাপ দিল শানিন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল দু'জন গার্ড, দাঁড়াল রানা ও মুরল্যাণ্ডের পিছনে। রানা অনুমতি দিলে কোন দ্বিধা না করেই খেপা ষাঁড়ের মত আক্রমণ করত মুরল্যাণ্ড। কিন্তু রানা

চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল, যেন হাতে-পায়ে শিকল থাকায় বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে ওর।

'কার পক্ষে কাজ করছি জানতে হবে আমাকে,' বলল রানা।

'আপনি জানেন না?' শুকনো গলায় প্রশ্ন করল শানিন।

'গাসকিল আর তাঁর বন্ধু ভিনসেন্ট?'

'তিনজনের মধ্যে দু'জনের নামই দেখছি জানেন। মন্দ নয়।'

'আরেকজন কে?'

'কেন, অবশ্যই আমি,' শান্ত সুরে জবাব দিল শানিন। 'খুবই যুক্তিগ্রাহ্য ও সন্তোষজনক আয়োজন, মি. রানা। গাসকিল এন্টারপ্রাইজ ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই দেয় আর সোনা বেচবার ব্যবস্থা করে। জেনারেল ভিনসেন্ট যোগান দেন লেবার, আর আমি খনি থেকে সোনা তোলার অপারেশন চালাই– ফেয়ার, কারণ সোনার খনির আভাসটা প্রথম আমার চোখেই ধরা পড়ে।'

'মালিয়ানরা কত পার্সেন্ট পায়?'

'কিছুই পায় না,' বলল শানিন। 'কেন পাবে? তাছাড়া, অসভ্য ভিখিরি একটা জাতি সোনা বা টাকা দিয়ে করবেই বা কি? জী-না, মি. রানা, গরীবদের গরীব থাকাই ভাল। দুনিয়ায় গরীব না থাকলে ব্যবসায়ীদের টাকা কামিয়ে মজা কোথায় বলুন!'

'তোমার এই দর্শন সম্পর্কে ওদের জানিয়েছ?'

শানিনের চেহারায় বিরক্তির ভাব। 'আমার আগে যুগ যুগ ধরে বহু লোক জানিয়েছে। ভেবে দেখুন না, সবাই আমরা ধনী হয়ে গেলে দুনিয়াটা একঘেয়ে হয়ে উঠবে না?'

'বছরে এখানে কত লোক মারা যায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কমবেশি হয়। কোন বছর দুইশো, কোন বছর তিনশো। নির্ভর করে মহামারী ও মাইন অ্যাক্সিডেন্টের ওপর। আমি আসলে সত্যি কোন হিসাব রাখি না।'

'অদ্ভুতই বলতে হবে যে লেবাররা ধর্মঘট ডাকে না,' অলস সুরে বলল মুরল্যাণ্ড।

'কাজ নেই তো খাওয়া নেই।' কাঁধ ঝাঁকাল শানিন। 'তাছাড়া, চাবুক দিয়ে রিঙলীডারদের পিঠের চামড়া তোলে অলিভা, কোন দোষ থাক বা না থাক। এ-সব দেখে কার সাহস হবে আন্দোলন করার?'

'কিন্তু কোদাল বা শাবল ধরতে একদমই অভ্যস্ত নই আমি,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'খুব তাড়াতাড়ি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন,' যেন আশ্বাস দিল শানিন। 'যদি না হন, বা গোলমাল পাকান, এক্সট্র্যাকশন সেকশনে পাঠিয়ে দেয়া হবে আপনাকে।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সে। 'পনেরো ঘণ্টার শিফটে কাজ করার এখনও সময় আছে।'

'কাল থেকে আমরা কিছু খাইনি,' রানার বলার সুরে অভিযোগ।

'আজও আপনাদেরকে খেতে দেয়া হবে না।' গার্ডদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল শানিন, তারপর বুকশেলফের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'ওদের নিয়ে যাও।'

পাহারা দিয়ে ওদেরকে বের করে আনল গার্ডরা। রিসেপশনিস্ট ছাড়া আর মাত্র দু'জন লোককে দেখতে পেল ওরা, পরনে কভারঅল, মাথায় মাইনারস' ল্যাম্প সহ হার্ড হ্যাট। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের নিচে কিছু একটা পরীক্ষা করার সময় নিজেদের মধ্যে ফরাসী ভাষায় কথা বলছে। একটা অফিস-টাইপ এলিভেটরে তোলা হলো ওদেরকে, মেঝেতে কার্পেট, অপারেটর একজন টুয়ারেগ। দরজা বন্ধ হতে নিচে নামতে শুরু করল সেটা।

নামছে তো নামছে, এর যেন কোন শেষ নেই। কালো গুহার মুখ স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে পাশ কাটাচ্ছে, ভেতরে গ্যালারি। এক সময় মন্থর হলো এলিভেটরের গতি। রানা আন্দাজ করল, এক কিলোমিটারের মত নিচে নেমেছে ওরা। এলিভেটর থামতে দরজা খুলে গেল। সরু একটা শ্যাফট দেখা গেল, পাথর ভেদ করে চলে গেছে সোজা। গার্ড দু'জন ভারি একটা লোহার দরজার সামনে এনে দাঁড় করাল ওদের। আলখেল্লার ভেতর থেকে একটা চাবি বের করল একজন, তালা খোলা হলো। পিঠে ধাক্কা খেয়ে দরজার কবাটে চাপ দিল রানা ও মুরল্যাণ্ড, কবাট খুলে গেল। ভেতরে আরও চওড়া একটা শ্যাফট, মেঝেতে রেইল দেখা গেল। দরজা বন্ধ করে দিল গার্ড, ভেতরে ওদেরকে রেখে।

রুটিন অনুসারে প্রথমে দরজাটা পরীক্ষা করল মুরল্যাণ্ড। দু'ইঞ্চি পুরু ওটা, ভেতর দিকে কোন হাতল নেই, শুধু কী হোল আছে। 'চাবি চুরি করতে না পারলে এই দরজা আমরা ব্যবহার করতে পারব না,' বলল সে।

'তাহলে বেরুবার অন্য কোন পথ খুঁজে নিতে হবে। ওরা নিশ্চয়ই খাড়া কোন শ্যাফটের ভেতর দিয়ে "ওর" সরায়।'

মুরল্যাণ্ড কিছু বলতে গিয়েও ইলেকট্রিক মোটরের আওয়াজ শুনে থেমে গেল। শ্যাফটের আরেক প্রান্ত থেকে রেইলের ওপর সচল হুইলের শব্দ ভেসে এল। জেনারেটর চালিত ছোট একটা লোকোমটিভ টেনে আনছে ট্রেনটাকে, 'ওর'-কারগুলো খালি। দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। ড্রাইভারের সীট থেকে নিচে নামল এক বিশাল মহিলা, দাঁড়াল ওদের সামনে।

'আমি অলিভা, মাইনের ফোরম্যান। এখানে আমার হুকুমেই সব কাজ চলে। তোমাদেরকেও আমার প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে। পরিষ্কার? উজবুকের মত দাঁড়িয়ে থেকো না, কাজ শুরু করো।'

রানা হাসল। 'নতুন একটা অভিজ্ঞতা, ওজনের সমস্যায় ভুগছে এমন একটা কোলাব্যাঙের নির্দেশ মানতে হবে।'

মুরল্যাণ্ড দেখল বাতাসে শিস কেটে রানাকে আঘাত করতে যাচ্ছে থংটা। অলিভার রিফ্লেক্স অবিশ্বাস্য, এমনকি মুরল্যাণ্ডের রিফ্লেক্সকেও ম্লান করে দিল। রানা সময় মত সরে যেতে পারবে না দেখে তার সামনে চলে এসে হাত দিয়ে আঘাতটা ঠেকাতে চাইল মুরল্যাণ্ড। সেটা টের পেয়ে রানাকে নয়, আঘাত করল অলিভা মুরল্যাণ্ডকে। মুখের পাশে লাগল, চোখে সর্ষে ফুল দেখল সে। টলে উঠল, পিছাতে গিয়ে ধাক্কা খেলো খাড়া একটা বাঁশের গায়ে। 'আজ দেখছি সবার হাতেই মার খাচ্ছি আমি,' কোন রকমে বিড়বিড় করে বলল, দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথা সহ্য করছে।

'সামান্য একটু শিক্ষা, ডিসিপ্লিনের স্বার্থে,' কর্কশ গলায় বলল অলিভা। পরমুহূর্তে আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল তার হাতে, এবারও মুরল্যাণ্ডকে মারল সে। তবে সতর্ক ছিল রানা, মুরল্যাণ্ডকে আড়াল করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, খপ করে ধরে ফেলল অলিভার হাত, থংটাকে থামিয়ে দিল মাঝপথে। ধীরে ধীরে, যেন ইচ্ছাশক্তির পরীক্ষা চলছে, কাঁপতে শুরু করল হাত দুটো, দু'জনেই পেশীর চাপ ক্রমশ বাড়াচ্ছে।

অলিভার গায়ে বাঘিনীর শক্তি। সে কখনও কল্পনাও করেনি কোন পুরুষ তাকে এত শক্ত হাতে ধরতে পারে। বিস্ফারিত চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, তারপর অবিশ্বাস ও ক্রোধ। অপর হাত দিয়ে তার মুঠো থেকে থংটা ছিনিয়ে নিল রানা, ছুঁড়ে নিল ওর কারের ওপর।

'বেজন্মা নিগার, এর জন্যে তোমাকে ভুগতে হবে!' হিসহিস করে উঠল অলিভা।

জবাব দিল মুরল্যাণ্ড, এখনও মুখে হাত বুলাচ্ছে সে। 'ভালবাসা ও ঘৃণা মেশানো সম্পর্কটাই শুনি টেকসই!'

রেগে গিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ও মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাতেই সুযোগটা পেয়ে গেল অলিভা। হাঁটু ভাঁজ করে ওর উরুসন্ধিতে প্রচণ্ড গুঁতো মারল সে। অলিভার হাত ছেড়ে দিল রানা, মেঝেতে হাঁটু গাড়ল, তারপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল, নিঃশব্দ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

অলিভার মুখে বিকৃত হাসি। 'এমন শাস্তি দেব তোমাদের, হাতজোড় করে মৃত্যু কামনা করবে তোমরা।' থংটা কুড়িয়ে নিয়ে খালি ওর-কারের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওঠো!'

পাঁচ মিনিট পর ওর-কার থামল, তারপর পিছিয়ে এসে ঢুকে পড়ল একটা শ্যাফটে। দু'পাশে কাঠের থাম আর বাঁশ দিয়ে অবলম্বন তৈরি করা হয়েছে, আলোও আছে মাথার ওপর, তবে সামনের দিকে খানিক দূর পর অন্ধকার। দেখে মনে হলো শ্যাফটটা নতুন তৈরি করা হয়েছে, ট্রেনের আওয়াজকে ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে লোকজনের আওয়াজ। ওদের ল্যাম্পের আলোয় সামনে একটা বাঁক দেখা গেল। একদল টুয়ারেগ গার্ড গরু-ছাগলের মত শ্রমিকদের খেদাচ্ছে, হাতে চাবুক আর আগ্নেয়াস্ত্র, গলার সুর কর্কশ ও ক্লান্ত। শ্রমিকরা সবাই আফ্রিকান, তবে যাযাবরও আছে। ভগ্নস্বাস্থ্য, রোগাক্রান্ত। যেন কোন হরর ছবির দৃশ্য দেখছে ওরা। লোকগুলো পা টেনে টেনে হাঁটছে। ছেঁড়া শর্টস ছাড়া বেশিরভাগ লোকের পরনে আর কিছু নেই। ঘাম ঝরছে গা থেকে, তার সঙ্গে মিশে আছে পাথরের ধুলো। চোখের চকচকে ভাব আর পাঁজর বেরুনো বুক দেখে বোঝা যায় ঠিকমত খেতে দেয়া হয় না। অনেকেরই সবগুলো আঙুল নেই, সবার শরীরে চাবুকের দাগ। কেটে নেয়া আঙুলে ব্যাণ্ডেজ নেই অনেকের। পরবর্তী বাঁকে দলটা অদৃশ্য হয়ে যেতে তাদের গলার আওয়াজও অস্পষ্ট হয়ে গেল।

ট্রেন থামল পাথরের একটা স্তূপের কাছে। শ্রমিকদের যে দলটা চলে গেল তারাই বিস্ফোরকের সাহায্যে এই পাথর ভেঙেছে। ট্রেন থেকে নিচে নেমে চিৎকার করল অলিভা, 'আউট!' ট্রেন থেকে লোকোমটিভ আলাদা করল সে।

'ক্যামেরার লেন্সে ধুলো ছুঁড়ে দেয়ার বুদ্ধিটায় চমক ছিল, মনিটরে আমাদেরকে ঝাপসা দেখাবে। গার্ডরাও চালাকিটা ধরতে পারেনি। কিন্তু শেষ রক্ষা যদি না হয়...'

'একটা লাভ অন্তত হয়েছে,' বলল রানা। 'আমাদের রিজার্ভ শক্তি অটুট আছে।'

'এমন পিপাসা পেয়েছে, মনে হচ্ছে ধুলো খাই।'

'হ্যাঁ, পানিই এখন শক্তি। আর পালাতে হলে শক্তি দরকার।'

নিজের চেইনের দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড, তারপর তাকাল ওর কারের নিচের রেইলের দিকে। 'রেইলে চেইন রেখে যদি একটা কার চালাই, কাটবে?'

'এ-কথা আমি পাঁচ ঘণ্টা আগে ভেবেছি,' বলল রানা। 'চেইন খুব বেশি মোটা, একটা ফুল-সাইজ ডিজেল লোকোমটিভ ছাড়া এই লিঙ্ক কাটা সম্ভব নয়।'

'হতাশ করলে!'

এক খণ্ড ওর তুলে ওভারহেড লাইটে পরীক্ষা করল রানা। 'আমি জিওলজিস্ট নই, তবে ধরে নেয়া যায় যে এটা গোল্ড-বিয়ারিং কোয়ার্টস। গ্রেন আর ফ্লেক দেখে বোঝা যাচ্ছে, সমৃদ্ধ একটা ভেইন থেকেই এসেছে।'

'গাসকিল তাঁর শেয়ারের টাকায় নোংরা সাম্রাজ্য আরও বড় করবেন।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, টাকা ছড়িয়ে ট্যাক্সের ঝামেলায় পড়তে চাইবেন না। আমার ধারণা, ক্যাশ করেন না, সোনার ইট তৈরি করে জমা করেন কোথাও। যেহেতু তিনি ফরাসী, সোসাইটি আইলাণ্ডের কোন একটায় লুকিয়ে রাখেন বলেই মনে হয়।'

'তাহিতি?'

'কিংবা বোরা বোরা বা মুরিয়া। শুধু গাসকিল আর তাঁর সহকারী ককরু জানে।'

'এখান থেকে বেরুতে পারলে আমরা হয়তো গুপ্তধনের সন্ধানে সাউথ সী...'

হঠাৎ সিধে হলো রানা, আঙুল তুলল ঠোঁটে। 'গার্ড আসছে,' ফিসফিস করে বলল।

কান পেতে শ্যাফটের শেষ মাথার দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। এখনও গার্ডকে দেখা যাচ্ছে না। 'তোমার এই বুদ্ধিটাতেও চমক ছিল– বাঁকের ওদিকটায় নুড়ি পাথর ছড়িয়ে রাখা। দেখতে পাবার আগে ওদের পায়ের আওয়াজ ভেসে আসে।'

'এসো, ব্যস্ততার ভান করি।'

লাফ দিয়ে দাঁড়াল ওরা, ভরা কারে ওর তুলতে শুরু করল। বাঁক ঘুরে এগিয়ে এল একজন গার্ড, এক মিনিট দাঁড়িয়ে ওদের কাজ দেখল। ফেরার জন্যে ঘুরছে লোকটা, পিছন থেকে চিৎকার করল রানা। 'ওহে, বন্ধু, আমাদের কাজ শেষ। দেখছ, সব ভরা। এবার আমাদের ঘুমাবার সময়।'

'খাবার আর পানিও নিয়ে এসো,' তাগাদা দিল মুরল্যাণ্ড।

চোখে সন্দেহ, এগিয়ে এসে কারগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল গার্ড। তারপর তাকাল শ্যাফটের মেঝেতে স্তূপ হয়ে থাকা বাকি ওরের দিকে। পাগড়ির ভেতর মাথা চুলকাল সে। তারপর অটোমেটিক রাইফেল নেড়ে রানা ও মুরল্যাণ্ডকে

শ্যাফটের প্রবেশমুখের দিকে এগোতে বলল।

‘এরা কথা বলে কম,’ মন্তব্য করল মুরল্যাণ্ড।

‘ফলে ঘুষ দিতে যাওয়াটা কঠিন।’

মেইন টানেলে বেরিয়ে এসে সরু রেইল ধরে এগোল ওরা, পথটা ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে এসেছে মালভূমিতে। একটা ওর-ট্রেন দেখা গেল, লোকোমটিভ চালাচ্ছে একজন গার্ড। লাইনের পাশের পাথুরে দেয়ালে সেঁটে থাকল ওরা, ওদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল সেটা। খানিক পর একটা গুহায় ঢুকল ওরা, এখানে অন্যান্য শ্যাফট থেকে উঠে এসেছে আরও অনেক রেললাইন। ভেতরে বিরাট একটা এলিভেটর দেখা গেল, প্রতিবার চারটে করে ওর-কারকে জায়গা দিতে পারে।

‘ওর ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?’ জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

‘ওপরতলায় কোথাও। ওখানে গুঁড়িয়ে পাউডার করা হয়, তারপর উদ্ধার করা হয় সোনা।’

ওদেরকে নিয়ে বিশাল একটা লোহার গেটের সামনে চলে এল গার্ড, কম করেও আধ টন ওজন হবে। গেটের ওপারে আরও দু'জন গার্ড অপেক্ষা করছে। মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এল তারা, গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে টেনে গেট খুলল। এরাও কথা বলে কম, ইঙ্গিতে রানা ও মুরল্যাণ্ডকে ভেতরে ঢুকতে বলল। তাদের মধ্যে একজন ওদেরকে টিনের নোংরা কাপ ধরিয়ে দিল, ভেতরে ঘোলাটে পানি।

নাকের সামনে কাপ তুলে গন্ধ শুঁকল রানা, তারপর গার্ডের দিকে তাকাল। ‘আমি পেচ্ছাব করে দিলে তুমি খাবে?’

কথাগুলো বুঝল না গার্ড, তবে রানার চোখে রাগ আর ঘৃণা ঠিকই চিনতে পারল। ছোঁ দিয়ে কাপটা কেড়ে নিল সে, ধুলোয় ফেলে দিল পানিটুকু, অটোমেটিক রাইফেলের মাজল দিয়ে পিঠে গুঁতো মেরে চেম্বারে ঢোকাল ওকে।

নিজের কাপের পানি মেঝেতে ফেলে দিয়ে মুরল্যাণ্ডও চেম্বারে ঢুকল। ‘ভাবছি, আমাদের কি শিক্ষা হবে না!’

ওদের নতুন আস্তানা ত্রিশ ফুট লম্বা, দশ ফুট চওড়া, চারটে খুদে বালব আলোকিত করে রেখেছে। দু'দিকের দেয়াল ঘেঁষে লম্বা কাঠের বাঙ্ক। চেম্বারে কোন জানালা নেই, মানুষের নিঃশ্বাসে ও গন্ধে টেকা দায়। পয়-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা বলতে পিছন দিকের দেয়াল ঘেঁষে পাথরের মেঝেতে সারি সারি গর্ত। মেঝের মাঝখানে এক জোড়া লম্বা খাওয়ার টেবিল, কাঠের বেঞ্চ সহ। দুর্গন্ধময় ছোট এইটুকু জায়গায়, রানা আন্দাজ করল, তিনশোরও বেশি লোক গাদাগাদি করে আছে।

কাছাকাছি বাঙ্কে এলোমেলো পড়ে থাকা শরীরগুলো দেখে মনে হলো হয় তারা মুমূর্ষু, নয়তো অচেতন। চোখের পাতার নড়াচড়া দেখে বোঝা যায় ওরা এখনও বেঁচে আছে, চেহারায় কোন রকম ভাব নেই। বিশজন লোক হুমড়ি খেয়ে পড়েছে টেবিলের ওপর, একটা পাত্রে হাত ভরে যে যা পারে তুলে দ্রুত মুখে পুরছে। কারও চেহারাতেই উদ্বেগ বা ভয়ের লেশ মাত্র নেই, সাধারণ আবেগ প্রকাশের পর্যায় অনেক আগেই পার হয়ে এসেছে ওরা। হাঁটাচলা যান্ত্রিক পুতুলের মত, আধবোজা চোখ। ক্ষুধায় কাতর, কিন্তু এত দুর্বল যে প্রতিবাদ করার শক্তিও

হারিয়ে ফেলেছে। রানা ও মুরল্যাণ্ডকে দেখল তারা, কোন প্রতিক্রিয়া হলো না।

'উৎসব মুখর পরিবেশ, এ-কথা বলা যাবে না,' চারদিকে চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করল মুরল্যাণ্ড।

'মানবিক নীতিবোধ এখানে কাজ করে না,' বলল রানা। 'যতটুকু ধারণা করেছিলাম অবস্থা দেখছি তারচেয়েও খারাপ।'

'মুখে কিছু দেয়ার ইচ্ছে আছে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

পাত্রের কিনারায় লেগে থাকা খাদ্যকণার দিকে তাকাল রানা। 'আমার খিদে এই মাত্র নষ্ট হয়ে গেল।'

দুর্গন্ধে ভারি বাতাস, ভেন্টিলেশন না থাকায়, অসহ্য গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু হঠাৎ শীত অনুভব করল রানা, যেন একটা আইসবার্গের ভেতর ঢুকছে ও। সেই সঙ্গে ওর রাগ, বিপদের ভয়, ক্লান্তি, ক্ষুৎ-পিপাসা, সব এক নিমেষে উধাও হলো। চেম্বারের ডান দিকের বাঙ্কে একটা নারীমূর্তি ওর সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে। অসুস্থ এক শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করছে সে।

'সিলভিয়া,' নরম সুরে ডাকল রানা।

একে তো পেট ভরে খাবার জোটেনি, তার ওপর জোর করে অমানুষিক পরিশ্রম করানো হচ্ছে, ফলে ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছে সিলভিয়া, তাসত্ত্বেও ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল যখন, তার চোখে দৃঢ়তা ও সাহসের কোন অভাব দেখা গেল না। 'কি চান আপনি?'

'সিলভিয়া, আমি রানা।'

তবু তার মনে পড়ল না। 'আমাকে একা থাকতে দিন,' বিড়বিড় করল সিলভিয়া। 'দেখতে পাচ্ছেন না, বাচ্চা মেয়েটা অসুস্থ!'

সিলভিয়ার একটা হাত ধরল রানা, তার দিকে আরও একটু ঝুঁকল। 'আমার দিকে তাকাও। আমি মাসুদ রানা।'

এবার চিনতে পেরে বিস্ফারিত হয়ে গেল চোখ। 'ওহ্ তুমি! সত্যি তুমি?'

আরও খানিক ঝুঁকে হালকাভাবে তার কপালে ঠোঁট বুলাল রানা, আঙুলের ডগা দিয়ে মুখের ক্ষতগুলো স্পর্শ করল। 'আমি যদি না হই, কেউ আমাদেরকে নিয়ে নিষ্ঠুর কৌতুক করছে।'

রানার কাঁধের কাছে উদয় হলো মুরল্যাণ্ড। 'তোমার কোন বান্ধবী, দোস্ত?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ড. সিলভিয়া ওয়াকম্যান, দা লেডি আই মেট ইন কায়রো।'

'উনি এখানে এলেন কিভাবে?' মুরল্যাণ্ড বিস্মিত।

'কিভাবে, সিলভিয়া?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জেনারেল ভিনসেণ্ট আমাদের প্লেন হাইজ্যাক করেন, তাঁর লোকেরা এখানে পাঠিয়ে দেয় মাইনে কাজ করার জন্যে।'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন করল রানা। 'তোমরা তাঁর কি কোন ক্ষতি করেছ?'

সব কথা ব্যাখ্যা করল সিলভিয়া। ড. সুনারিলের নের্তৃত্বে ওদের ইউএন হেলথ টীম একটা টক্সিন কনটামিন্যাণ্ট প্রায় চিনে ফেলার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, জিনিসটা গোটা মরুভূমি জুড়ে বহু গ্রামের মানুষকে পাইকারীভাবে মেরে ফেলছে।

অ্যানালাইসিস করার জন্যে বায়োলজিকাল স্যাম্পল নিয়ে কায়রোয় ফিরে যাচ্ছিল টীমটা, পথে ওদের প্লেন হাইজ্যাক করা হয়।

মুরল্যাণ্ডের দিকে ফিরল রানা। 'গাসকিল জিজ্ঞেস করছিলেন, আমরা ড. সুনারিলের সঙ্গে কাজ করছি কিনা।'

মাথা ঝাঁকাল মুরল্যাণ্ড। 'মনে আছে। গাসকিল জানতেন, ভিনসেন্ট ওদেরকে এখানে বন্দী করেছেন।'

ভেজা একটা রুমাল দিয়ে বাচ্চাটার কপাল মুছল সিলভিয়া, তারপর হঠাৎ রানার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠল। 'তুমি কেন মালিতে এলে? এখন তো আমাদের সঙ্গে তোমাকেও ওরা মেরে ফেলবে!'

'আমাদের একটা ডেট ছিল, মনে আছে?' সিলভিয়ার দিকে মনোযোগ রানার; খেয়াল করল না ভিড় ঠেলে তিনজন লোক এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলেছে ওকে।

তাদের একজন কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল, 'সিলভিয়া, এঁরা তোমাকে বিরক্ত করছেন?'

ঝট করে ঘুরল রানা। তিনজনকেই ওর রুগ্ন ও দুর্বল মনে হলো, অথচ সিলভিয়াকে রক্ষা করার জন্যে মারমুখো ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'না, না!' তাড়াতাড়ি বলল সিলভিয়া। 'ও রানা, মাসুদ রানা– ওই তো মিশরে আমাকে বাঁচিয়েছিল।'

'মাসুদ রানা? নুমার মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রানা। মুরল্যাণ্ডের দিকে ফিরল ও। 'ও আমার বন্ধু, ববি মুরল্যাণ্ড।'

'বাই গড, আ রিয়েল প্লেজার। আমি মাইকেল সুনারিল, আর আমার বাঁ দিকে ইনি অ্যালান বুন।'

'কায়রোয় থাকতে আপনাদের কথা অনেক শুনেছি সিলভিয়ার মুখে।'

মুরল্যাণ্ড ও রানার মুখের দাগগুলোর ওপর চোখ রেখে নিজের ক্ষতগুলোর ওপর আঙুল বুলালেন সুনারিল। 'দেখা যাচ্ছে সবাই আমরা অলিভাকে খেপিয়ে তুলেছি।'

তৃতীয় ভদ্রলোক এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালেন, হাত বাড়িয়ে বললেন, 'মেজর সিডনি কামার।'

হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'ব্রিটিশ?'

মাথা ঝাঁকালেন সিডনি কামার।

'আপনাকে কেন আনা হয়েছে?'

'সাহারায় এসেছিলাম ট্যুরিস্ট সাফারি নিয়ে। প্লেগ-ক্রেজড গ্রামবাসীরা হামলা চালায় আমাদের ওপর। ভাগ্যগুণে পালিয়ে বাঁচি আমি। মরুভূমি থেকে উদ্ধার করা হয় আমাকে, গাও-এর হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়। মরুভূমিতে কি ঘটেছে কাউকে তা বলার সুযোগ পাইনি, তার আগেই জেনারেল ভিনসেন্ট আমাকে গ্রেফতার করে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'মেজর কামার যে গ্রামটার কথা বলছেন ওখানে আমরা কয়েকটা লাশের প্যাথলজি টেস্ট করেছি,' ব্যাখ্যা করলেন ড. সুনারিল। 'সবাই ওখানে মারা গেছে

রহস্যময় একটা কেমিকেল কমপাউণ্ডের কারণে।'

'সিনথেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড আর কোবাল্ট,' বলল রানা।

সুনারিল আর বুনকে হতভম্ব দেখাল। 'কি, কি বললেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন বুন।

সুনারিল বললেন, 'আপনি জানলেন কিভাবে?'

'আপনারা যখন মরুভূমিতে সার্চ করছেন, আমরা ওই একই সময়ে একই কনটামিন্যান্টের সন্ধানে নাইজার নদীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি।' এরপর সংক্ষেপে রেড টাইড-এর বিস্ফোরণ, নাইজার নদীতে ওদের অভিযান, ডাটা নিয়ে রেডক্লিফের পলায়ন ইত্যাদি বিষয়ে জানাল ও।

বিড়বিড় করলেন সুনারিল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ রেজাল্টটা আপনারা পাঠিয়ে দিতে পেরেছেন।'

'উৎস।' রুদ্ধশ্বাসে বললেন বুন। 'উৎসটা কোথায়?'

জবাব দিল মুরল্যাণ্ড, 'ফোর্ট ফরো।'

'তা কিভাবে সম্ভব!' প্রতিবাদ করলেন বুন। 'ফোর্ট ফরো আর কনটামিনেশন সাইট, দুটোর মাঝখানে কয়েক শো কিলোমিটার দূরত্ব...।'

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়াটার মুভমেণ্ট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'ধরা পড়ার আগে আমি আর মুরল্যাণ্ড প্রজেক্টের ভেতর কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছি। ক্ষতিকর যে বর্জ্য পোড়ানো হয়, পরিমাণে তারচেয়ে দশগুণ বেশি হাই-লেভেল নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট ওরা মাটির তলায় পুঁতে ফেলছে। লিক থেকে মাটির নিচের পানিতে মিশছে জিনিসটা।'

বুন বললেন, 'এই মাত্রার নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট পানির সঙ্গে মিশলে সী লাইফ বলে কিছু থাকবে না! আর সী লাইফ না থাকলে...মাই গড! ওরা তো দেখছি গোটা পৃথিবীকে মেরে ফেলছে!'

'কথা অনেক হয়েছে,' বললেন সুনারিল। 'সময় এখন অতি মূল্যবান। এসো চিন্তা করি এই ভদ্রলোকদের এখান থেকে বের করা যায় কিভাবে।'

'কিন্তু আপনারা?'

'আমাদের যে শারীরিক অবস্থা, মরুভূমি পাড়ি দেয়া সম্ভব নয়। বিশ্রাম ছাড়া দিনের পর দিন রাতের পর রাত খনিতে শ্রম দিতে হয়েছে– না ঘুম, না খাবার, না পানি, কিছুই জোটেনি। বিশ্বাস করুন, আপনাদের মত কেউ আসবেন, এই আশায় অপেক্ষা করছিলাম আমরা। জানতাম যারা আসবে তাদের শারীরিক অবস্থা আমাদের চেয়ে ভাল হবে...।'

সিলভিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'ওকে ফেলে আমি যেতে পারি না।'

'সেক্ষেত্রে থাকুন, বাকি সবার সঙ্গে মারা পড়ুন,' রেগে গিয়ে বললেন বুন। 'কেন বুঝতে পারছেন না, আপনারা পালাতে পারলে আমরাও বাঁচার একটা সুযোগ পাব। আপনারাই এখন আমাদের একমাত্র ভরসা।'

রানার বাহু খামচে ধরল সিলভিয়া। 'তোমাকে যেতে হবে, রানা। এটাই একমাত্র উপায়।'

'এখানে যদি আটচল্লিশ ঘণ্টা থাকেন, অলিভা ছাতু বানিয়ে ফেলবে

আপনাদের,’ বললেন মেজর কামার। ‘আমাদেরকে দেখে বুঝতে পারছেন না? শরীরে কিছু আছে? এখান থেকে বেরিয়ে দু’মাইলও হাঁটতে পারব না, মুখ থুবড়ে পড়ব।’

মেঝের দিকে তাকাল রানা। ‘পানি ছাড়া আমরাই বা যাব কিভাবে?’

‘আমার কথা আপনি মন দিয়ে শুনছেন না,’ বললেন সুনারিল। ‘বললাম না, আপনার মত কেউ আসবে এই আশায় অপেক্ষা করছিলাম আমরা? নিজেদের ভাগ থেকে পানি, কিছু কিছু সাপ্লাই সরিয়ে রেখেছি– তবে একজনের জন্যে। ব্যাপারটা আপনাদের ওপর নির্ভর করে– কে যাবেন, কে থাকবেন।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘আমি আর মুরল্যাণ্ড একসঙ্গে যাব।’

‘দু’জন বেশিদূর যেতে পারবেন না। আর বেশ খানিকটা যেতে না পারলে আপনাদের উদ্ধার পাবার কোন সম্ভাবনা নেই।’

‘কি ধরনের দূরত্বের কথা ভাবছি আমরা?’ জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

‘এখান থেকে চার শো কিলোমিটার পুবে ট্র্যান্স-সাহারান মোটর ট্র্যাক, আলজেরিয়া সীমান্তে,’ জবাব দিলেন মেজর কামার। ‘তিনশো কিলোমিটার পাড়ি দেয়ার পর বাকি একশো কিলোমিটার পেরুনো ভাগ্যের ব্যাপার। তবে ওই ট্র্যাকে পৌছুতে পারলে গাড়ি থামাবার সুযোগ পাবেন।’

রানা সামান্য মাথা কাত করল, যেন মেজরের কথা ভালভাবে শুনতে পায়নি। ‘আমি বোধহয় কিছু মিস করেছি। প্রথম তিন শো কিলোমিটার কিভাবে পেরুব আমরা?’

‘আপনারা সারফেসে উঠে শানিনের একটা ট্রাক চুরি করবেন। ওই ট্রাক আপনাদেরকে তিনশো কিলোমিটার পর্যন্ত পৌছে দেবে।’

‘খুব বেশি আশা করা হয়ে যাচ্ছে, তাই না?’ বলল রানা। ‘কি ঘটবে, যদি দেখি ফুয়েল ট্যাংক খালি?’

মেজর কামার জোর দিয়ে বললেন, ‘মরুভূমিতে কেউ কখনও ফুয়েল ট্যাংক খালি রাখে না।’ হঠাৎ তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ‘যা করার এখুনি করতে হবে। আর এক ঘণ্টার মধ্যে অলিভা আমাদের সবাইকে মাইনে ফেরত পাঠাবে।’

বন্দীশালার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। ‘আপনাদের সবাইকেই কি ওর লোড করতে হয়?’

জবাব দিলেন বুন, ‘পলিটিকাল প্রিজনার, যেমন আমরা, বিস্ফোরণের পর ওর খুঁড়ে লোড করি। ক্রিমিনাল প্রিজনাররা রক ক্রাশার আর রিকভারি লেভেলে কাজ করে। বিস্ফোরণও তারা ঘটায়। বেচারারা কেউই বেশিদিন বাঁচে না। বিস্ফোরণে যদি মারা না যায়, মার্কারি আর সায়ানাইড বিষক্রিয়ায় ধুঁকে ধুঁকে মরে– সোনা পরিশোধন করার জন্যে ওগুলো ব্যবহার করা হয়।’

‘বিদেশী আপনারা ক’জন এখানে?’

‘টীমে আমরা ছ’জন ছিলাম, টিকে আছি পাঁচজন। তাকে খুন করেছে অলিভা, থং দিয়ে মারতে মারতে।’

‘কে তিনি?’

‘ড. কল্পনা দত্ত, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ফিজিওলজিস্টদের অন্যতম,’ বললেন

সুনারিল। 'আমরা আসার পর তাঁকে নিয়ে তিনজন মারা গেছেন। বাকি দু'জন ফ্রেঞ্চ এঞ্জিনিয়ারদের স্ত্রী। এই এঞ্জিনিয়াররা ফোর্ট ফরোতে কাজ করেন। মহিলা দু'জনকে অলিভাই খুন করেছে।' বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বাঙ্কে বসা শিশুটির দিকে তাকালেন তিনি। 'সবচেয়ে বেশি ভুগছে ওদের বাচ্চারা, অথচ আমরা কেউ কিছু করতে পারছি না।'

হাত তুলে একটা বাঙ্কে বসা কয়েকজন মানুষকে দেখালেন মেজর কামার। চারজন মহিলা, আটজন পুরুষ, সবাইকে ফরাসী বলে মনে হলো। মহিলাদের একজন তিন বছর বয়েসী এক ছেলেকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছেন।

রানা যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা বলে উঠল, 'হ্যাঁ, অবশ্যই! প্রজেক্টের নির্মাণ কাজে যে-সব এঞ্জিনিয়ার কাজ করেছে তাদের গাসকিল দেশে ফিরতে দেবেন না!'

'সব মিলিয়ে সতেরো জন এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী এখানে কাজ করছেন, তাদের স্বামীরা কেউ বেঁচে নেই,' বললেন সুনারিল। 'এক থেকে সাত বছরের বাচ্চার সংখ্যা বাইশ।'

'বুঝতে পারছ না, রানা,' নরম সুরে বলল সিলভিয়া, 'যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারো তুমি, যত তাড়াতাড়ি আমাদের জন্যে সাহায্য আনতে পারো, তত বেশি লোককে বাঁচানো সম্ভব?'

রানাকে আর কিছু বলার দরকার ছিল না। সুনারিলের দিকে ঘুরল ও। 'ঠিক আছে, আপনার প্ল্যানটা কি শোনা যাক।'

সাত

এক ঘণ্টা পর কয়েকজন গার্ডকে নিয়ে হাজির হলো অলিভা, দল গঠন করে শ্রমিকদের বিভিন্ন মাইন শ্যাফটে কাজে পাঠানোর আগে মেইন চেম্বারে এনে জড়ো করল সবাইকে। রানার দু'পাশে পাঁচিলের মত আড়াল তৈরি করল মুরল্যাণ্ড ও ড. সুনারিল, আর রানা এক হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করল সিলভিয়াকে। রানাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল অলিভা, থমকে দাঁড়িয়ে কটমট করে তাকাল সিলভিয়ার দিকে। হঠাৎ কুৎসিত হাসি ফুটল তার মুখে, ভাবছে সিলভিয়াকে আঘাত করলে রানাকে খেপিয়ে তোলা যাবে।

থং তুলে আঘাতও করল অলিভা, হঠাৎ দু'জনের মাঝখানে চলে আসায় মুরল্যাণ্ডের বাইসেপে থ্যাচ করে রোমহর্ষক আওয়াজ করল থং।

নগ্ন বাহুতে কামড় বসাল থং, চামড়া ফেটে রক্ত গড়াতে শুরু করল। মুরল্যাণ্ড এক চুল নড়ছে না, ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল অলিভার দিকে, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ব্যস, এইটুকুই তোমার ক্ষমতা?'

স্থির পাথর হয়ে গেল সবাই। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছে, জানে প্রচণ্ড একটা ঝড় আসছে। পাঁচ সেকেণ্ড পেরিয়ে গেল, সময় যেন জমাট বরফ।

এ-ধরনের দৃঢ়তার মুখোমুখি হয়ে অলিভা যেন অসাড় হয়ে গেছে, তারপর ধীরে ধীরে কমলা হয়ে উঠল তার চেহারা, রাগে থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। দুর্বোধ্য, আহত পশুর মত, একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, আবার আঘাত করার জন্যে থং তুলল সে।

'নিজেকে সামলাও!' গেট থেকে ভেসে এল কড়া আদেশ।

বন করে ঘুরল অলিভা। চেম্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে এরিক শানিন, ক্লান্ত ও রুগ্ন শ্রমিকদের মাঝখানে দানবের মত লাগছে তাকে। 'মি. রানা আর মি. মুরল্যাণ্ডকে মারধর কোরো না,' নির্দেশ দিল সে। 'ওদেরকে অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখতে চাই আমি, ওঁরা যাতে ডেথ চেম্বারে লাশগুলো বয়ে নিয়ে যেতে পারেন।'

'তাতে অতিরিক্ত কোন মজা আছে না কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

নরম সুরে হাসল শানিন, কথা বলল অলিভার উদ্দেশে, 'মি. রানার শরীর ভেঙে পড়লে আমি খুব একটা মজা পাব না। কিন্তু যদি ওর মনটা ভাঙতে পারি, আনন্দময় একটা অভিজ্ঞতা হবে সেটা। ওদের দু'জনকে আগামী দশ শিফট হালকা কাজ দাও, অলিভা।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো অলিভা। একটা লোকোমটিভে চড়ল শানিন, ট্রেন নিয়ে ঢুকে পড়ল একটা শ্যাফটে। মাথার ওপর থং ঘোরাল অলিভা। 'বেরোও তোমরা, শুয়োরের পাল, বেরোও!'

হোঁচট খেলো সিলভিয়া, তাকে ধরে শ্রমিকদের ভিড় লক্ষ্য করে এগোল রানা। 'আমি আর মুরল্যাণ্ড নিরাপদে বেরিয়ে যাব,' তার কানে ফিসফিস করল ও। 'তবে আর্মড ফোর্স নিয়ে আমরা না ফেরা পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে তোমাকে। কথা দিচ্ছি, তোমাদের সবাইকে আমরা উদ্ধার করব।'

'এখন বেঁচে থাকার একটা কারণ খুঁজে পাচ্ছি আমি,' নরম গলায় বলল সিলভিয়া। 'আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।'

সিলভিয়ার ঠোঁটে আর ক্ষতের ওপর চুমো খেলো রানা। তারপর সিধে হয়ে পুরুষ বন্ধুদের দিকে ফিরল। ড. সুনারিল, ড. বুন ও মেজর কামার ওদেরকে ঘিরে রেখেছেন। 'টেক কেয়ার অব হার,' বলল ও।

'উই উইল,' আশ্বাস দিয়ে বললেন সুনারিল।

'ভাল হত আমাদের প্ল্যানটা যদি গ্রহণ করতেন আপনারা,' বললেন কামার। ওঁদের প্ল্যানটা ছিল, একটা ওর-কারে লুকিয়ে থাকবে রানা ও মুরল্যাণ্ড, ওই কারই ওদেরকে সারফেসে পৌঁছে দেবে।

মাথা নাড়ল রানা। 'সেক্ষেত্রে ওর-ক্রাশিং লেভেল, তারপর রিফাইন আর রিকভারি এরিয়া পেরুতে হবে। তারচেয়ে ডাইরেক্ট রুট অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ এলিভেটর অনেক নিরাপদ, এঞ্জিনিয়ারিং অফিস হয়ে সরাসরি বেরিয়ে যাব। সশস্ত্র গার্ড মোট ক'জন বলতে পারেন?'

'বিশ থেকে পঁচিশজন,' বললেন কামার। 'তবে এঞ্জিনিয়ারদের অনেকের সঙ্গেও অস্ত্র থাকে। শানিন ছাড়া আরও ধরুন ছ'জন।'

ছেঁড়া শার্টের ভেতর থেকে ছোট একজোড়া ক্যানিস্টার বের করে মুরল্যাণ্ডের

হাতে ধরিয়ে দিলেন বুন। 'অল্প একটু পানি, নিজেদের ভাগ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছি।'

বুনের কাঁধে একটা হাত রেখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মুরল্যাণ্ড। সামান্য দুই লিটার পানি, তবু মরুভূমিতে সোনার চেয়েও বেশি দামী। নিজেদের যারা বঞ্চিত করে এটুকু জমিয়েছে তাদের আত্মত্যাগ উপলব্ধি করে ভাষা হারিয়ে ফেলল সে, কিছুই বলতে পারল না।

'ডিনামাইট?' মেজর কামারকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ওটা আমার কাছে,' বললেন সুনারিল, ডিটোনেশন ক্যাপ সহ এক্সপ্লোসিভের ছোট একটা স্টিক গুঁজে দিলেন রানার হাতে। 'ক্রিমিনালদের একজন তার জুতোয় ভরে পাচার করেছে।'

'ছোট দুটো আইটেম,' বললেন মেজর কামার। 'একটা ফাইল, আপনাদের চেইন কাটার জন্যে। এটা একটা লোকোমটিভের টুলবক্স থেকে চুরি করেছেন বুন। আর শ্যাফটের একটা ডায়াগ্রাম, এতে ক্যামেরাগুলো দেখানো হয়েছে। ওটার পিছনে মরুভূমির একটা রাফ ম্যাপ এঁকে দিয়েছি আমি, ট্র্যান্স-সাহারান ট্র্যাক পর্যন্ত যেতে ওটা আপনাদের সাহায্য করবে।'

'আমি কৃতজ্ঞ,' বলল রানা। ওর চরিত্রের সঙ্গে মানায় না, চোখ দুটো করকর করে উঠল। 'সাহায্য নিয়ে ফিরে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করব আমরা।'

দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে আলিঙ্গন করলেন ড. সুনারিল। 'আমরা আপনাদের জন্যে প্রার্থনা করব, আমাদের আত্মা আপনাদের সঙ্গে থাকবে।'

মেজর কামার শুধু হ্যাণ্ডশেক করলেন। 'মনে থাকবে তো, বালিয়াড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগোবেন, ওগুলোর ওপর দিয়ে যাবেন না। ওপর দিয়ে যেতে চেষ্টা করলে তলিয়ে যেতে পারেন।'

'গুড লাক,' বিড়বিড় করলেন বুন।

একজন গার্ড এগিয়ে এসে রানা আর মুরল্যাণ্ডকে মেশিনগানের ব্যারেল দিয়ে গুঁতো মারল। গ্রাহ্য না করে সিলভিয়ার দিকে ঝুঁকল রানা, শেষ একবার হালকা চুমো খেলো তাকে। 'ভুলো না,' বলল ও। 'আমার সঙ্গে তোমার একটা ডেট আছে।'

'সবচেয়ে খোলামেলা ড্রেসটা পরব আমি।' জোর করে হাসল সিলভিয়া।

আর কিছু বলার সুযোগ হলো না, রানাকে ঠেলে সরিয়ে আনল গার্ড। শ্যাফটের ভেতর ঢুকে হাত নাড়ল রানা, যদিও শ্রমিকদের ভিড়ে সিলভিয়া আর তার বন্ধুরা হারিয়ে গেছে ইতিমধ্যে।

এই একই শ্যাফটে কয়েক ঘণ্টা আগে ওর লোড করেছে ওরা। ওদেরকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল গার্ডরা। খানিক আগে আবার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে, সদ্য ভাঙা পাথরের পাশে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেকটা খালি ওর ট্রেন। 'ক্যামেরার সামনে পাথর তোলার অভিনয় করি আমি,' বলল রানা। 'ওটার রেঞ্জ থেকে দূরে সরে গিয়ে চেইনটা কাটো তুমি।'

ফাইল নিয়ে কাজ শুরু করল মুরল্যাণ্ড। ভাগ্য ভাল যে চেইনের লোহা পুরানো

হয়ে গেছে, তেমন শক্তও নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে নিজেকে মুক্ত করে রানাকে বলল, 'তোমার পালা।'

রানা সময় নিল দশ মিনিট, বলল, 'কাফগুলোর ব্যবস্থা পরে করা যাবে। আপাতত নাচানাচি করতে কোন অসুবিধে নেই।'

দেড় ঘণ্টা পর নুড়ি পাথরের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল গার্ড আসছে। টান দিয়ে টিভি ক্যামেরার পাওয়ার সাপ্লাই কর্ড ছিঁড়ে ফেলল রানা। বাঁকে এবার দু'জন গার্ডকে দেখা গেল। রেললাইনের উল্টোপাশ দিয়ে হেঁটে আসছে তারা, হাতের অস্ত্র ফায়ারিং পজিশনে বাগিয়ে ধরা, পাগড়ির ভেতর চোখে পলক পড়ছে না। ডান দিকের লোকটা এগিয়ে এসে রানার পাঁজরে মাজল দিয়ে গুঁতো মারল, কোন কারণ ছাড়াই। পিছিয়ে এল রানা, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাসল। 'তোমরা এসেছ দেখে খুশি হয়েছি,' বলল ও। 'লোকজন দেখলে ভাল লাগে।' কথাগুলো ঠোঁট থেকে বেরুতেই বাম হাত দিয়ে অস্ত্রটা ধরে মোচড় দিল রানা, একই সঙ্গে ডান হাতে লুকানো পাথরটা সজোরে ঠুকে দিল লোকটার কপালে। তার শিরদাঁড়া পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল, রেললাইনের ওপর দড়াম করে পড়ে গেল শরীরটা।

ধরাশায়ী সঙ্গীর দিকে হাঁ করে দু'সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল দ্বিতীয় গার্ড। স্লেভ লেবাররা আগে কখনও গার্ডদের ওপর হামলা করেনি। ব্যাপারটা শুরু হয়েছে, উপলব্ধি করে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। তারপর মৃত্যুর সম্ভাবনা ভয় পাইয়ে দিল তাকে, গুলি করার জন্যে অস্ত্র তুলল।

গান মাজলের সামনে থেকে স্যাৎ করে সরে গেল রানা, এক পাশে ডাইভ দিল, মরিয়া হয়ে ধরাশায়ী গার্ডের অস্ত্রটা আঁকড়ে ধরল। অস্পষ্টভাবে মুরল্যাণ্ডকে দেখতে পেল ও, দ্বিতীয় গার্ডের গলায় চেইন পরাচ্ছে।

মুরল্যাণ্ডের গায়ে অসুরের শক্তি, গলায় চেইন পরিয়ে নিজের হাত দুটো ক্রমশ উঁচু করল সে, লোকটাকে শূন্যে তুলে ফেলল। গার্ডের জোড়া পা শূন্যে ঝাঁকি খেতে শুরু করল। রেললাইনের ওপর খসে পড়ল মেশিন গান, গলায় কামড়ে বসা চেইনে উঠে গেল হাত।

জ্ঞান হারাতে লোকটাকে নিচে নামিয়ে শুইয়ে দিল মুরল্যাণ্ড, তার সঙ্গীর পাশে। ছোঁ দিয়ে অস্ত্রটা তুলে নিল সে, মাইন শ্যাফটের শেষ মাথার দিকে তাক করল সেটা। 'ওদের কি মেরে ফেলা উচিত নয়?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'তারচেয়ে বড় শাস্তি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে,' বলল ও। 'অলিভা যখন জানবে আমাদেরকে ওরা পালিয়ে যেতে দিয়েছে, লেবারদের সঙ্গে কাজ করতে পাঠাবে ওদের।'

'কিন্তু এখানে ওদেরকে এভাবে ফেলে যেতে পারি না।'

'একটা ওর কারে তোলো, ওপরে পাথর চাপা দাও। দু'ঘণ্টার আগে ওদের জ্ঞান ফিরবে না। ততক্ষণে আমরা মরুভূমিতে বেরিয়ে যেতে পারব বলে আশা করি।'

'যদি না ক্যামেরা মেরামত করতে চলে আসে কেউ।'

অচেতন গার্ডদের কারে তুলছে মুরল্যাণ্ড, মেজর কামারের আঁকা মেইন শাফট ডায়াগ্রামের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা। কাজ সেরে অটোমেটিক

রাইফেল দুটো তুলে পরীক্ষা করল মুরল্যাণ্ড। 'প্লাস্টিক আর ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরি, ফাইভ-ফাইভ-সিক্স মিলিমিটার ফ্রেঞ্চ-ম্যানুফ্যাকচার, জেনারেল মিলিটারি ইস্যু।'

'বাধ্য না হলে কোন গোলাগুলি নয়,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'অন্তত অলিভাকে জানানো চলবে না যে আমরা নিখোঁজ হয়েছি।'

ওঅর্ক শ্যাফট থেকে মেইন টানেলে চলে এল ওরা। মেজর কামারের ম্যাপে ক্যামেরাগুলো চিহ্নিত করা আছে, কাজেই সেগুলোকে এড়ানো কঠিন হলো না। পঞ্চাশ মিনিট পর কারও সামনে না পড়ে আরেকটা গুহায় বেরিয়ে এল ওরা। এরপর রেললাইন অনুসরণ করল, মনে পড়ল এই পথেই এলিভেটর থেকে মেইন শ্যাফটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওদেরকে। একটা চৌমাথায় পৌঁছে থামল, ম্যাপটা আরেকবার দেখে নিল রানা।

'কোনও ধারণা আছে, আমরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'ভেতরে ঢোকার সময় রুটির টুকরো ছড়িয়ে এলে ভাল করতাম,' বিড়বিড় করল রানা। ধুলো লেগে ঝাপসা হয়ে আছে মাথার ওপর বালবটা, সেটার ম্লান আলোয় ম্যাপটা দেখছে ও। হঠাৎ রেললাইনে আওয়াজ হলো, একটা ওর-ট্রেন আসছে এদিকে।

'এখন কি হবে?'

দশ মিটার দূরে পাথরের গায়ে একটা ফাটল দেখাল রানা। 'ওটার ভেতর লুকাব।' ছুটল দু'জন, ফাটলে ঢুকে পড়ল, তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, কেউ যেন সরাসরি নাকে ঘুসি মেরেছে।

ঘুসি নয়, উৎকট একটা দুর্গন্ধ। পরস্পরের দিকে নিঃশব্দে তাকাল ওরা, তারপর খুব সাবধানে সামনে বাড়ল। ফাটলটা যেমন অকৃত্রিম, তেমনি ভেতরের বড় আকারের চেম্বারটাও। ভেতরে গাঢ় অন্ধকার, তবে দেয়াল হাতড়াতে ইলেকট্রিক সুইচ পাওয়া গেল। সেটা অন করতেই প্রকাণ্ড গুহাটা আলোকিত হয়ে উঠল। হাত দিয়ে নাক চেপে রেখেছে ওরা, তাসত্ত্বেও বমি পাচ্ছে।

এক সঙ্গে এত লাশ এভাবে ফেলে রাখা হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। খেতে না দিয়ে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়ে, কিংবা শারীরিক নির্যাতন চালিয়ে যে-সব লেবারকে মেরে ফেলা হয়, এখানে তাদেরকে ফেলে রেখে যায় অলিভা আর শানিন। শুকনো আবহাওয়ায় লাশগুলো খুব সামান্যই পচেছে। মৃতদের প্রতি কোন সম্মান দেখানো হয়নি, হয়নি কোন আনুষ্ঠানিকতা। বাঁশ যেভাবে স্তূপ করে রাখা হয় ঠিক সেভাবে অযত্নে অবহেলায় ফেলে রাখা হয়েছে মরা মানুষগুলোকে। প্রতিটি স্তূপে প্রায় ত্রিশটা করে লাশ। ভৌতিক, করুণ একটা দৃশ্য।

'মাই গড!' ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল মুরল্যাণ্ড। 'এক হাজার বা তারও বেশি হবে, তাই না?'

'কাজ সহজ করে নিয়েছে ওরা,' বলল রানা। 'কবর খোঁড়ার ঝামেলায় যায়নি।' রোমহর্ষক একটা দৃশ্য ভেসে উঠল চোখের সামনে– লাশগুলোর সঙ্গে ড.

সুনারিল, সিলভিয়া সহ বাকি সবাই মরে পড়ে রয়েছে। চোখ বন্ধ করল রানা, তারপরও দৃশ্যটা থেকে গেল।

ফাটলের বাইরে দিয়ে চলে গেল ট্রেন, মাথা ঝাঁকিয়ে ছবিটা চোখ থেকে মুছে ফেলল রানা। যখন কথা বলল, নিজের গলাই চিনতে পারল না। 'চলো, সারফেসে উঠি।'

ফাটল থেকে উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল ওরা। ট্রেনের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেছে। টানেলে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। খানিক দূর হেঁটে এসে একটা সাইড শ্যাফটে ঢুকল ওরা, মেজর কামারের ম্যাপে দেখা যাচ্ছে এঞ্জিনিয়ারদের এলিভেটরে পৌঁছুতে হলে এটাই শর্টকাট পথ। শ্যাফটটা ওদের জন্যে অপ্রত্যাশিত উপহার নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ওরা দেখল মেঝেটা ডাকবোর্ড দিয়ে তৈরি, ভেজা ভেজা। একটা বোর্ড টেনে তুলে ফেলল রানা, দেখা গেল নিচে পানি জমে রয়েছে। 'যত ইচ্ছে খাও, ক্যানিস্টার দুটোয় মুখ লাগিয়ো না।'

'বলতে হবে না।' হাঁটু গেড়ে বসে দু'হাতে পানি তুলে ঢক ঢক করে খেলো মুরল্যাণ্ড। পানি খাওয়া শেষ হয়েছে ওদের, ডাকবোর্ডটা জায়গা মত বসাচ্ছে, প্যাসেজের পিছন দিক থেকে লোকজনের গলা ভেসে এল। একটু পরই শোনা গেল চেইনের আওয়াজ।

'একদল লেবার আসছে,' নিচু গলায় বলল মুরল্যাণ্ড।

তাড়াতাড়ি পা চালাল ওরা, পানি খাবার পর শক্তি ফিরে পেয়েছে। এক মিনিট পর লোহার গেট দেখা গেল, ভেতরে খানিকটা দূরে এলিভেটর। দাঁড়াল ওরা, ডিনামাইটের সরু ফালিটা কী হোলে ঢোকাল মুরল্যাণ্ড, তারপর জোড়া লাগাল ক্যাপটা। পিছিয়ে এল সে, ক্যাপ লক্ষ্য করে একটা পাথর ছুঁড়ল রানা। কিন্তু লাগাতে পারল না।

'আওয়াজ শুনে গার্ডরা ছুটে না এলেই হয়,' বলল রানা, আরেকটা পাথর তুলে নিল।

'ওরা ভাববে ক্রিমিনাল লেবারদের কাজ, স্রেফ বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি।'

এবার রানা লক্ষ্য ভেদ করল, ক্যাপ বিস্ফোরিত হয়ে ফাটিয়ে দিল ডিনামাইট। তালা ভেঙে গেছে, গেট খুলে ছোট্ট প্যাসেজে ঢুকে পড়ল ওরা, সামনেই এলিভেটর। কাছে এসে দরজার পাশের বোতামে চাপ দিল রানা—একবার, দু'বার, তিনবার। থামল, তারপর আবার দু'বার চাপ দিল।

ক্লিক ক্লিক শব্দ হলো, গুঞ্জন শোনা গেল ইলেকট্রিক মোটরের, ওপরের লেভেল থেকে নিচে নেমে আসছে এলিভেটর। আধ মিনিট পর গুঞ্জন থেমে গেল, খুলে গেল এলিভেটররের দরজা। উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল অপারেটর, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে এল সে, রানার হাতের গান বাঁট বাড়ি মারল তার ঘাড়ের পিছনে। অচেতন অপারেটরকে টেনে এলিভেটরে তুলল মুরল্যাণ্ড, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে প্যানেলের সবচেয়ে ওপরের বোতামে চাপ দিল রানা। 'কোথাও থামার দরকার নেই, সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছি।'

খানিক পর থামল এলিভেটর। দরজা খুলে গেল, অথচ কেউ ওদেরকে গুলি করল না। করিডরে একজন এঞ্জিনিয়ার ও একজন গার্ডকে দেখা গেল, পাশাপাশি

হেঁটে যাচ্ছে, নিজেদের মধ্যে আলাপে মগ্ন। মুরল্যাণ্ড ফিসফিস করল, 'কেউ বাধা দিচ্ছে না দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে ওরা যেন চায় আমরা পালিয়ে যাই।'

'ভাগ্যদেবতাকে খুঁচিয়ো না,' সাবধান করল রানা। 'এখনও আমরা বেরুতে পারিনি।'

অপারেটরকে লুকাবে, এমন কোন জায়গা নেই, কাজেই এলিভেটর সহ তাকে সবচেয়ে নিচের লেভেলে পাঠিয়ে দিল রানা। লোক দু'জনকে যেদিকে যেতে দেখেছে সেদিকে পা বাড়াল ওরা। বাঁক ঘোরার পর দেখা গেল খিলান আকৃতির দরজা পেরিয়ে একটা অফিসে ঢুকেছে তারা। দু'পাশে খাঁজ কাটা দেয়াল, চব্বিশ ঘণ্টাও হয়নি এই করিডর ধরে ওদেরকে নিয়ে গিয়েছিল গার্ডরা, তখনকার মত এখনও সম্পূর্ণ নির্জন। বাগিয়ে ধরা অস্ত্র সামনের দিকে তাক করা, একপাশের দেয়াল ঘেঁষে ছুটল ওরা। এক পর্যায়ে টানেলের সঙ্গে মিলিত হলো করিডর, টানেলটা গ্যালারির দিকে চলে গেছে, যেখানে পার্ক করা থাকে ট্রাক বহর।

প্রবেশপথ পাহারা দিচ্ছে একজন গার্ড, বসে আছে টুলে। পিছনে এঞ্জিনিয়ারিং অফিস আর লিভিং কোয়ার্টার, কাজেই সে কোন বিপদের আশঙ্কা করছে না, দুলে দুলে বাইবেল পড়ছে। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে তার ঘাড়ে রদ্দা মারল রানা, টুল থেকে অচেতন লোকটা পড়ে যাবার আগেই তার কোল থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল মেশিনগান। এক সেকেণ্ডও দেরি না করে শরীরটা কাঁধে তুলে নিল মুরল্যাণ্ড, জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

লম্বা আণ্ডারগ্রাউণ্ড গ্যালারির দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, সরু একটা টানেলের মুখে একজোড়া রেনোয়া ট্রাক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাত তুলল সেদিকে, 'ওটার একটায়।'

প্রথম ট্রাকের পিছনে তোলা হলো লোকটাকে। ট্রাকের ক্যাবে উঠে ড্যাশবোর্ড ইন্স্ট্রুমেন্ট পরীক্ষা করল রানা। ইগনিশন কী নেই, অফ ও অন করা হয় সুইচের সাহায্যে। মেজর কামারের কথাই ঠিক, ফুয়েল গজের কাঁটা 'ফুল' লেখা ঘরে স্থির হয়ে আছে। সুইচ অন করে স্টার্টার বাটনে চাপ দিল ও। সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে গেল এঞ্জিন।

'ড্যাশে কি ঘড়ি আছে?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

চোখ বুলিয়ে রানা বলল, 'এটা সস্তা একটা মডেল। কেন?'

'শালারা আমার হাতঘড়ি কেড়ে নিয়েছে। সময়টা বুঝতে পারছি না।'

একটা জুতো খুলে ভেতর থেকে ডোক্সা ডাইভ ওয়াচটা বের করল রানা, সোলের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। কব্জিতে পরল ওটা, তারপর হাতটা মুরল্যাণ্ডের নাকের সামনে ধরল। 'রাত একটা বিশ।'

'নতুন দিনের শুরু। দিনের শুরুতেই যাত্রা শুভ হয়।'

ফার্স্ট গিয়ার দিল রানা, ঢিল দিল ক্লাচে, ট্রাক নিয়ে ঢুকে পড়ল টানেলে, খুব আস্তে ধীরে চালাচ্ছে। তবে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এসে, খাদের তলা দিয়ে জোরে ছোটাল, এতক্ষণে হেডলাইটও জ্বালল। পিছনে ধুলো আর বালির মেঘ তুলল ট্রাক।

খাদের ভেতর দিয়ে খনিতে আসার পথে ঠিক কোথায় ট্রাকের চাকা নরম বালিতে ডেবে গিয়েছিল মনে করার চেষ্টা করল রানা। ট্রাক থেকে নেমে ঠেলা দেয়ার সময় কাছাকাছি ল্যাণ্ডমার্ক লক্ষ্য করেছিল ও। হেডলাইটের আলোয় চিনতে পারল সেগুলো। পাথুরে মালভূমির ভেতর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটছে ট্রাক, পেরিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বালির বিস্তৃতি, গতির কারণে চাকা ডেবে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না।

প্রতিটি মিনিট মূল্যবান। মুক্তির আনন্দে অধীর না হয়ে এক মনে ট্রাক চালাচ্ছে রানা, প্রতি মুহূর্তে গতি আরও বাড়াচ্ছে। ড্যাশবোর্ডে পা ঠেকিয়ে নিজেকে শক্ত করে রেখেছে মুরল্যাণ্ড, দাঁতে দাঁত চেপে আছে সে, কোন অভিযোগ করছে না। হঠাৎ করেই সামনে উন্মোচিত হলো সমতল ভূমি, ফাঁকা মরু। এতক্ষণে আকাশের দিকে মুখ তুলে তারাগুলো দেখল রানা। নর্থ স্টার চিনতে পারল, ট্রাক ঘুরিয়ে নিল পুব দিকে।

কেউ ওদেরকে অনুসরণ করছে কিনা এখুনি বোঝা যাবে না। ওদের সামনে চারশো কিলোমিটার মরু। নির্বিঘ্নে পেরুতে পারলে প্রাণ বাঁচানোর প্রতিযোগিতায় জিতে যাবে ওরা। আর যদি কোন কারণে থামতে হয়, সেটা হবে পরাজয়ের নামান্তর। কাজেই এখন শুধু সামনে ছোটা।

আট

বাকি পাঁচ ঘণ্টা অন্ধকারের ভেতর আকৃতিবিহীন বৈরী মরুভূমির ওপর দিয়ে ট্রাক ছুটিয়ে এল রানা যেন একটা ঘোরের ভেতর, যেখানে সময়ের তেমন কোন তাৎপর্য নেই। এ সত্যিকারের আপোষহীন একটা জগৎ– ভোরে সবকিছু হিম হয়ে যায়, ঝড় উঠলে আকাশ ও চার দিগন্ত ঢাকা পড়ে যায় বালিতে, স্বচ্ছ আবহাওয়ার কারণে সূর্যটাকে অনেক বড় দেখায়,প্রচণ্ড রোদ অগ্নিশিখার মত নেমে এসে গোটা মরুকে একটা চুলোর মত জ্বালিয়ে রাখে।

ওরা প্রায় সমতল একটা এলাকা পেরুচ্ছে, দু'লাখ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে অনুর্বর জনবসতিহীন ধু-ধু মরুপ্রান্তর। মাঝে মধ্যে হঠাৎ এবড়োখেবড়ো পাথরের লম্বা দু'একটা সারি দেখা যায়, কিংবা দু'একটা বালিয়াড়ি, বিরতিহীন পিছিয়ে যেতে থাকে, যেন সদলবলে ফিরে যাচ্ছে ভৌতিক কোন সেনাবাহিনী। এ এমন একটা ঊষর প্রান্তর, যেখানে সামান্য ঝোপ-ঝাড়ও চোখে পড়ে না।

অথচ তারপরও প্রাণের অস্তিত্ব আছে। হেডলাইটের আলোয় পোকা-মাকড় পাখা ঝাপটাচ্ছে। একজোড়া দাঁড়কাক, ট্রাকের আওয়াজ পেয়ে ডানা মেলল শূন্যে, কা-কা রব ছেড়ে উড়ে গেল। চাকার সামনে থেকে ছুটে পালাল কয়েকটা কাঁকড়া বিছা আর সবুজ গিরিগিটি।

রানার বেশিরভাগ মনোযোগ ট্রাক এঞ্জিনের শব্দের দিকে। মাইন থেকে রওনা হবার পর আওয়াজটায় কোন ছন্দপতন ঘটেনি। ফোর-হুইল-ড্রাইভ নিখুঁত কাজ

করছে, নরম বালি পেরিয়ে এসেছে নির্বিঘ্নে। তিন চার বার ওকে বাধ্য হয়ে ঢাল বেয়ে নামতে হয়েছে, ঢালে ছড়ানো ছিল কাঁকর আর নুড়ি পাথর। নামার সময় তেমন অসুবিধে না হলেও, লো গিয়ার দিয়ে ঢালের মাথায় ওঠার সময় মনে হয়েছে যে-কোন সময় পিছলে বা হড়কে যাবে চাকা। দু'একটা ঢাল বা বোল্ডার ছড়ানো জমিনকে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা বলে মনে হয়েছে, অথচ ঠিকই ওদেরকে পার করে এনেছে রেনোয়া।

একটু হাঁটাহাঁটি করলে পা দুটোর ওপর দয়া করা হয়, তবু কোথাও ওরা থামল না। এমনকি চলার মধ্যেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিল, ব্রেক করল না।

'কতদূর এলাম?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

অডোমিটারের দিকে তাকিয়ে রানা জবাব দিল, 'একশো বিশ কিলোমিটার।'

'পথ ভুল করেছ, নাকি একই জায়গায় চক্কর দিচ্ছ বারবার? এতক্ষণে তো দুশো কিলোমিটার পেরিয়ে আসার কথা। আমরা কি হারিয়ে গেছি?'

'কোর্স ঠিক আছে,' বলল রানা, আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেনি। 'সোজা পথ ধরে এগোলে দুশো কিলোমিটারই পেরুতাম। ভুলে গেলে, দুটো খাদ আর দশ বারোটা বালিয়াড়ি ঘুরে আসতে হয়েছে?'

'একটু পরই ভোর হয়ে যাবে, তারা দেখে পথ চেনার উপায় থাকবে না। তখন কি হবে?'

'তারার দরকার নেই। ডু-ইট-ইওরসেলফ পদ্ধতিতে আমি একটা কম্পাস বানিয়ে নেব, আর্মিতে থাকতে শিখেছিলাম।'

'শুনে খুশি হলাম।' হাই তুলল মুরল্যাণ্ড। 'ফুয়েল গজ কি বলে?'

'অর্ধেকের কিছু কম খালি হয়েছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। ট্রাকের মেঝেতে এখনও শুয়ে আছে গার্ড, হাত ও পা শক্ত করে বাঁধা। 'লোকটাকে খুব সুখী দেখাচ্ছে।'

'এখনও জানে না, তবে ওকে আমরা ফেউ তাড়াবার কাজে লাগাব।'

'মগজটার বিশ্রাম নেই, না? সারাক্ষণ বুদ্ধি পাকাচ্ছে!'

কাস্তে আকৃতির চাঁদটাকে একবার দেখে নিল রানা। ওটা আরেকটু বড় হলে খুশি হত ও। তবু অল্প যে-টুকু আলো পাওয়া যাচ্ছে সেজন্যে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে হয়। সামনে পড়ল উঁচু-নিচু অসমতল জমিন, ঠিক যেন চাঁদের পিঠ। গিয়ার বদলে চোখ কুঁচকে ভাল করে তাকাল ও, হেডলাইটের আলোয় যতদূর দেখা যায়। তারপর হঠাৎ মসৃণ হয়ে গেল মরুভূমি, আতসবাজির মত বহুরঙা আগুনের ফুলকি ছুটল চারদিকে।

ক্রিস্টাল ভরা বিশাল এক শুকনো লেকে নেমে এসেছে ট্রাক, জোড়া হেডলাইটের আলো লাগায় রঙধনুর সবগুলো রঙ যেন বিস্ফোরিত হলো। ট্রাকের গতি বাড়িয়ে দিল রানা, ঘণ্টায় নব্বুই মাইল।

মরুর মেঝে যেন অনন্ত, অসীমের দিকে হারিয়ে গেছে, ভোর হবার আগেই দিগন্তে নিভে যাচ্ছে তারাগুলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, এই ছোটার যেন কোন শেষ নেই। ক্রিস্টাল লেক জায়গা ছেড়ে দিল নিচু, বোল্ডার ঢাকা পাহাড়কে। এরকম একঘেয়ে প্রকৃতি আগে কখনও দেখেছে কিনা এই মুহূর্তে মনে করতে

পারল না রানা।

উষালগ্নে ড্রাইভিং সীটে বসল মুরল্যাণ্ড। দিগন্ত থেকে লাফিয়ে উঠল সূর্য যেন একটা কামানের গোলা। মনে হলো নড়াচড়া না করে ওখানেই সারাটা দিন ঝুলে থাকল, তারপর হঠাৎ অস্ত যাবার আগে একটা পাথরের মত খসে পড়ল। ছায়াগুলো ছড়িয়ে পড়ল বহু দূর পর্যন্ত, কিংবা বলা যায় ছায়ার কোন অস্তিত্বই নেই।

সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা পর ট্রাক থামিয়ে কার্গো বেড সার্চ করেছে রানা। হাতে উঠে এল এক মিটার লম্বা একটা পাইপ। নিচে নেমে বালির ভেতর খাড়াভাবে গাঁথল ওটা, ছায়াটা ভালভাবে লক্ষ করল। দুটো নুড়ি পাথর নিল হাতে, একটা রাখল ছায়ার ডগায়।

'এই কি তোমার ডু-ইট-ইওরসেলফ কম্পাস?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড, ট্রাকের ছায়ায় বসে রানার কাজ দেখছে সে।

'ওস্তাদের কাজ দেখে শেখার চেষ্টা করো।' মুরল্যাণ্ডের পাশে চলে এল রানা, প্রায় বারো মিনিট ধরে খেয়াল করল ছায়ার ভ্রমণ পথ। ছায়ার ডগা এখন যেখানে সরে এসেছে, সেখানে দ্বিতীয় পাথরটা রাখল ও। প্রথম ও দ্বিতীয় পাথরের মাঝখানে একটা সরল রেখা তৈরি করল, না থেমে রেখাটাকে আরও আধ মিটার টেনে আনল। প্রথম পাথরে এরপর বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল রেখে দাঁড়াল, ডান পায়ের বুড়ো আঙুল রাখল লাইনটা যেখানে শেষ হয়েছে। বাঁ হাত তুলল, সোজা সামনের দিকে তাক করে, বলল, 'ওদিকটা উত্তর।' এরপর ডান হাত লম্বা করল শরীরের পাশে। 'ওদিকটা পুব, ট্র্যান্স-সাহারান ট্র্যাক।'

রানার ডান হাত অনুসরণ করে দূরে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'ওদিকে একটা বালিয়াড়ি দেখতে পাচ্ছি, রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।'

আবার রওনা হলো ওরা, এক ঘণ্টা পরপর দিক নির্ণয় করল। ন'টার দিকে দক্ষিণ-পুব থেকে বাতাস ছাড়ল, হাওয়ার সঙ্গে প্রচুর বালি থাকায় দু'শো মিটারের বেশি দৃষ্টি চলে না। দশটার দিকে তপ্ত বালির গতি আরও বাড়ল, জানালা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ক্যাবের ভেতর ঢুকে পড়ছে। দিনের শুরুতে তাপমাত্রা ছিল পনেরো ডিগ্রী সেলসিয়াস, অর্থাৎ ষাট ডিগ্রী ফারেনহাইট; তিন ঘণ্টায় উঠে এসেছে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রী সেলসিয়াস অর্থাৎ নব্বুই ডিগ্রী ফারেনহাইটে। আরও তিন ঘণ্টা পর, ভর দুপুরে, তাপমাত্রা দাঁড়াল ছেচল্লিশ ডিগ্রী সেলসিয়াসে। বাতাস এত গরম হয়ে উঠল, মনে হলো গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে।

দিক নির্ণয়ের জন্যে এখন আধ ঘণ্টা পরপর থামছে রানা, যদিও ধূলি ঝড়ের ভেতর দিয়ে সূর্যটাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। একটা ক্যানিস্টার খুলে মুরল্যাণ্ডের দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'লিকুইড রিফ্রেশমেন্টের সময় হয়েছে।'

'আগে শুনি কতটুকু?'

'এসো সমান ভাগে ভাগ করি। আধ লিটার করে। বাকি এক লিটার কালকের জন্যে থাক।'

দু'হাঁটুর মাঝখানে হুইল আটকে পানি খেলো মুরল্যাণ্ড। ক্যানিস্টারটা রানাকে ফিরিয়ে দিল সে। 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমাদের পিছনে কুকুর লেলিয়ে

দিয়েছে শানিন।'

'এই একই মডেলের ট্রাক নিয়ে রওনা হবে ওরা,' বলল রানা। 'কাজেই মাঝখানের ব্যবধান কমাতে পারবে না। তবে একটা সুবিধে পাবে ওরা। পেট্রল শেষ হয়ে গেলে অচল হয়ে পড়ব আমরা। কিন্তু ওদের সঙ্গে অতিরিক্ত পেট্রল থাকবে, ফলে কাছে চলে আসবে।'

নিচু একটা বালিয়াড়ির দিকে এগোল মুরল্যাণ্ড। 'শানিন একটা হেলিকপ্টারও পাঠাতে পারে।'

'হেলিকপ্টার পেতে হলে ফোর্ট ফরো বা মালিয়ান এয়ারফোর্সের সাহায্য নিতে হবে তাকে,' বলল রানা। 'তাছাড়া, এই ধূলিঝড়ের মধ্যে আমাদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।'

সাইডভিউ মিররে চোখ রেখে মুরল্যাণ্ড দেখল ওদের পিছনে চাকার দাগ বলে কিছু নেই, সাইমুম সব ঢেকে দিচ্ছে। সীটে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল সে। 'আশ্বস্ত করার জন্যে ধন্যবাদ।'

'ফুয়েলের কি অবস্থা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সুবিধের নয়।'

'টোপ ফেলার সময় হয়েছে। রিভার্স হেডিং, পশ্চিম দিকে। খানিক দূর এগিয়ে থামো।'

নির্দেশ পালন করল মুরল্যাণ্ড, হুইল মুচড়ে ব্রেক কষল। 'এবার আমরা হাঁটব?'

'হ্যাঁ, হাঁটব। তার আগে গার্ডকে সামনে আনো, ট্রাক চেক করে দেখো কাজে লাগার মত কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

'যেমন?'

'কাপড়, মাথায় জড়িয়ে রোদ ঠেকানো যায়।'

বড়বড় আতঙ্ক ভরা চোখে তাকিয়ে থাকল গার্ড। ক্যাবে এনে বসানো হলো তাকে। পাগড়ি আর আলখেল্লা থেকে কাপড় কেটে পাকিয়ে রশি বানানো হলো, হাত আর পা এমনভাবে বাঁধা হলো যাতে স্টিয়ারিং হুইল বা ফ্লোর প্যাডেল ছুঁতে না পারে। ট্রাকের পিছন থেকে এক জোড়া তোয়ালে পাওয়া গেল, মাথা ঢাকার কাছে লাগবে। অস্ত্রগুলো রেখে যাচ্ছে ওরা, বালির নিচে। সবশেষে স্টিয়ারিং হুইল বাঁধল রানা, সেকেণ্ড গিয়ার দিয়ে নেমে পড়ল ক্যাব থেকে। বিশ্বস্ত রেনোয়া হেলেদুলে ঝাঁকি খেতে খেতে ফিরতি পথ ধরল তেবেজার দিকে মুখ করে। এক সময় বালির উড়ন্ত মেঘের ভেতর হারিয়ে গেল সেটা।

'আমাদের চেয়ে ওরই বরং বেঁচে যাবার সম্ভাবনা বেশি,' মন্তব্য করল মুরল্যাণ্ড।

'হয়তো, হয়তো নয়।'

'কত দূর হাঁটতে হবে আমাদের?'

'এই ধরো একশো আশি কিলোমিটার,' রানার গলায় নরম সুর।

'সে তো প্রায় একশো বারো মাইল!' যেন অভিযোগ করল মুরল্যাণ্ড। 'অথচ সঙ্গে পানি আছে মাত্র এক লিটার।' চারদিকে বিষণ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'বহু

বছর ধরে এই ভয়টাই ছিল মনে, এরকম নো ম্যানস ল্যাণ্ডে মারা যাব, রোদে পুড়ে শুকিয়ে খটখটে হয়ে যাবে কঙ্কাল। দুঃখ শুধু মায়ের জন্যে– কি কষ্টে, কত আদর-যত্নে এত বড়টি করেছে...'

'ভাল দিকগুলো চিন্তা করো, বাছা,' বলল রানা, মাথায় পাগড়ি বাঁধছে ও। 'খোলা ও বিশুদ্ধ বাতাসে ফুসফুস ভরতে পারছ, নিস্তব্ধতার ভেতর প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছ। ভিড় নেই, ট্রাফিক নেই, শোরগোল নেই। আত্মার জন্যে আদর্শ পরিবেশ না?'

'ঠাণ্ডা এক বোতল বিয়ার, একটা বার্গার, শাওয়ারের নিচে গোসল,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুরল্যাণ্ড।

চারটে আঙুল খাড়া করল রানা। 'চারদিনের মধ্যে পাবে সব।'

'মিথ্যে আশ্বাস দিয়ো না, আরও বেশি কষ্ট পাই আমি।'

'কথা দিয়ে কথা রাখিনি, এমন কখনও হয়েছে?' আরেকবার দিক নির্ণয় করল রানা। তারপর রওনা হলো। বালি ঝড়ে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে ওর মূর্তি, তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ওর শিরদাঁড়ার কাছে বেল্টে আঙুল গলিয়ে দিল মুরল্যাণ্ড– ভয় হচ্ছে, তা না হলে সে তার বন্ধুকে হারিয়ে ফেলতে পারে।

ট্রাক ছাড়ার পর সেই যে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হাঁটা ধরেছে, সারা দিন চলার মধ্যে থাকল ওরা; তারপর রাতেও বিশ্রাম নেয়ার জন্যে কোথাও থামল না। দু'জনেই একমত, অসুস্থ বা দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত যতটা সম্ভব এগিয়ে থাকতে হবে ওদেরকে। অবশেষে যখন বিশ্রামের জন্যে থামল, নতুন একটা দিনের আলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে চারদিকে।

এক জায়গায় বালি জড়ো করে ছায়া তৈরি করল ওরা, ছায়ায় শুধু মাথাটা তুলে রাখল, বাকি শরীর বালির নিচে ডুবে আছে। রোদ থেকে বাঁচার এটাই একমাত্র উপায়। যদিও সূর্য আরও ওপর দিকে উঠে এলে মাথা ঢাকার ছায়াও তৈরি করা সম্ভব নয়।

বিশ্রাম নেয়ার আগে একটানা হেঁটে ত্রিশ মাইল এগিয়েছে ওরা, তারমানে আটচল্লিশ কিলোমিটার। হাঁটা আসলে আরও বেশি হয়েছে, বোল্ডার আর বালিয়াড়ি এড়াবার জন্যে ঘুরপথ ধরতে না হলে আরও কয়েক মাইল সামনে থাকত। দ্বিতীয় পর্বের যাত্রা শুরু করল সূর্য অস্ত যাবার আগে। খানিক পর আকাশে তারা ফুটতে দিক সম্পর্কে নিশ্চিত হবার সুযোগ পেল রানা।

পরদিন সূর্য ওঠার পর আবার থামল ওরা, ট্র্যান্স-সাহারান ট্র্যাক আরও বিয়াল্লিশ কিলোমিটার কাছে চলে এসেছে। বালির নিচে গা ঢাকা দেয়ার আগে মুরল্যাণ্ড জিজ্ঞেস করল, 'পানি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ভাগাভাগি করে ক্যানিস্টারের শেষ ফোঁটাটুকুও খেয়ে ফেলল ওরা। এখন থেকে, পানির নতুন কোন উৎস না পাওয়া পর্যন্ত, ওদের শরীর শুকাতে শুরু করবে। তারমানে শুরু হয়ে যাবে মৃত্যুর প্রক্রিয়া।

তৃতীয় রাতে ডান ও বাম দিকে দৃষ্টিসীমার বাইরে বিস্তৃত অসংখ্য বালিয়াড়ি বাধা হয়ে দাঁড়াল। প্রতিটি বালিয়াড়ি ভীতিকর লাগলেও, ওগুলোর আলাদা একটা

সৌন্দর্য আছে। ঢালগুলো মসৃণ, বাতাস অদ্ভুত সুন্দর ঢেউ আকৃতির নকশা তৈরি করে রেখেছে, বাতাসের গতি বা অস্থিরতা কমবেশি হবার সঙ্গে সে-সব নকশা প্রতি মুহূর্তে বদলে যায়। খুব তাড়াতাড়ি একটা রহস্য ধরে ফেলল রানা। ওঠার সময় ঢাল যদি কম খাড়া হয়, উল্টোদিকের ঢালটা ঝপ করে নিচে নেমে যাবে। কোন কোন ঢালের মাথা ক্ষুরের মত ধারাল। বালিয়াড়ির মাথাও এক রকম নয়, কোন কোনটার বালি এত নরম, মনে হবে চোরাবালি।

চতুর্থ দিন বালিয়াড়িগুলো খাটো হতে শুরু করল। তারপর এক সময় পিছিয়ে পড়ল ওগুলো, দূর দিগন্তে হারিয়ে গেল। দিনের সবচেয়ে উত্তপ্ত সময়ে সূর্য যেন তপ্ত লাল লোহার গায়ে কামারের হাতুড়ি পিটতে শুরু করল। সমতল ভূমি বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ, তবু হাঁটতে জান বেরিয়ে যাচ্ছে ওদের। বালিতে দু'ধরনের ঢেউ রয়েছে। ছোটগুলো, খুদে রিজ তৈরি করেছে, কোন ঝামেলা করে না। কিন্তু আকারে যেগুলো বড়, একটার সঙ্গে অপরটার দূরত্ব বেশি, এবং যতটুকু দূরত্ব ততটুকুই উঁচু হয়ে আছে ঢাল, একের পর এক টপকে আসা অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ ও ক্লান্তিকর।

হাঁটার মেয়াদ ক্রমশ ছোট হয়ে এল। ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে হচ্ছে ওদের, প্রতিবার বিশ্রামের সময়ও দীর্ঘ হচ্ছে। হাঁটার সময় কথা বলছে না ওরা, মাথা নিচু করে রেখেছে। কথা বললে মুখ শুকিয়ে যাবে। বালির রাজ্যে বন্দী ওরা, খাঁচার আকৃতি শুধু দূরত্ব দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব।

ল্যাণ্ডমার্ক বলতে উঁচু-নিচু পাথর, কয়েক মাইল পর পর দেখা যায়। নিহত দানবের কঙ্কাল বলে মনে হলো রানার। ওগুলো ছাড়া মরু প্রান্তরকে চেনার কোন উপায় নেই। সামনের পথ ও প্রান্তর পিছনে ফেলে আসা পথ ও প্রান্তরের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এক এক সময় মনে হয়, একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে ওরা, কোথাও এগোচ্ছে না।

ক্লান্ত শরীরে আরও বিশ কিলোমিটার এগোবার পর একটা মালভূমি দেখতে পেল ওরা। নতুন সূর্য উঠি উঠি করছে, এই সময় ভোট দিয়ে সিদ্ধান্ত হলো খাড়া ঢাল বেয়ে মাথায় চড়ার পর বিশ্রামের জন্যে থামবে ওরা। চার ঘণ্টা পর, কিনারা পেরিয়ে যখন উঠে এল, দিগন্তের অনেক ওপরে চলে এসেছে সূর্য। যে-টুকু শক্তি রিজার্ভ ছিল, কিছুই তার অবশিষ্ট নেই। ঢাল বেয়ে ওঠায় ওদের হৃৎপিণ্ড পাগলা ঘোড়ার মত লাফাচ্ছে, পায়ের পেশী ব্যথায় অবশ হয়ে গেছে, ফুসফুস আরও বেশি বাতাস দাবি করায় বুক ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে।

এত বেশি ক্লান্ত রানা, ভয় হলো একবার বসলে আর বোধহয় সিধে হতে পারবে না। কোন রকমে দাঁড়িয়ে থাকল ও, কিনারায় টলছে। চারদিকে এমনভাবে তাকাল, ও যেন একটা জাহাজের ক্যাপটেন, দাঁড়িয়ে আছে ব্রিজে। নিচের সমতল ভূমি যদি আকৃতিবিহীন দুর্গম প্রান্তর হয়ে থাকে, মালভূমির সারফেসকে রোদে ফাটানো কিম্ভূতকিমাকার দুঃস্বপ্ন বলতে হবে। লাল ও কালো পাথরের সাগর ওদের সামনে। পাথরের স্তূপ কোথাও বিদঘুটে ভঙ্গিতে মোচড় খেয়ে আছে, আর আকারে বড় কোন কোন পাথর দেখতে এত কুৎসিত যেন ভয় পাওয়ানোর জন্যেই কেউ রেখে গেছে ওখানে। চোখ বা মনকে একটু স্বস্তি দিতে পারে, এমন কিছুই

নেই ওদের সামনে। মালভূমির কোন কোন অংশ গোলকধাঁধার মত, খাদগুলো মোচড় খেয়ে কোন দিকে এগিয়েছে বোঝার কোন উপায় নেই। গোটা দৃশ্যটা দেখে মনে হবে প্রাচীন কোন শহর, কয়েক শতাব্দী আগে আণবিক বোমায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

'নরকের এটা কোন্ অংশ হে?' মুরল্যাণ্ডের গলা থেকে কর্কশ আওয়াজ বেরুল।

মেজর কামারের ম্যাপটা বের করল রানা, ইতিমধ্যে ছিঁড়ে যাবার অবস্থা হয়েছে। হাঁটুর ওপর সাবধানে সিধে করল ওটা। 'নাম জানতে চাইলে ইন্টারন্যাশনাল জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটে অ্যাপ্লাই করতে হবে।'

পাথুরে মেঝেতে নেতিয়ে পড়ল মুরল্যাণ্ড, শূন্য দৃষ্টিতে মালভূমির দিকে তাকাল। 'কত দূর এলাম আমরা?'

'একশো বিশ কিলোমিটার, কম বা বেশি।'

'এখনও ষাট কিলোমিটার হাঁটতে হবে।'

মাথা নাড়ল রানা।

'মাথা নাড়ছ কেন?' রেগে গেল মুরল্যাণ্ড।

'রানার অভিজ্ঞতাকে যদি আইন ধরে নাও, তাহলে এখনও ষাট কিলোমিটারের অনেক বেশি দূরত্ব পেরুতে হবে আমাদের,' বলল রানা।

'রানার অভিজ্ঞতা মানে?'

'অন্য লোকের ম্যাপ অনুসরণ করলে বিশ মাইল পিছিয়ে পড়তে হয়।'

মুরল্যাণ্ডের চোখে সন্দেহ। 'তুমি রাস্তা ভুল করোনি তো?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। পিছিয়ে পড়ার আরও কারণ, সোজা পথে আসিনি আমরা।'

গর্তে ঢোকা চোখ মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল মুরল্যাণ্ড, ফেটে ফুলে ওঠা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সাবধানে কথা বলল, 'তারমানে আরও পঞ্চাশ কিলোমিটার। শেষ সত্তর কিলোমিটার পেরিয়েছি কোন পানি ছাড়াই।'

'মনে হচ্ছে এক হাজার কিলোমিটার।'

'এখানেই সন্দেহের প্রশ্ন এসে পড়ে। আমার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না।'

ম্যাপ থেকে মুখ তুলল রানা। 'তোমার মুখ থেকে এ-কথা শুনব বলে আশা করিনি।'

'দোস্ত,' কাতর গলায় বলল মুরল্যাণ্ড। 'পানি না পেলে আমি মারা যাব।'

'আর দুই রাত, ট্র্যান্স-সাহারান ট্র্যাকের ওপর নাচব আমরা।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড। 'তুমি দিবাস্বপ্ন দেখছ, রানা। দশ কিলোমিটার হাঁটব, সে স্ট্যামিনাও নেই আমাদের। বিশেষ করে এই গরমে। পানি পেলে অবশ্য চেষ্টা করে দেখা যেত।'

রানাকে অস্থির করে তুলছে একটা কাল্পনিক দৃশ্য– অলিভা সারাক্ষণ মারধর করছে সিলভিয়াকে। 'আমরা পৌঁছুতে না পারলে ওরা সবাই মারা যাবে।'

'কিন্তু কি করার আছে। মারা তো আমরাও যাচ্ছি। এতদূর আসতে পেরেছি, এটাই তো মিরাকল। তুমি যদি...' উঠে বসল মুরল্যাণ্ড, চোখের ওপর হাত তুলে

ছায়া তৈরি করল। তারপর উত্তেজিত ভঙ্গিতে পাথরের তৈরি একটা জঙ্গলের দিকে হাত তুলল। 'ওদিকে, পাথরগুলোর মাঝখানে, কি ওটা? ছোট একটা মুখ মনে হচ্ছে না? দেখতে পাচ্ছ, প্রবেশপথের মত?'

তার হাত অনুসরণ করল রানার চোখ। পাথরের মাঝখানে সত্যি একটা কালো গর্ত দেখা যাচ্ছে। মুরল্যাণ্ডের হাত ধরে টান দিল ও, খাড়া করল তাকে। 'দেখলে, এরইমধ্যে ভাগ্য আমাদের প্রসন্ন হতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা একটা গুহাই আমাদের দরকার। দিনের সবচেয়ে গরম সময়টা ওখানে কাটাতে পারলে আর কিছু চাই না।'

এরইমধ্যে লালচে-খয়েরি পাথরে লেগে ঠিকরে আসা উত্তাপে দম আটকে আসার অবস্থা হয়েছে। এগোতে শুরু করার পর মনে হলো ওরা যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ওপর পা ফেলছে। চোখে সানগ্লাস নেই, আঁচ থেকে চোখ বাঁচানোর জন্যে মাথার পাগড়ি মুখে নামিয়ে আনল ওরা, দেখার জন্যে সরু একটু ফাঁক রাখল শুধু, দেখতে পাচ্ছে নিজেদের সামনে মাত্র কয়েক মিটার পর্যন্ত।

'ছায়া যখন আছে, এখানে মানুষজনও থাকতে পারে, কি বলো?' আশায় আশায় জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'যদি থাকে, ভেবেছ তারা আমাদের কোন সাহায্যে আসবে?' মুখে জড়ানো তোয়ালের ভেতর থেকে বলল রানা। 'বরং বিপদের জন্যে তৈরি থাকা উচিত।'

'কেন?'

'এদিকে কোনও বেদুইন যদি আশ্রয় নিয়ে থাকে, পানি আর খাবারের অভাবে তাদের অবস্থাও কাহিল হবার কথা,' বলল রানা। 'বেদুইন ডাকাতদের স্বভাব হলো, আগে মারে, তারপর প্রশ্ন করে।'

গুহার মুখে পৌঁছুতে হলে আলগা পাথরের একটা স্তূপ টপকাতে হবে ওদেরকে। খুব সাবধানে এগোল ওরা, খালি হাতে পাথর ছুঁলে নির্ঘাত পুড়ে যাবে চামড়া। পাথরের স্তূপটা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে এল ওরা,গুহার মুখে এখনও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাতাসের তাড়া খেয়ে এদিকে কিছু বালি উড়ে এসেছে, গুহার মুখে তৈরি হয়েছে নিচু একটা পাঁচিল। হাঁটু গাড়ল ওরা, হাত দিয়ে সেই বালি সরাল। ওপর থেকে পাথর ঝুলে থাকায় গুহার ভেতর ঢোকার সময় মাথা নিচু করতে হলো রানাকে। মুরল্যাণ্ডের কোন অসুবিধে হলো না, শিরদাঁড়া খাড়া করে ঢুকতে পারল সে।

চোখে অন্ধকার সয়ে আসার জন্যে ওদেরকে অপেক্ষা করতে হলো না। গুহার ভেতরটা অন্ধকার নয়। এই গুহা যুগ যুগ ধরে বাতাসের আঘাতে তৈরি হয়নি, তৈরি হয়নি লাইমস্টোনের গা চুইয়ে বেরিয়ে আসা পানিতে ক্ষয়প্রাপ্তির কারণে। আদিম যুগে যখন ঘন ঘন ভূমিকম্প হত, পৃথিবী যখন একটা আকৃতি পাচ্ছে, সেই মহা আলোড়নের সময় বিশাল আকারের পাথর একটার ওপর একটা চেপে বসে তৈরি করেছে ফাঁপা গহ্বর। মাঝখানে রোদ দেখা গেল, ওপরের ফাঁক দিয়ে নেমে আসছে।

গুহার আরও ভেতর দিকে এগোচ্ছে রানা। দেখা গেল ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো মূর্তি। প্রকাণ্ড কাঠামো, ঝুঁকে রয়েছে রানার দিকে। শরীরের রোম দাঁড়িয়ে

গেল, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে এল রানা, ধাক্কা খেলো মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে।

'তুমি আমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছ,' গম্ভীর সুরে প্রতিবাদ জানাল মুরল্যাণ্ড।

'সরি।' হাত তুলে মসৃণ একটা দেয়াল দেখাল রানা। ওখানে একটা মূর্তি বর্শা তুলে ধরেছে মাথার ওপর, বুনো মোষকে মারতে যাচ্ছে। 'এখানে ওদেরকে আমি আশা করিনি।'

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে লোকটাকে দেখল মুরল্যাণ্ড। ধীরে ধীরে ভুরু কোঁচকাল সে। তারপর হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াতে গিয়ে বাধা পেল, ওগুলো তোয়ালের ভেতর ঢুকে আছে। পাথরের ওপর মানুষের আঁকা ছবি? ধু-ধু মরুভূমির মাঝখানে? ধীরে ধীরে একটা থেকে আরেকটা ছবিতে সরে যাচ্ছে তার চোখ। প্রাচীন শিল্পকলা সমৃদ্ধ একটা বিশাল গ্যালারি আবিষ্কার করে বসেছে ওরা। না, দৃষ্টিভ্রম নয়; ওরা স্বপ্নও দেখছে না। ছবিগুলো যারাই এঁকে থাকুক, সন্দেহ নেই উন্নত একটা সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করত তারা, শত শত বছরের শিল্প নৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট নমুনা রেখে গেছে।

'এ কি সত্যি?' বিড়বিড় করল মুরল্যাণ্ড।

রহস্যময় রক পেইন্টিংগুলোর দিকে এগোল রানা, তিন মিটার উঁচু মুখোশ পরা একটা মানুষকে পরীক্ষা করল। মুখোশ থেকে, মুখ ও কাঁধ থেকে ঝুলে আছে রঙ-বেরঙের ফুল। খিদে আর তৃষ্ণার কথা ভুলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ও। 'জেনুইন আর্ট, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'কে আঁকল? কবে?' ফিসফিস করল মুরল্যাণ্ড।

'আমি আর্কিওলজিস্ট হলে বলতে পারতাম, ব্যাখ্যা করতে পারতাম স্টাইল আর কালচার। গুহার দেয়ালেই আদি শিল্পকলার সূচনা, আমরা সবাই জানি। শুরু হয় পিছনের দেয়ালে, পরবর্তী কালচারের শিল্পীরা ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগিয়ে আসে। সে হিসেবে গুহামুখের কাছাকাছি ছবিগুলো কাছাকাছি সময়ের হবে।'

'কিভাবে বলতে পারো?'

'দশ থেকে বারো হাজার বছর আগে সাহারায় ছিল ভেজা ট্রপিকাল ক্লাইমেট। প্রচুর গাছপালা জন্মাত। অন্তত এখনকার চেয়ে নরম ছিল পরিবেশ, বাসযোগ্য ছিল।' বিশাল একটা মোষের দিকে হাত তুলল রানা, আহত হয়ে পড়ে আছে, একদল লোক বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মারছে ওটাকে। 'এটা নিশ্চয়ই প্রাচীন কালের অর্থাৎ প্রথমদিককার ছবি, কারণ শিকারীরা যে হাতি আকৃতির মোষ মারছে দুনিয়ার বুক থেকে অনেক কাল আগেই তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

আরেকটা ছবির দিকে এগোল রানা, সেটার দৈর্ঘ্য কয়েক বর্গমিটার দেয়াল জুড়ে। 'এখানে আমরা গৃহপালিত পশুর পাল দেখতে পাচ্ছি। প্যাস্টোরাল যুগ শুরু হয়েছিল খিস্ট্রের জন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে। পরবর্তী সময়ের এই ছবিতে, লক্ষ করো, ক্রিয়েটিভ কম্পোজিশন আগেরটার চেয়ে বেশি, খুঁটিনাটি বিষয়ের দিকে বিশেষ খেয়াল দেয়া হয়েছে।'

'জলহস্তী,' বলল মুরল্যাণ্ড, তাকিয়ে আছে বিশাল এক ড্রইং-এর দিকে, মসৃণ একটা দেয়ালের প্রায় পুরোটা দখল করে রেখেছে। 'সাহারার এই অংশে জলহস্তী

থাকতে পারে না, অসম্ভব!'

'অন্তত তিন হাজার বছরের মধ্যে ছিল না,' বলল রানা। 'কল্পনা করা কঠিন এই মরুভূমি এককালে বিশাল তৃণভূমি ছিল– এখানে ঘুরে বেড়াত জিরাফ, অস্ট্রিচ আর হরিণ।'

ধীরে ধীরে যতই এগোল ওরা, ওদের চোখের সামনে সাহারার সময়ের ভাঁজ খুলে যেতে লাগল।

মুরল্যাণ্ড বলল, 'এখানে এসে দেখা যাচ্ছে স্থানীয় শিল্পীরা গাছপালা ও পশুপাখির ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়েছে।'

'এক সময় বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়, গোটা এলাকা শুকাতে শুরু করে,' লেকচার ঝাড়ছে রানা, প্রাচীন ইতিহাসের ভুলে যাওয়া পরিচ্ছেদ কিছু কিছু মনে করতে পারছে। 'পশুদের জন্যে খাদ্য বলতে আর কিছু থাকলো না, চার হাজার বছর পর ঘাস বা গাছপালা সব শেষ হয়ে যায়, গোটা এলাকা মরুভূমির দখলে চলে যায়।'

গুহার ভেতর দিক থেকে সরে এল মুরল্যাণ্ড, প্রবেশমুখের কাছাকাছি এসে আরেকটা পেইন্টিঙের সামনে দাঁড়াল। 'এখানে চ্যারিয়াট প্রতিযোগিতার ছবি দেখা যাচ্ছে।'

'মেডিটারেনিয়ানের লোকজন ঘোড়া বা চ্যারিয়ট নিয়ে আসে এক হাজার বি.সি.-তে,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'তবে আমার জানা ছিল না যে মরুভূমির এত ভেতরে তারা আসতে পেরেছিল।'

'এরপর কি এল, পণ্ডিতজী?'

'ক্যামেল পিরিয়ড,' বলল রানা, দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ষাটটা উটের সামনে। বিরাট একটা কাফেলা, ছবিটাও তাই খুব লম্বা। উটগুলো দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজি 'এস' হরফের আদলে। 'পাঁচশো পঁচিশ বি.সি., পারস্য দখল করার পর প্রথম কায়রোতে আনা হয় উট। এই উটের বহর নিয়ে এগোতে শুরু করে রোমানরা, তীর থেকে পৌঁছে যায় সেই একেবারে টিমবাকটু পর্যন্ত। বৈরী আবহাওয়ায় টিকে থাকার গুণে সেই থেকে মরুভূমিতে রয়ে গেছে ওগুলো।'

সময়ের হিসেবে সাম্প্রতিককালের ছবির সঙ্গে প্রাচীন ছবির পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে চোখে। শিল্প সমৃদ্ধ প্রাচীন আর্ট গ্যালারির আরেক সিরিজের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। এখানে পাথর কুঁদে প্রথমে একটা যুদ্ধ-দৃশ্যের নকশা তৈরি করা হয়েছে, তারপর তাতে রঙ লাগানো হয়েছে। যোদ্ধাদের মুখে চৌকো দাড়ি, ঢাল আর বর্শা উঁচু করে ধরে আছে, চার ঘোড়ার দু'চাকার চ্যারিয়টে বসে কৃষ্ণবর্ণ তীরন্দাজ বাহিনীর ওপর হামলা চালাচ্ছে। স্থানীয় যোদ্ধাদের তীরগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসছে আকাশ থেকে।

'ঠিক আছে, সবজান্তা গুরু, দেখি এটা ব্যাখ্যা করতে পারো কিনা,' চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল মুরল্যাণ্ড।

এগিয়ে এল রানা, মুরল্যাণ্ডের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল। পাথরে আঁকা ছবিটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ও, হতভম্ব হয়ে গেছে। রেখাবহুল একটা ছবি, বাচ্চা ছেলের স্টাইল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মাছ আর কুমীর ভরা একটা

জাহাজ ভেসে যাচ্ছে নদীর স্রোতে। ব্যাপারটা কল্পনা করা কঠিন। সত্যিই কি গুহার বাইরের নরকটা এককালে উর্বর এলাকা ছিল? এখন যেটা শুকনো রিভারবেড, এককালে সেখানে প্রচুর পানি ছিল, সেই পানিতে ঘুরে বেড়াত কুমীর?

আরও কাছে সরে এল রানা, চোখে অবিশ্বাস। মাছ বা কুমীর ওর মনোযোগ কাড়েনি, মনোযোগ কেড়েছে নদীর ঢেউ আর স্রোত। জাহাজটা মিশরীয় ধাঁচের বোট, তবে ডিজাইন সম্পূর্ণ আলাদা, অনেক বেশি আধুনিক। পানির ওপর জলযানের আকৃতি পিরামিডের মত– যে পিরামিডের মাথা ভাঙা। জাহাজের পাশ থেকে বেরিয়ে আছে গোল টিউব। খুদে আকৃতির বেশ ক'টা মূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে ডেকের চারধারে, তাদের মাথার ওপর বড় একটা পতাকা উড়ছে। প্রায় চার মিটার লম্বা হবে ছবিটা।

'কি জানি, বলতে পারছি না!' হার মানল রানা।

'আমি পারব,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ওটা একটা আয়রনক্ল্যাড।' অবিশ্বাসে প্রায় বিস্ফারিত হয়ে আছে তার চোখ জোড়া। 'কনফেডারেট স্টেটস নেভির আয়রনক্ল্যাড।'

'অসম্ভব! তা কি করে হয়!' রানা মানতে পারছে না। 'এখানে কি করে আসবে?'

'তা জানি না, তবে এসেছে,' বলল মুরল্যাণ্ড, 'বুড়ো জেমস বণ্ড কি বলছিলেন, মনে আছে? নিশ্চয় এটার কথাই বলছেন তিনি।'

'কি বলতে চাও? ব্যাপারটা তাহলে মিথ নয়, সত্যি?'

'যা দেখেনি তা স্থানীয় শিল্পীরা আঁকবে কিভাবে? সিভিল ওঅরের শেষ দিকে কনফেডারেট ব্যাটল এনসাইন হিসেবে যে পতাকা বাছাই করা হয়, জাহাজের মাথায় সেটাই আমরা উড়তে দেখছি। ভুল হবার কোন অবকাশ নেই, রানা।'

'কিন্তু...এমন হতে পারে, সাবেক কোন বিদ্রোহী ন্যাভাল অফিসার যুদ্ধের পর মরুভূমিতে পথ হারায়, এই গুহায় এসে ছবিটা আঁকে?'

'তুমি ছবির বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ করছ না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'ওটায় ওয়েস্টার্ন স্টাইলের চিহ্ন মাত্র নেই। আঁকা হয়েছে লোকাল আর্ট স্টাইলে। ওই অফিসার তা আয়ত্ত করবে কিভাবে?'

'কেসমেট-এর দাঁড়ানো লোক দু'জন সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বোঝাই যাচ্ছে, একজন জাহাজের অফিসার,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'সম্ভবত ক্যাপটেন।'

'আর অপর লোকটা?' ফিসফিস করল রানা, যেন গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না। ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। 'কে উনি?'

ক্যাপটেনের পাশে দাঁড়ানো লোকটার পা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল মুরল্যাণ্ড। 'কে উনি মানে? কার কথা বলতে চাইছ তুমি?' তার গলাও অবিশ্বাসে বুজে এল।

'রোদ ঝলসানো চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছি না,' বলল রানা। 'আমি

আশা করছি তুমি আমাকে জানাবে।'

জটিল পরিস্থিতির মধ্যে এলোমেলো অনেকগুলো বিষয় গুছিয়ে নিতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে মুরল্যাণ্ডের মন ও মস্তিষ্ক। 'এই ছবির শিল্পী যে-ই হোক,' মুগ্ধ বিস্ময়ে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল সে, 'তার আঁকা লোকটার চেহারার সঙ্গে আব্রাহাম লিংকনের আশ্চর্য মিল আছে।'

***

কালকূট-৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭

এক

পাথুরে গুহার ঠাণ্ডা ছায়ায় সারাদিন বিশ্রাম নেয়ার পর ওদের শরীরে শক্তি ফিরে এল, সেই সঙ্গে সাহসও খানিকটা বাড়ল। ট্র্যান্স-সাহারান ট্র্যাক এখনও অনেকদূরে, সামনের নগ্ন ও বৈরী মরুভূমি পাড়ি দেয়া দুর্বলচিত্ত কারও পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করার অভিজ্ঞতা আছে ওদের, সব রকম বিপদে কিভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় জানে, তা সত্ত্বেও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় বাকি পথটুকু পাড়ি দেয়া অসম্ভব বলে মনে হলো ওদের। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা। সাহারার মাঝখানে পাথুরে গুহার ভেতর মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময়কার যুদ্ধজাহাজ আয়রনক্ল্যাড বা প্রেসিডেন্ট লিংকনের ছবি মনের ভেতর দিকের শেলফে তুলে রাখল ওরা, বেঁচে থাকলে এ-সব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার প্রচুর সময় পাওয়া যাবে।

শেষ বিকেলেও রোদ যেন গনগনে আগুন হয়ে আছে। গুহা থেকে বেরিয়ে আসতেই শরীরটা যেন মশালের মত জ্বলে উঠল মাসুদ রানার। লোহার লম্বা পাইপটা পাথরের ফাঁকে গেঁথে আরেকবার কম্পাস রিডিং নিল ও। রোদে বেরিয়েছে মাত্র কয়েক মিনিট, মনে হলো মোমের মত গলতে শুরু করেছে শরীর। দিগন্তের কাছে বড়সড় একটা পাথর মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে, পুব দিকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে, প্রথম এক ঘণ্টা হেঁটে ওখানে পৌছানোর সিদ্ধান্ত নিল ও।

গুহার ভেতর, দেয়ালচিত্রগুলোর কাছে ফিরে আসার পর উপলব্ধি করল রানা, শরীরে আসলে শক্তি বলে কিছু নেই। রোদে শুধু একটু দাঁড়িয়েছে, তাতেই অন্ধকার দেখছে চোখে, মাথা ঘুরছে, ইচ্ছে হচ্ছে শুয়ে পড়ে। বন্ধু ববি মুরল্যাণ্ডের চেহারা দেখে বুঝতে পারছে নিজের চেহারার কি অবস্থা হয়েছে। মুরল্যাণ্ডের চোখ দুটো কোটরের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে, পরিশ্রান্ত কুকুরের মত হাঁ করে হাঁপাচ্ছে, কাপড়চোপড় ছেঁড়া ও নোংরা, বালি লেগে সাদা হয়ে আছে চুল। সবচেয়ে যেটা আশঙ্কার কথা, তার চেহারায় পরাজয়ের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শারীরিক অর্থে রানার চেয়ে মুরল্যাণ্ডের শক্তি বেশি, তবে মানসিক শক্তি রানার বেশি। পানি ও খাবারের অভাবে যে কষ্ট পাচ্ছে, রানা সেটাকে কল্পনার সাহায্যে হালকা করে নিতে পারছে– বরফের টুকরো ভর্তি বিয়ারের গ্লাস, সুইমিং পুল, সুস্বাদু খাদ্য সম্ভারে বোঝাই বুফে টেবিল ইত্যাদির স্বপ্ন দেখছে চোখ খোলা রেখে।

তবে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন রানা। ও জানে যে আজকের রাতটাই শেষ রাত। প্রাণ কেড়ে নেয়ার নির্মম খেলায় মরুকে যদি পরাজিত করতে চায় ওরা, বেঁচে থাকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে হবে ওদের। পানি না থাকায় এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পর কিছুতেই আর

টিকতে পারবে না ওরা। সামনে এগোনোর এতটুকু শক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। ভয় লাগছে ওর, কারণ জানে ট্র্যান্স-সাহারান ট্র্যাক এখনও আশি কিলোমিটার দূরে।

মুরল্যাণ্ডকে আরও এক ঘণ্টা বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ দিল, তারপর তার ঘুম ভাঙাল। 'এখুনি রওনা হতে হয়।'

সামান্য একটু ফাঁক হলো মুরল্যাণ্ডের চোখ। অতি কষ্টে উঠে বসার চেষ্টা করছে সে। 'ব্যস্ত হয়ে কি লাভ? আরেকটা দিন বিশ্রাম নিলে হয় না?'

'আমাদের জন্যে অনেক মানুষ পথ চেয়ে আছে। মহিলা ও বাচ্চাগুলোর কথা ভাবো। ওরা চাইছে আমরা যেন বেঁচে থাকি, যাতে ফিরে গিয়ে ওদের আমরা বাঁচাতে পারি। প্রতিটি ঘণ্টা মূল্যবান।'

মুরল্যাণ্ডকে রানা তেবেজা গোল্ড মাইনের ক্রীতদাসদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। ক্লান্তি ভুলে গেল সে, ঘুমের ঘোর কেটে গেল, ধীরে ধীরে সিধে হলো নিজের পায়ে। এরপর রানার নির্দেশে হালকা ব্যায়াম করল সে, কাতর পেশী আর আড়ষ্ট জয়েন্টগুলো আলগা করে নিল। দেয়ালচিত্রগুলো শেষ একবার দেখে নিল ওরা। বিদ্রোহীদের আয়রনক্ল্যাড বা আয়রনক্ল্যাডে দাঁড়ানো আব্রাহাম লিংকন যে দৃষ্টিভ্রম নয়, এই সত্য মনে মনে আরেকবার উপলব্ধি করল। তারপর গুহা থেকে বেরিয়ে বিশাল ঢালু মালভূমির ওপর দিয়ে রওনা হলো, পথ দেখানোর জন্যে সামনে রয়েছে রানা, পুব দিকের বড়সড় পাথরটা ওদের গন্তব্য।

জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিয়ে অবশেষে অস্ত গেল সূর্য। তার বদলে ফোলা আধখানা চাঁদ দেখা দিল আকাশে। বাতাস এত দুর্বল যে বালির একটা কণাকে নড়িয়ে দেয়ার শক্তিও রাখে না, গোটা মরুভূমি নিস্তব্ধ ও স্থির হয়ে আছে। কোথাও একটা গাছ নেই। মালভূমিতে ছড়িয়ে থাকা পাথরগুলো, যেন ডায়নোসরের হাড়, এখনও তাপ ছড়াচ্ছে।

সাত ঘণ্টা হাঁটল ওরা। প্রথম গন্তব্য হিসেবে চিহ্নিত পাথরটা কাছে চলে এল, তারপর পিছিয়ে পড়ল, সেই সঙ্গে রাত বাড়ছে, আর রাত যত বাড়ল ততই ঠাণ্ডা হিম হয়ে এল পরিবেশ। দুর্বল ও ক্লান্ত ওরা, শুরু হলো অদম্য কাঁপুনি।

প্রকৃতির চেহারা এত ধীরে বদলে যাচ্ছে, পাথরগুলোর আকার ছোট হতে হতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে যাবার পর ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। দিক নির্ণয়ের জন্যে আকাশে মুখ তুলে তারা দেখছিল ও, নিচের দিকে তাকাতে বুঝতে পারল ঢাল বেয়ে মালভূমির নিচে নেমে এসেছে ওরা, সামনে সমতল প্রান্তর, মাঝে মধ্যে আঁকাবাঁকা শুকনো নালার রেখা দেখা যাচ্ছে।

কাঁধে বোঝা নিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে ওরা। হাঁটছে তো হাঁটছেই, এর যেন কোন শেষ নেই। এত দুর্বল, সামান্য একটু বিশ্রামের জন্যে যতবার থামল, প্রতিবার মনে হলো আর বোধহয় উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

হাঁটার সময় অলিভার কথা ভাবছে রানা। ভাবছে এরিক শানিনের কথাও। ওরা দু'জন খনির মহিলা ও শিশুদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছে। দৃশ্যটা যতবার কল্পনা করল, হাঁটার গতি সামান্য হলেও বাড়ল। ভাবল, আমরা রওনা হবার পর কতজন ক্রীতদাস মারা গেছে ওখানে? সিলভিয়াকে কি লাশের চেম্বারে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে?

পিপাসা মেটাবার জন্যে অনেকক্ষণ হলো ছোট একটা পাথর চুষছে রানা। কখন শেষবার থুথু ফেলেছে মনে করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। এমনকি মুখের ভেতরটা শেষ কখন ভেজা ছিল তা-ও মনে করতে পারল না। শুকনো স্পঞ্জের মত ফুলে উঠেছে জিভ, অবশ্য তারপরও ঢোক গিলতে পারছে।

বোল্ডার ঢাকা দুটো পাহাড়ের মাঝখানে বালির একটা বিস্তৃতি পেরুচ্ছে ওরা। দু'পাশের পাহাড় শেষ হচ্ছে না, এক সময় মনে হলো বালির এই বিস্তৃতি এক সময় পানি ভর্তি নদী বা খাল ছিল। সেটা বাঁক নিয়ে উত্তরে চলে গেছে, ওরা বাঁক না ঘুরে তীরে উঠে পড়ল।

আরেকটা আগুন-জ্বলা দিন শুরু হতে যাচ্ছে। মেজর কামারের ম্যাপটা ভোরের প্রথম আলোয় বের করে দেখে নিল রানা। নকশায় দেখা গেল বিশাল একটা শুকনো লেক পড়বে ওদের সামনে, প্রায় ট্র্যান্স-সাহারান ট্র্যাক পর্যন্ত বিস্তৃত। সমতল প্রান্তর ধরে হাঁটা সহজ, তবে খোলা তন্দুরে কোথাও এতটুকু ছায়া পাওয়া যাবে না।

সূর্য দিগন্তে উঁকি দিতেই আগুনের ছ্যাঁকা লাগল গায়ে। আজ দিনের বেলা ওরা বিশ্রাম নেবে না। এদিকের জমিন লোহার মত শক্ত, হাঁটার জন্যে সুবিধে।

ছোট কয়েক টুকরো মেঘ এসে দয়া করল ওদের ওপর, ঘণ্টা দুয়েক ঢেকে রাখল সূর্যকে। কিন্তু মেঘ সরে যাবার পর সূর্যকে মনে হলো খেপে গেছে, পারলে নিচে নেমে এসে ভস্ম করে ফেলে ওদেরকে। দুপুরের দিকে দেখা গেল, কোন রকমে বেঁচে আছে ওরা। দিনের তাপ যদি ওদেরকে মেরে না-ও ফেলে, দীর্ঘ রাতের প্রচণ্ড শীত কিছুতেই রেহাই দেবে না।

তারপর হঠাৎ একটা গভীর নালা দেখতে পেল ওরা, শুকনো লেকের মেঝে থেকে ঢালু হয়ে সাত মিটার নিচে নেমে গেছে, লেকটাকে আড়াআড়িভাবে দু'ভাগ করেছে ঠিক যেন মানুষের তৈরি একটা খালের মত। হঠাৎ লক্ষ করায় কিনারা থেকে পড়ে যাচ্ছিল রানা, কোনমতে সামলে নিল। নিচের দিকে তাকিয়ে দমে গেল মনটা। অকস্মাৎ একটা বাধা পেয়ে হতাশ বোধ করছে। নালার নিচে কিভাবে নামবে ওরা? কোথায় শক্তি পাবে? নামার পর অপর পারে উঠবেই বা কিভাবে? টলতে টলতে ওর পাশে চলে এল মুরল্যাণ্ড, ধপাস করে পড়ে গেল, পড়ার আগে শিথিল হয়ে গেল শরীর, নালার কিনারা থেকে নিচের দিকে মাথা আর হাত ঝুলছে।

নালার ওপারে কিছুই নেই, যত দূর দৃষ্টি যায় ধু-ধু মরু দেখতে পাচ্ছে রানা। সন্দেহ নেই ওদের টিকে থাকার সংগ্রাম ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার আসতে পেরেছে ওরা, সামনে এখনও পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ পড়ে আছে।

ধীরে ধীরে মাথা তুলে রানার দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। রানা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, তবে টলছে। তাকিয়ে আছে পুবদিকে, যেদিকে ওদের গন্তব্য, যেখানে পৌঁছুনো ওদের পক্ষে সম্ভব নয়।

কিছু জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড, কিন্তু এত অস্পষ্ট যে কি বলতে চায় বোঝা গেল না। নালার দু'দিকে তাকাল রানা, তোয়ালের ভেতর চোখ দুটোয় দিশেহারা

একটা ভাব ফুটল। 'আমি সুস্থ নই,' বিড়বিড় করল ও।

আবার মাথা তুলল মুরল্যাণ্ড। 'আমিও নই, বিশ কিলোমিটার পিছন থেকেই।'

'কসম খেয়ে বলতে পারি, পরিষ্কার দেখলাম...,' চোখ রগড়াল রানা, মাথা নাড়ছে। 'নিশ্চয়ই চোখের ভুল।'

জ্বলন্ত ধু-ধু মরুভূমির দিকে তাকাল মুরল্যাণ্ড। হিট ওয়েভের ভেতর পানির তৈরি চাদর ভাসতে দেখল সে। আরও এমন সব দৃশ্য কল্পনা করছে, মনে হলো পাগল হয়ে যাবে। মুখ ফিরিয়ে নিল।

'তুমিও দেখেছ?'

'চোখ বন্ধ করে,' অস্ফুটে বলল মুরল্যাণ্ড। 'একটা সেলুন, মেয়েরা নাচছে, হাতে ঠাণ্ডা বিয়ারের গ্লাস...।'

'আমি সিরিয়াস।'

'আমিও, তবে যদি ভেবে থাকো ওই লেকে থই থই করছে পানি, ভুলে যাও।'

'না,' বলল রানা। 'নালার ভেতর প্লেনটার কথা বলছি আমি।'

বন্ধুর মানসিক সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ বেড়ে গেল মুরল্যাণ্ডের। তবু মাথা তুলে তাকাল সে। নালার এক দিকের পারে হেলান দিয়ে রয়েছে কি ওটা? মরচে ধরেনি, গায়ে ধুলো-বালিও জমেনি, দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ওটা একটা প্লেনই বটে।

'দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'নাকি আমি পাগল হয়ে গেছি?'

'তাহলে আমিও,' চোখ মিটমিট করে বলল মুরল্যাণ্ড। 'হ্যাঁ, একটা প্লেনই তো!'

'তাহলে চোখের ভুল নয়।'

মুরল্যাণ্ডকে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। নালার কিনারা ধরে এগোল ওরা, সরাসরি বিধ্বস্ত প্লেনটার সামনে এসে দাঁড়াল দু'জন। ফিউজিলাজ আর উইং, অবিশ্বাস্য হলেও, পুরোপুরি অক্ষত রয়েছে। আইডেনটিফিকেশন নাম্বারও পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে। পারের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় অ্যালুমিনিয়াম প্রপেলার চুরমার হয়ে গেছে, এক্সপোজড সিলিণ্ডার সহ এঞ্জিন আংশিক পিছিয়ে এসে ঢুকে পড়েছে ককপিটে, ভাঙা মাউন্টিঙের ওপর কাত হয়ে আছে ওপর দিকে। ল্যাণ্ডিং গিয়ারও ভেঙে গেছে। এগুলো ছাড়া প্লেনটা অক্ষত। নালার ঢালে দাগও দেখল ওরা, ওই পথ ধরে ছুটে এসে বাড়ি খেয়েছে পারে। 'এখানে এটা কতদিন ধরে পড়ে আছে?'

'পঞ্চাশ...কি ষাট বছরের কম নয়,' জবাব দিল রানা।

'পাইলট?'

'বাঁচেনি,' বলল রানা। 'পোর্ট উইং-এর ভেতর তাকাও। একটা লাশের পা বেরিয়ে আছে।'

বাম উইং-এর দিকে এগোল মুরল্যাণ্ড। ফিতে বাঁধা একটা লেদার বুট দেখতে পেল সে, মান্ধাতা আমলের। ছেঁড়া খাকি প্যান্টেরও খানিকটা দেখা যাচ্ছে। 'সঙ্গ দিতে চাইলে ও কি কিছু মনে করবে? এলাকায় তার দখলেই খানিকটা ছায়া আছে।'

'আমিও আছি তোমার সঙ্গে,' বলল রানা। কিনারা থেকে নিচে পা দিল ও, পিঠটা হড়কে দিল ঢালের গায়ে, হাঁটু উঁচু করে পা দুটো ব্রেক হিসেবে ব্যবহার করছে।

ওর পাশেই রয়েছে মুরল্যাণ্ড, শুকনো নালার তলায় নেমে এল দু'জন সঙ্গে এক রাশ কাঁকর আর ধুলো নিয়ে। গুহার ভেতর দেয়ালচিত্র আবিষ্কার করার পর খিদে, ক্লান্তি ও পিপাসার কথা ভুলে গিয়েছিল ওরা, এবারও তাই ঘটল। ফিউজিলাজের গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে পাইলট, শরীরের নিচের দিকটা আংশিক বালিতে ঢাকা। উইং স্ট্রাট থেকে আনাড়ি হাতে বানানো একটা ক্রাচ বালির ওপর বেরিয়ে থাকা পায়ের পাশে পড়ে রয়েছে, ওই পায়ে বুট নেই। কাছাকাছি পড়ে রয়েছে প্লেনের কম্পাস, অর্ধেকটা বালির ভেতর গাঁথা।

পাইলটের লাশ সম্পূর্ণ অক্ষত। গনগনে তাপ আর কনকনে ঠাণ্ডা, দুইয়ে মিলে শরীরটাকে এমনভাবে মমিতে পরিণত করেছে যে বেরিয়ে থাকা ত্বক রঙ লাগানো চামড়ার মত মসৃণ লাগছে, চকচক করছে। মুখে এক ধরনের প্রশান্তির ছাপ স্পষ্ট। হাত দুটো পেটের ওপর এক করা, ষাট বছরেরও বেশি স্থির হয়ে আছে ওভাবে। একটা পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে ফ্লায়ার'স হেলমেট, সঙ্গে গগলস। দুটোই মান্ধাতা আমলের। কালো চুল কাঁধের নিচে নেমে এসেছে, ধুলা লেগে জট পাকিয়ে গেছে। 'মাই গড!' বিড় বিড় করল মুরল্যাণ্ড। 'মহিলা!'

'পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে বয়েস,' মন্তব্য করল রানা। 'মনে হচ্ছে খুব সুন্দরী ছিলেন।'

'না জানি কে।'

লাশটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল রানা, ককপিটের দরজার হাতলে বাঁধা অয়েলস্কিনে জড়ানো একটা প্যাকেট খুলল। ভেতর থেকে বেরুল পাইলটের লগ বুক। কাভার উল্টে প্রথম পৃষ্ঠাটা পড়ল। 'কিটি ম্যানক।'

'কিটি কি?'

'ম্যানক, বিখ্যাত মহিলা ফ্লায়ার। যতটুকু মনে পড়ছে, অস্ট্রেলিয়ান। তার নিখোঁজ হবার ঘটনা সে-সময় বিরাট আলোড়ন তুলেছিল, বিরাট একটা রহস্য বলে মনে করা হয়।'

'উনি এখানে এলেন কিভাবে?' লাশের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না মুরল্যাণ্ড।

'লণ্ডন থেকে কেপ টাউন, রেকর্ড-ব্রেকিং ফ্লাইটে ছিলেন। নিখোঁজ হবার পর ফ্রেঞ্চ মিলিটারি সাহারায় তল্লাশী চালায়, কিন্তু তাঁর বা প্লেনের কোন হদিস করতে পারেনি।'

'একশো কিলোমিটারের মধ্যে এটাই একমাত্র নালা। শুকনো লেকের মেঝেতে পড়লে আকাশ থেকে দেখা যেত।'

লগ বুকের পাতাগুলো দেখল রানা, বলল, 'উনিশশো একত্রিশ সালে দশই অক্টোবর ক্র্যাশ করে প্লেন। লাস্ট এণ্ট্রির তারিখ অক্টোবরের বিশ।'

'দশ দিন বেঁচে ছিলেন,' মুরল্যাণ্ডের বলার সুরে বিস্ময় ও প্রশংসা। 'বোঝা

যাচ্ছে, খুব শক্ত মহিলা ছিলেন।' উইং-এর ছায়ায় আড়মোড়া ভাঙল সে, ফাটা ও ফোলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সম্ভবত আমরাই প্রথম দেখলাম তাঁকে।'

রানা তার কথা শুনছে না। ওর মাথায় উদ্ভট একটা চিন্তা খেলছে। লগ বুকটা পকেটে রেখে দিয়ে অবশিষ্ট প্লেনটা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে ও। এঞ্জিনের দিকে খেয়াল দিল না, পরীক্ষা করছে ল্যাণ্ডিং গিয়ার। যতই শক্ত হোক স্ট্রাট, সংঘর্ষে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে ওগুলো, তবে হুইলের কোন ক্ষতি হয়নি, তেমন একটা ক্ষয়ে যায়নি টায়ারও। ছোট টেইল হুইলও ভাল অবস্থায় রয়েছে।

এরপর উইং পরীক্ষা করল রানা। পোর্ট উইং থেকে খানিকটা অংশ কেটে নিয়েছেন কিটি, তবে রাইট উইং পুরোপুরি অক্ষত। চিন্তায় মগ্ন, ককপিটের সামনে এক্সপোজড মেটাল প্যানেলের ওপর হাত রাখল ও, ঝাঁকি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সরে এল সেটা। গরম আগুন হয়ে আছে মেটাল প্যানেল। ফিউজিলাজের ভেতর ছোট একটা টুলবক্স পাওয়া গেল। অনেক কিছুর সঙ্গে তাতে ছোট একটা হ্যাক-স রয়েছে, আর রয়েছে হ্যাণ্ড পাম্প সহ টায়ার রিপেয়ারিং কিট। আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর মুরল্যাণ্ডের দিকে তাকাল ও। 'বিপদ কেটে গেছে।'

'মানে? তুমি কি ভাবছ এই প্লেন আকাশে তোলা যাবে?'

'না। ল্যাণ্ড ইয়টের কথা শুনেছ কখনও? প্লেন থেকে কিছু জিনিস নিয়ে একটা ল্যাণ্ড ইয়ট বানাবার কথা ভাবছি আমি।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল মুরল্যাণ্ড।

'অনেকটা আইস বোটের মত, পার্থক্য শুধু এই যে এটা চলবে চাকার ওপর।'

'কিন্তু পাল?'

'প্লেনের একটা ডানা।'

'আমরা দুর্বল, ডানা খুলে পাল বানাতে কয়েক দিন লেগে যাবে।' মাথা নাড়ল মুরল্যাণ্ড।

'না, কয়েক ঘন্টা। স্টারবোর্ড উইং অক্ষত রয়েছে, ফ্যাবরিকেরও কোন ক্ষতি হয়নি। ককপিট আর টেইলের মাঝখানে ফিউজিলাজের কিছু অংশ ব্যবহার করতে পারব আমরা, খোল হিসেবে। স্ট্রাট আর স্পার দিয়ে তৈরি করা যাবে এক্সটেনডেড রানার্স। তিনটে চাকা ব্যবহার করে ট্রাইসাইকেল গিয়ার সিস্টেম পেয়ে যাব। আর রিগিং ও টিলার সেটআপ-এর জন্যে যথেষ্ট কেবল আছে।'

'কিন্তু টুলস?'

'ককপিটে একটা টুলকিট আছে। দারুণ কিছু নয়, তবে কাজ চালানো যাবে।'

'অত কথা বুঝি না,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাই যে তোমার এ-সব কথা আমি স্বপ্নের ভেতর শুনছি না।'

মুরল্যাণ্ডের চুল ধরে সামান্য ঝাঁকাল রানা। 'জাগো হে, জাগো!' তারপর গম্ভীর সুরে বলল, 'হাত লাগাও কাজে। তুমি ডানাটা খোলো, আমি চাকা।'

*

ল্যাণ্ড সেইলিং নতুন কিছু নয়। দু'হাজার বছর আগে চীনারা ব্যবহার করত। ডাচরাও পিছিয়ে থাকেনি, তারা কাঠ বা বাঁশের তৈরি ওয়াগনে পাল লাগিয়ে সৈন্য পরিবহনের কাজে ব্যবহার করত। একসময় আমেরিকায় রেলপথের ওপর চাকা লাগানো ছোট আকৃতির গাড়ি চালানো হয়েছে, এঞ্জিনবিহীন, টেনে নিয়ে গেছে বাতাসে ফোলা পাল। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইউরোপিয়ানরা সৈকতে এগুলো খেলার সরঞ্জাম হিসেবে ব্যবহার করত।

ককপিটে পাওয়া টুলের সাহায্যে দুপুরের গরমে সহজ কাজগুলো সেরে নিল ওরা, ভারি কাজগুলো করল সূর্য অস্ত যাবার পর ঠাণ্ডা পরিবেশে। কাজ করার সময় নিজেদের সমস্ত কষ্ট ভুলে থাকল ওরা, কোন রকম বিশ্রাম নিল না। কিটি ম্যানক-এর লাশ একবারও ওরা ছুঁলো না, তবে এমন সুরে কথা বলল তিনি যেন বেঁচে আছেন।

তিনটে চাকার কোনটাতেই বাতাস নেই, ইনারটিউব খুলে ভেতরে বালি ভরল মুরল্যাণ্ড, তারপর আবার চাকার ভেতর ভরল সেগুলো। এরপর ক্ষতিগ্রস্ত ডানা থেকে রিব খুলে হুইলের জন্যে রানার এক্সটেনশন তৈরি করল সে। কাজটা শেষ করে স্পার কাটল হ্যাক-স' দিয়ে, ককপিটের পিছনে সেণ্টার ফিউজিলাজ যেখানে বাল্কহেডের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। একইভাবে টেইল সেকশন থেকেও কাটল। মিডসেকশন মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসার পর ককপিটের চওড়া অংশের প্রান্তটা উইং এক্সটেনশনের সঙ্গে জোড়া লাগাল, দুটো মেইন ল্যাণ্ডিং হুইলকে সাপোর্ট দেয়ার জন্যে। ফিউজিলাজের পিছন দিকে চাকাগুলো এখন পরস্পরের কাছ থেকে আড়াই মিটার দূরে রয়েছে। ল্যাণ্ড ইয়টের সামনের দিকে থাকবে প্লেনের টেইল সেকশন, জোড়া লাগাবার পর মান্ধাতা আমলের উড়োজাহাজের মত একটা আকৃতিও পাওয়া গেল। ইয়টের খোল তৈরি শেষ হয়েছে, এবার একটা রানার তৈরি করে টেইল হুইলের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে জোড়া লাগাতে হবে, যেটা খোলের সামনে তিন মিটার লম্বা হয়ে রয়েছে। মুরল্যাণ্ড নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, ওদিকে রানা তৈরি করছে পাল। ফিউজিলাজ থেকে উইং খুলে নেয়ার পর মুরল্যাণ্ডের সাহায্য চাইল ও, দু'জন মিলে ধরাধরি করে ডানাটাকে খাড়া ভাবে দাঁড় করাল। খোলের মাঝখানে আগেই একটা মাস্তুল তৈরি করা হয়েছে, স্ক্রু দিয়ে সেটার সঙ্গে জোড়া লাগানো হলো ডানা। ককপিটের ভেতর থেকে প্রচুর কেবল পাওয়া গেল, মুরল্যাণ্ডের সাইড রানারস ও মাস্তুলের বো বাঁধার কাজে লাগল। এরপর প্লেনের কণ্ট্রোল কেবলের সাহায্যে খোলের অভ্যন্তর ভাগ থেকে ফ্রণ্ট রানার পর্যন্ত বিস্তৃত একটা টিলার স্টিয়ারিং অ্যাপারেটাস তৈরি করল। সবশেষে উইণ্ড সেইল-এর জন্যে একটা রিগিং সিস্টেম।

ফিনিশিং টাচ হিসেবে পাইলটের সীটগুলো খুলে বসিয়ে দেয়া হলো ইয়টের ককপিটে। ইন্সট্রুমেণ্ট প্যানেল থেকে প্লেনের কম্পাসও খুলে নিল রানা, আটকে দিল টিলারের পাশে। সব কাজ শেষ হলো রাত তিনটের দিকে। মুরল্যাণ্ড বলল, 'এ উড়বে না!'

'উড়তে ওকে হবেও না,' বলল রানা। 'জমিনের ওপর দিয়ে আমাদেরকে শুধু

বয়ে নিয়ে যাবে।'

'ভেবে দেখেছ, নালা থেকে ওটাকে আমরা তুলব কিভাবে?'

'পঞ্চাশ মিটার সামনে তাকাও, ঢালটা তত খাড়া নয়। দু'জন মিলে টেনে তুলে ফেলব লেকের সারফেসে।'

'পঞ্চাশ মিটার হাঁটার ক্ষমতা আছে? তারপর ওটাকে টেনে তুলতে হবে। তোলার পর ওটা কাজ করবে কিনা তা-ও আমরা জানি না।'

'হালকা একটু বাতাস পেলেই হবে,' কোন রকমে শোনা যাচ্ছে রানার গলা, এতই দুর্বল।

'কত ওজন হবে বলো তো?'

'একশো ষাট কিলোগ্রাম বা তিনশো পঞ্চাশ পাউণ্ড।'

'কি নাম?'

'নাম মানে?'

'একটা নাম থাকা দরকার না?'

লাশটার দিকে তাকাল রানা। 'এই ইয়ট যদি আমাদের বাঁচায়, ওর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব আমরা। কিটি ম্যানক নামটা কেমন মনে হয় তোমার?'

'দারুণ।' বলে বসে পড়তে গেল মুরল্যাণ্ড, রানা তাকে বাধা দিল।

'কাজ শেষ না করে বসবে না,' বলল ও। 'বসলে আর উঠতে পারবে না। এসো, টেনে নিয়ে যাই।'

'কিভাবে টানব?'

'টো লাইন ধরে,' বলল রানা। 'দেখছ না, কেবল বেঁধে রেখেছি।'

অমানুষিক পরিশ্রম হলো, তবে শেষ পর্যন্ত নালা থেকে লেকের সারফেসে ল্যাণ্ড ইয়টকে তুলতে পারল ওরা। আর কি বরাত, ইয়ট ওপরে উঠে আসতেই শুরু হলো পুবমুখী বাতাস। ইয়ট যেন জ্যান্ত একটা প্রাণী, ওদেরকে ফেলে রেখেই ছুটল। পিছু ধাওয়া করল ওরা, লাফ দিয়ে উঠে পড়ল পিছনের সীটে। এত কষ্টের মধ্যেও না হেসে পারল না ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে থাকল ওরা সীটের ওপর। ভোরের বাতাসে হি হি করে কাঁপছে। বাতাসের বেগ ক্রমশ বাড়ছে, এক সময় মাথা তুলে তাকাল রানা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে ওদের ল্যাণ্ড ইয়ট। রানা আন্দাজ করল, স্পীড ঘণ্টায় আশি মাইলের কম নয়।

আধ ঘণ্টা পর কাতর চোখ মেলে সামনে তাকাল রানা, একটা কিছুর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চায়। সামনের দৃশ্যে কোন পরিবর্তন নেই, শুধু মরুর একঘেয়ে বিস্তার চোখে পড়ে। ওর ভয় লাগছে চিনতে না পারায় ট্র্যান্স-সাহারান ট্র্যাক পিছনে ফেলে এল কিনা। খুবই সম্ভব সেটা, কারণ বালির ওপর উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ক্ষীণ একটা রেখা ছাড়া আর কিছু নয় ওটা।

রানা কোন গাড়ি দেখতে পাচ্ছে না। ঢেউ খেলানো বালিয়াড়ি শুরু হয়েছে আবার। সীমান্ত পেরিয়ে আলজিরিয়ায় ঢুকে পড়েনি তো?

আসলে ট্র্যাকটা সম্পর্কে রানার কোন ধারণা নেই। প্রচলিত অর্থে যাকে রাস্তা বলা হয়, ট্র্যান্স-সাহারান ট্র্যাক সেরকম কিছু নয়। এই পথ হাজার বছর ধরে

বেদুইনরা ব্যবহার করেছে, আধুনিক যুগেও ব্যবহার করা হচ্ছে, তবে ভ্রমণকারীদের সংখ্যা এত কম যে তাদের দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বছরে এক-আধবার সামরিক কনভয় দেখা যায়, কিংবা ট্যুরিস্টদের দু'একটা কার। ওদের ভাগ্য ভাল হলে পশুর ছড়ানো হাড় দেখতে পাবে ওরা, কিংবা পরিত্যক্ত কোন গাড়ি, অথবা চার কিলোমিটার পর পর বসানো তেলের পুরানো ড্রাম– যদি না সেগুলো গাওয়ে নিয়ে বিক্রি করে দিয়ে থাকে বেদুইনরা।

ল্যাণ্ড ইয়ট বানাবার পর এই প্রথম মানুষের তৈরি কোন জিনিস দেখতে পেল ওরা। ডানদিকে, দিগন্তের কাছে। দেখতে পেল মুরল্যাণ্ড। শুকনো লেক থেকে উঠে আসার পর পিছনে ধুলো নেই, বাতাস একদম পরিষ্কার। একটা ফোক্সওয়াগেন বাস, সমস্ত পার্টস খুলে নেয়া হয়েছে। এটা দেখেই বুঝে নিতে হলো, ট্র্যাকটা খুঁজে পেয়েছে ওরা। ওখান থেকে উত্তর দিকের পথ ধরল।

সামনে এবার নরম বালি, বালিতে প্রচুর কাঁকর। দশ মিনিট পর দিগন্তে একটা ড্রাম দেখল ওরা। ওরা যে ট্র্যাক ধরে এগোচ্ছে, আর কোন সন্দেহ নেই।

মুরল্যাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তাকে ধাক্কা দেয়ার ইচ্ছে হলেও শক্তি পাচ্ছে না রানা। খানিক পরপর ওর চোখেও সব কিছু কালো লাগছে, জানে সে-ও বেশিক্ষণ টিকবে না। একটা আওয়াজ শুনে মনে হলো এঞ্জিন, কিন্তু কিছু দেখতে না পাওয়ায় ভাবল কান দুটো ওর সঙ্গে দুষ্টামি করছে। তারপরও আওয়াজটা বাড়ছে। খুব ভারি কোন ডিজেল এঞ্জিন হবে। তারপর এয়ার হর্নের বিকট শব্দ হলো। দুর্বল ভঙ্গিতে মাথাটা একদিকে ঘোরাল রানা। ব্রিটেনের তৈরি বিরাট একটা বেডফোর্ড ট্রাক ট্রেইলর নিয়ে এগিয়ে আসছে, আরব ড্রাইভার হাঁ করে তাকিয়ে আছে ল্যাণ্ড ইয়টের দিকে। পাশ কাটাবার সময় গতি কমাল সে। 'আপনাদের কি সাহায্য দরকার?'

কোন রকম মাথা ঝাঁকাল রানা। দুর্বল শরীরে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল কেবলে টান দিল ও, বাঁক ঘোরার সময় কাত হয়ে পড়ে গেল ল্যাণ্ড ইয়ট। ট্রাক থামাল ড্রাইভার, ছুটে এল ওদের সাহায্যে।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে রানা, তবে একটু পরই আবার চোখ মেলল। দেখল তার মুখে পানি ঢালছে ড্রাইভার। হাঁ-টা বড় করল ও, ঢক ঢক করে পানি খেতে শুরু করল। একেই বলে মিরাকল। এক মিনিট আগে মারা যাচ্ছিল ওরা, পেট ভরে পানি খাবার পর মনে হলো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

পানির ছোঁয়া পেয়ে সচেতন হলো মুরল্যাণ্ডও। ওদেরকে শুকনো খেজুর আর সল্ট ট্যাবলেট খেতে দিল ড্রাইভার। লোকটার চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত, মাথায় বেসবল ক্যাপ। চেহারা থেকে কৌতূহল উপচে পড়ছে। 'আপনারা এই মেশিন নিয়ে গাও থেকে আসছেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ফোর্ট ফরো,' মিথ্যে কথা বলল। এখনও জানা নেই ওরা আলজিরিয়ায় রয়েছে কিনা। ড্রাইভার সাহায্য করলেও বিশ্বাস করা যায় না তাকে, যদি শোনে যে তেবেজা থেকে পালিয়েছে তাহলে হয়তো পুলিসের হাতে তুলে দেবে। 'আমরা ঠিক কোথায় রয়েছি?'

'কেন, আলজিরিয়ায়। আপনি কি ভেবেছিলেন?'

'মালি না হলেই বাঁচি।'

মুখ কালো করল ড্রাইভার। 'মালির লোকেরা ভাল নয়। বাজে সরকার। ওরা শুধু মানুষ মারতে জানে।'

'টেলিফোন কত দূরে?' জানতে চাইল রানা।

'আদরার এখান থেকে তিনশো পঞ্চাশ কিলোমিটার।'

'ছোট কোন গ্রাম?'

'না, বড় শহর। এয়ারফিল্ড আছে, রেগুলার প্যাসেঞ্জার সার্ভিস আছে।'

'আপনি কি ওদিকেই যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, গাও থেকে ক্যানড গুডস নিয়ে রওনা হয়েছি, আলজিয়ার্স ফিরে যাব।'

'আদরার পর্যন্ত আমাদেরকে লিফট দেয়া যায়?'

'উইথ প্লেজার।'

'বন্ধু,' হাসল রানা, 'আপনার নামটা তো জানা হলো না।'

'খালিদ মীর।'

তার সঙ্গে করমর্দন করল রানা, বলল, 'ভাই মীর, আপনি জানেন না, আমাদের প্রাণ বাঁচিয়ে আপনি আসলে আরও কয়েকশো লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছেন।'

দুই

'ওরা বেরিয়ে এসেছে!' জর্জ রেডক্লিফকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের অফিসে ঢুকে পড়ল ল্যারি কিং।

ফাইল থেকে মুখ তুললেন অ্যাডমিরাল। 'বেরিয়ে এসেছে মানে?'

'রানা ও মুরল্যাণ্ড, সীমান্ত পেরিয়ে আলজিরিয়ায় পৌঁচেছে ওরা।'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!' হেসে উঠলেন অ্যাডমিরাল। 'তোমরা জানলে কিভাবে?'

'আদরার, একটা মরু শহর থেকে ফোন করেছেন ওঁরা,' বললেন রেডক্লিফ। 'একটা কমার্শিয়াল ফ্লাইট ধরে আলজিয়ার্সে চলে আসছেন। ওখানে আমাদের দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

'ফোন সিস্টেম ক্রটি আছে, শেষ দিকে রানার কথা আমি বুঝতে পারিনি,' বলল কিং। 'তবে মনে হলো, আপনাকে একটা স্পেশাল ফোর্স টীমের ব্যবস্থা করতে বলেছে, ওর সঙ্গে মালিতে যাবে তারা।'

'কোন ব্যাখ্যা দেয়নি?'

'অস্পষ্ট। বলল, সোনার একটা খনি থেকে শিশু আর মহিলাদের উদ্ধার করতে হবে।'

'মালি থেকে ওরা পালাল কিভাবে, বলেনি কিছু?'

'পাগলামি মনে হলে আমাকে দোষ দেবেন না, অ্যাডমিরাল। মনে হলো রানা যেন বলতে চাইছিল, কিটি ম্যানিং বা ম্যানক নামে এক মহিলার সঙ্গে ইয়টে চড়ে

মরু পেরিয়েছে ওরা।'

চেয়ারে হেলান দিলেন অ্যাডমিরাল, পরক্ষণে শিরদাঁড়া খাড়া করলেন। 'কি বললে? কিটি ম্যানক?'

'হ্যাঁ, তাই তো মনে হলো।'

'বিশের দশকে ওই নামে একজন বিখ্যাত এভিয়েটর ছিলেন, অনেকগুলো লং ডিসট্যান্স স্পীড রেকর্ড গড়ার পর সাহারায় নিখোঁজ হয়ে যান,' ব্যাখ্যা করলেন হ্যামিলটন। 'সেটা সম্ভবত উনিশশো একত্রিশ সালের কথা।'

'তার সঙ্গে রানা ও মুরল্যাণ্ডের কি সম্পর্ক?'

'কি করে বলি!'

হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে রেডক্লিফ বললেন, 'ইতিমধ্যে যদি প্লেনে চড়ে থাকে ওরা, দেড় ঘণ্টা পর আবার ওদের গলা শুনতে পাব বলে আশা করা যায়।'

'কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টকে বলো আলজিয়ার্স দূতাবাসের সঙ্গে আমাদের ডাইরেক্ট লাইনটা যেন সারাক্ষণ খোলা রাখে,' নির্দেশ দিলেন হ্যামিলটন। 'রেড টাইড কনটামিনেশন সম্পর্কে রানা যদি কোন ভাইটাল ডাটা দেয়, চাই না নিউজ মিডিয়া জেনে ফেলুক।'

রানার কল এল নুমার ওয়ার্ল্ডওয়াইড কমিউনিকেশনস নেটওঅর্কের মাধ্যমে, ফোন কনসোলের সামনে সে-সময় ড. অজিত রায় সহ বাকি সবাই উপস্থিত। স্পীকার সিস্টেম চালু থাকায় শুনতে কারও অসুবিধে হচ্ছে না। গত নব্বুই ঘণ্টায় যে-সব প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে, একে একে সবগুলোরই উত্তর পাওয়া গেল রানার এক ঘণ্টা মেয়াদী রিপোর্টে। অনেকেই নোট নিচ্ছেন।

রানা শুরু করল নাইজার নদীতে ওদের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে। জর্জ রেডক্লিফকে বিদায় দেয়ার পর ফোর্ট ফরো আবিষ্কার করল ওরা। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ড. সুনারিল ও তাঁর টীমের বিজ্ঞানীরা বেঁচে আছেন, এবং তেবেজার স্বর্ণখনিতে ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করছেন, শুনে হতভম্ব হয়ে পড়ল সবাই। রানা জানাল, ওদের সঙ্গে বন্দী জীবন যাপন করছেন ফ্রেঞ্চ এঞ্জিনিয়াররাও, তাদের স্ত্রী ও বাচ্চাকাচ্চা সহ। বন্দীদের মধ্যে বেশ কিছু বিদেশী লোকও আছে, আর আছে জেনারেল ভিনসেন্টের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা। রিপোর্টের শেষ দিকে কিটি ম্যানক আর তাঁর প্লেনের ব্যাখ্যা দিল রানা। ল্যাণ্ড ইয়ট কিভাবে তৈরি করা হলো শুনে শ্রোতারা না হেসে পারলেন না।

বোঝা গেল কেন রানা সশস্ত্র ফোর্স নিয়ে মালিতে ফিরে যেতে চাইছে। তেবেজা গোল্ড মাইনে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, অত্যাচারিত লেবারদের উদ্ধার করতে হবে। তবে শ্রোতারা চমকে উঠল ফোর্ট ফরোর গোপন নিউক্লিয়ার অ্যাণ্ড টক্সিক প্রজেক্টের কথা শুনে। রানা ব্যাখ্যা করল, সোলার ডিসপোজাল অপারেশন আসলে লোক-দেখানো ব্যাপার মাত্র, নিউক্লিয়ার বর্জ্য পুঁতে ফেলার জন্যে ওটা একটা কাভার। রানার রিপোর্টে স্যাভয় গাসকিল ও পিয়েত্রো ভিনসেন্টের সম্পর্কেও ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রশ্নোত্তর পর্বে ড. অজিত রায় জানতে চাইলেন, 'তারমানে আপনি বলতে

চাইছেন ফোর্ট ফরো রেড টাইড কনটামিনেশনের উৎস?'

'গ্রাউণ্ডওয়াটার হাইড্রোলজি সম্পর্কে আমি বা ববি এক্সপার্ট নই,' বলল রানা। 'তবে টক্সিক ওয়েস্ট না পুড়িয়ে মরুভূমির নিচে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। ওগুলো যে মাটির নিচের পানির সঙ্গে মিশছে, এ-ও পরিষ্কার। ওখান থেকে প্রাচীন একটা রিভারবেড ধরে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে স্রোতটা, গিয়ে পড়ছে নাইজার নদীতে।'

'মাটির নিচে টক্সিক ওয়েস্ট জমা করতে হলে বিশাল গর্ত তৈরি করতে হয়েছে। স্যাটেলাইট ফটোতে ব্যাপারটা ধরা পড়েনি কেন? এনভায়রনমেন্ট ইন্সপেক্টররাই বা কি করছিল?'

'সোলার রিয়্যাক্টর তৈরি করার সময় গর্তটা খোঁড়া হয়নি,' জবাব দিল রানা। 'ওটা বানানো হয়েছে রেললাইন বসাবার সময়। তার আগে বিশাল একটা ভবন তৈরি করা হয়, গর্ত তৈরির অপারেশন গোপন রাখার জন্যে। মৌরিতানিয়া থেকে নিয়ে আসা হয় নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট, গর্ত থেকে তোলা মাটি আর পাথর ওই ট্রেনে করেই সরিয়ে ফেলা হয়। তাছাড়া, গর্ত তৈরি করার সময় গাসকিল লাইমস্টোন গুহা পেয়ে যান অনেকগুলো, সেগুলো কাজে লাগাচ্ছেন।'

'কিন্তু আমরা চেঁচামেচি করলেই ফোর্ট ফ্রোয় তালা পড়বে না,' বললেন রেডক্লিফ। 'আমাদের হাতে নিরেট প্রমাণ থাকতে হবে। গাসকিল অত্যন্ত প্রভাবশালী মানুষ, ফ্রেঞ্চ সরকারের অনেক মন্ত্রী-মিনিস্টারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আছে।'

'শুধু ফ্রেঞ্চ সরকারের নয়, তার লোক আছে ব্রিটেন, আমেরিকা ও রাশিয়ান সরকারেও,' বলল রানা। 'এই অপরাধে সবাই ওরা জড়িত। ওদের নিউক্লিয়ার ওয়েস্টই তো মাটির তলায় লুকাচ্ছেন গাসকিল।' একটু থেমে প্রসঙ্গ বদল করল ও, 'তবে এই মুহূর্তে ফোর্ট ফরো নিয়ে আমি ভাবছি না। আমার প্রথম উদ্বেগ তেবেজোয় যারা বন্দী হয়ে আছে তাদের নিয়ে। অ্যাডমিরাল, বন্দীদের মধ্যে আমেরিকানরাও আছে। আপনি বরং সরাসরি আপনাদের প্রেসিডেন্টের সাহায্য চান।'

অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন গম্ভীর সুরে বললেন, 'দু'একজন আমেরিকানকে উদ্ধার করার জন্যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ফোর্স পাঠাতে রাজি হবেন না। এর আগের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। তোমাদের কথা বলে আমি সাহায্য চেয়েছিলাম।'

'তাহলে জাতিসংঘকে বলুন।'

'দেখি কি করা যায়,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন।

লাইব্রেরীটায় বইয়ের সংখ্যা কয়েক হাজার, পালিশ করা মেহগনি শেলফে সাজানো। পারশিয়ান কার্পেটে ছড়িয়ে আছে আরও তিনশো বই। ডেস্কে রয়েছে প্রাচীন পাণ্ডুলিপির স্তূপ, ফলে বিউ মরটনকে দেখা যাচ্ছে না। সিল্ক পা'জামা আর সোনালি আলখেল্লা পরে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে সে, সামনে খোলা সতেরো শতকের একটা পাণ্ডুলিপি, টেলিফোনে কথা বলছে রানার সঙ্গে। 'কোত্থেকে বলছ

হে?' জানতে চাইল সে।
'আলজিয়ার্স।'
'কি করছ ওখানে?'
'অনেক কিছু, তার মধ্যে একটা হলো পুরানো একটা বিধ্বস্ত জাহাজ খুঁজছি।'
'উত্তর আফ্রিকার মাঝখানে?' হেসে উঠল মরটন।
'না, সাহারা মরুভূমিতে।'

রানা যে কৌতুক করার মানুষ নয়, মরটন তা জানে। প্রাচীন জাহাজ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ সে, এ বিষয়ে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছে। পেশাগত সূত্রেই রানার সঙ্গে তার পরিচয়। 'খুলে বলো।'

'এক আমেরিকান ভবঘুরে 'টেক্সাস' নামে একটা আমেরিকান আয়রনক্ল্যাড খুঁজছেন সাহারায়। কসম খেয়ে বলছেন যে এখন শুকিয়ে গেছে এমন একটা নদী ধরে মরুভূমিতে চলে আসে ওটা, বালির রাজ্যে হারিয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, কনফেডারেট ট্রেজারির সোনা ছিল ওটায়।'

'গাঁজা খায়? লোকটা?'

'তাঁর আরও দাবি, টেক্সাসে লিংকন ছিলেন।'

'এ গাঁজা নয়, হেরোইন।'

'শুনতে যতই অবিশ্বাস্য লাগুক, কেন যেন তার কথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার,' বলল রানা। 'কিছু প্রমাণও পেয়েছি।'

'প্রমাণ?'

'একটা গুহার কিছু দেয়ালচিত্র। তাতে কনফেডারেট ডিজাইনের যুদ্ধজাহাজের ছবি রয়েছে। আরেকটা রেফারেন্স পেয়েছি, কিটি ম্যানক-এর লগ বুকে। তাঁর প্লেনে ছিল।'

'এক সেকেণ্ড। কার প্লেনে বললে?'

নামটা আবার উচ্চারণ করল রানা, তারপর বলল, 'আমি আর মুরল্যাণ্ড তাঁর লাশ ও বিধ্বস্ত প্লেনটা দেখতে পাই, মরুভূমি পেরুবার সময়।'

'কংগ্রাচুলেশন্স! এভিয়েশন জগতের সবচেয়ে বিখ্যাত রহস্যটার তাহলে মীমাংসা করেছ তোমরা!'

'নেহাতই ভাগ্যগুণে।'

'বিশ মিনিট পর ফোন করো,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল মরটন।

'হ্যাঁ, টেক্সাস,' বিশ মিনিট পর মরটনের প্রশ্নের উত্তরে বলল রানা। 'কিছু পেলে?'

'আয়রনক্ল্যাড টেক্সাসকে আঠারোশো পঁয়ষট্টি সালে পানিতে নামানো হয়, যুদ্ধ শেষ হবার এক মাস আগে। একশো নব্বুই ফুট লম্বা, চল্লিশ ফুট চওড়া। জোড়া এঞ্জিন, ছ'ইঞ্চি আর্মার, স্পীড চোদ্দ নট।'

'সময়ের তুলনায় খুব শক্তিশালী জাহাজ ছিল, বলতে হবে। ইতিহাসটা কি?'

'ছোট্ট,' জবাব দিল মরটন। 'যুদ্ধে একবারই অংশগ্রহণ করে, জেমস রিভারে। ইউনিয়ন নেভী বহরকে পাশ কাটিয়ে আটলান্টিকে পালায়, তারপর আর দেখা যায়নি।'

'নিখোঁজ হওয়াটা তাহলে বাস্তব ঘটনা,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, বাস্তব ঘটনা। তবে ধারণা করা হয় আটলান্টিকে ডুবে গেছে। ওটাকে সাগর পাড়ি দেয়ার মত করে তৈরি করা হয়নি।'

'সাগর পাড়ি দিয়ে নাইজার নদীতে ঢুকতে পারে না, বলছ?'

'খোলা সাগর পাড়ি দিতে চেষ্টা করেছিল আটলান্টা নামে একটা আয়রনক্ল্যাড, সেটাও নিখোঁজ হয়ে যায়।'

'অথচ বৃদ্ধ প্রসপেক্টর বলছেন, ফ্রেঞ্চ কলোনিস্ট ও স্থানীয় লোকজন লোহার তৈরি একটা দানবের গল্প শুনিয়ে গেছেন– পাল ছাড়া নাইজার নদী ধরে এগোয়।'

'তুমি চাও ব্যাপারটা আমি চেক করে দেখি?'

'সত্যি চেক করবে?'

'আমি বাধ্য,' মরটন বলল। 'আরও একটা কারণে টেক্সাস আমাকে বিস্মিত করেছে।'

'আরও একটা কারণ মানে?'

'সিভিল ওঅর-এর সময়কার যুদ্ধ জাহাজের তালিকা পরীক্ষা করছিলাম,' ধীরে ধীরে বলল মরটন। 'টেক্সাসের নামটা পর্যন্ত নেই সেখানে। কারা যেন চেয়েছে ওটার কথা ভুলে যাওয়া হোক।'

আলজিয়ার্সের মার্কিন দূতাবাস থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিল ওরা। রাজধানীর প্রধান সড়কে অনেকগুলো মসজিদ রয়েছে, সবগুলো ইসলামী স্থাপত্যরীতির উৎকৃষ্ট নমুনা, ইচ্ছে থাকলেও ভাল করে দেখার বা ভেতরে ঢোকার সুযোগ পাওয়া গেল না। শহরের বাইরে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট একটা জায়গায় ট্যাক্সি ছেড়ে দিল ওরা। খানিক পর ওখানে একটা ফ্রেঞ্চ এয়ার ফোর্স স্টাফ কার পৌঁছুল, পুজো ডিজেল সিডান। ড্রাইভারের পরনে ইউনিফর্ম নেই, সে কিছু বলার আগেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা, ব্যাক সীটে ওর পাশে মুরল্যাণ্ডও বসল। দরজা বন্ধ হবার আগেই আবার ছুটতে শুরু করল গাড়ি।

দশ কিলোমিটার দূরে মিলিটারি এয়ারফিল্ডের মেইন গেটে থামল পুজো। গেট খুলে দিয়ে স্যালুট ঠুকল গার্ড, গাড়ির ফ্ল্যাগটা আগেই লক্ষ করেছে। গেট পেরিয়ে এক সারি মিরেজ-এর সামনে চলে এল গাড়ি। সারির শেষ মাথায় একটা এএস-থ্রীথ্রীটু সুপার পুমা হেলিকপ্টার রয়েছে, এয়ার-টু-সারফেস মিসাইল বহন করতে সক্ষম হলেও চেহারা দেখে মনে হবে গোবেচারা ভালমানুষ। ওদের গাড়ি থামেনি, ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে চলে এল আরেক প্রস্থ রানওয়েতে। এখানে শুরু হলো অপেক্ষার পালা। মুরল্যাণ্ডের যা স্বভাব, সুযোগ পেলেই চোখ বুজে ঝিমোয়, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটল না। রানা ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের পাতা ওল্টাচ্ছে।

পনেরো মিনিট পর পশ্চিম রানওয়েতে বড় একটা এয়ারবাস নামল। প্লেনটা থামতে পুজোর ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ল। চোখ রগড়ে সিধে হলো মুরল্যাণ্ড, হাতের কাগজটা ভাঁজ করল রানা।

প্লেনটা ধূসর মরুর সঙ্গে মিল রেখে রঙ করা হয়েছে, গায়ে কোন মার্কিং নেই। ডেজার্ট কমব্যাট ফেটিগ পরা এক মহিলা নামল প্লেন থেকে, আস্তিনে

জাতিসংঘের প্রতীক চিহ্ন। পুজো থামতে সে-ই দরজা খুলল। 'আমার সঙ্গে আসুন, প্লীজ,' ইংরেজিতে বলল সে, স্প্যানিশ সুর। পুজো চলে গেল। ইউএন ট্যাকটিকাল টীমের সদস্যা ওদেরকে পথ দেখিয়ে প্লেনের ভেতর তুলে আনল। লোয়ার কার্গো বে হয়ে সরু একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো ওদেরকে, সিঁড়িটা সরাসরি মেইন কেবিনে পৌঁচেছে।

থেমে ঘাড় ফেরাল মুরল্যাণ্ড, একসারিতে তিনটে আর্মারড পার্সোনেল ক্যারিয়ার দেখল সে, বেঁটে ও মোটা, উচ্চতায় দু'মিটারও হবে না। তারপর অবাক হয়ে তাকাল ভারি অস্ত্রে সজ্জিত আরেকটা বাহনের দিকে, যেটাকে ডিউন বাগি বলা হয়। তার জানা নেই, এই বাহনটাই গাও এয়ারপোর্ট থেকে উদ্ধার করেছিল রেডক্লিফকে। 'রাস্তা নেই এমন কোথাও যদি রেস হয়, আমি তোমাকে এটা ব্যবহার করার পরামর্শ দেব,' রানাকে বলল সে। 'কোন প্রতিযোগী তোমার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না।'

রানা হাসল। মেইন কেবিনে ঢোকার পর ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল একজন অফিসার। 'ক্যাপটেন জুয়ান ডিগো। কর্নেল মিরাক আপনাদের জন্যে প্ল্যানিং রূমে অপেক্ষা করছেন।'

রানা দেখল কেবিনের ভেতর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন পুরুষ ও মহিলা বিভিন্ন ধরনের ইকুইপমেণ্ট ও উইপন জোড়া লাগাচ্ছে বা পরিষ্কার করছে। ক্যাপটেন ব্যাখ্যা করল, সবাই ওরা জাতিসংঘের বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্র থেকে এসেছে। নিজ নিজ দেশের স্পেশাল ফোর্স থেকে ট্রেনিং নেয়া আছে সবার। সবাই স্বেচ্ছাসেবক, জাতিসংঘের ট্যাকটিকাল টীমে যোগ দিতে পেরে গর্বিত। অনেকেই স্থায়ী, কেউ কেউ একবছর কাজ করবে। চেহারা আর হাব-ভাবই বলে দেয়, প্রত্যেকে প্রফেশনাল।

ক্যাপটেন ওদেরকে প্রথমে প্লেনের কমাণ্ড সেণ্টারে নিয়ে এল। চারদিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জামে বোঝাই। একজন অপারেটরকে দেখা গেল কমিউনিকেশন ইকুইপমেণ্ট মনিটর করছে, আরেকজন আসন্ন তেবেজা অভিযান সংক্রান্ত প্রোগ্রাম রচনা করছে কমপিউটরে।

ডেস্কের পিছন থেকে উঠে এসে রানা ও মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে করমর্দন করলেন কর্নেল মিরাক। জাতিসংঘের ইণ্টেলিজেন্স সার্ভিস থেকে ওদের সম্পর্কে জেনেছেন তিনি, ওদের সাফল্য ও সুনাম সম্পর্কে সচেতন। তেবেজা থেকে ওদের পালিয়ে আসার কাহিনীও ইতিমধ্যে শুনেছেন তিনি। নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে আপনাদের গাইডেন্স ছাড়া এ অভিযান সফল হবার সম্ভাবনা কম।'

নিজের ও বন্ধুর পরিচয় দিল রানা, তারপর বলল, 'আমরা দেরি করছি কেন, কর্নেল?'

ক্যাপটেনকে নির্দেশ দিলেন কর্নেল, 'চীফ পাইলটকে টেক-অফ করার প্রস্তুতি নিতে বলো। আকাশে উঠেই প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করব আমরা।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'ফ্লাইং টাইম চার ঘণ্টার কিছু বেশি। বন্দীদের বিশ্রাম

নেয়ার সময়টায় হামলা করতে চাইছি আমি। শুধু তখনই সবাইকে এক জায়গায় পাওয়া যাবে। আমরা ল্যাণ্ড করব রাতে। সব ব্যাখ্যা করছি, তার আগে আপনারা বসুন, প্লীজ।'

রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে প্লেন। টেক-অফ করার সময় এঞ্জিনের প্রায় কোন শব্দই হচ্ছে না। ব্যাপারটা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলল রানা।

'টারবাইন এগজস্টের জন্যে স্পেশাল মডিফায়েড সাইলেন্সার ব্যবহার করা হচ্ছে,' জবাব দিলেন কর্নেল। 'ল্যাণ্ড করার সময় প্লেনে কোন আলো জ্বলবে না।'

'অন্ধকারে কিভাবে ল্যাণ্ড করবেন?'

'তেবেজা এয়ারস্ট্রিপে আমার চারজন লোক প্যারাশুট নিয়ে নামবে, মি. রানা। আমাদের পাইলটকে গাইড করার জন্যে রানওয়েতে ইনফ্রারেড লাইট সাজিয়ে রাখবে ওরা।'

জানা গেল, অভিযান বা হামলায় অংশ নেবে আটত্রিশ জন যোদ্ধা, সঙ্গে দু'জন ডাক্তার থাকবেন। ল্যাণ্ড করার পর প্লেনের পাহারায় থাকবে ছয়জন যোদ্ধা। মেডিকেল টীম মূল দলের সঙ্গে খনিতে ঢুকবে, বন্দীদের চিকিৎসা করার জন্যে। কর্নেল জানালেন, বিদেশী বন্দীরা সংখ্যায় চল্লিশজন হলে এই প্লেনে করেই সরিয়ে আনা যাবে। মালিয়ান রাজবন্দীরা আপাতত ওখানেই থাকবে, খনির খাদ্যভাণ্ডার খুলে দেয়া হবে তাদের জন্যে, গার্ডদের কাছ থেকে উদ্ধার করা অস্ত্রও থাকবে তাদের হাতে।

রানাকে চিন্তিত দেখাল, বলল, 'জেনারেল ভিনসেন্ট ওদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারেন।'

'আমার কিছু করার নেই,' কর্নেল জানালেন। 'আমি মহাসচিবের নির্দেশ পালন করছি।'

তেবেজায় ল্যাণ্ড করার এক ঘণ্টা আগে কর্নেল মিরাক তাঁর লোকজনকে মেইন কেবিনে জড়ো করলেন। ওদেরকে ব্রিফ করল রানা। খনির কোথায় গার্ড আছে, তাদের সংখ্যা ও অস্ত্র, বন্দীদের কাহিল অবস্থা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করল ও। এরপর মুরল্যাণ্ডের পালা, বড় আকারের স্কেচ এঁকে খনির স্তরগুলো দেখাল সে। ইউএন ট্যাকটিকাল টীমকে চার ইউনিটে ভাগ করলেন কর্নেল, প্রত্যেক ইউনিটকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড টানেলের একটা করে ম্যাপ দেয়া হলো, কমপিউটরে ছাপা হয়েছে। সবশেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন তিনি, 'এত কম তথ্য নিয়ে এরকম বিপজ্জনক মিশনে আগে কখনও অংশ নিইনি আমরা। ম্যাপে শ্যাফট আর টানেলের মাত্র বিশ ভাগ দেখানো হয়েছে। প্রথমেই অফিস আর গার্ডদের কোয়ার্টার দখল করে ফেলতে হবে। প্রতিরোধ ব্যর্থ করার পরপরই বন্দীদের নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের। ভেতরে ঢোকার চল্লিশ মিনিট পর গেটে মিলিত হব আমরা সবাই। কোন প্রশ্ন?'

ভিড় থেকে একটা হাত উঁচু হলো। 'চল্লিশ মিনিট কেন, কর্নেল?'

'তার বেশি দেরি করলে কাছাকাছি মালিয়ান এয়ার ফোর্স বেস থেকে ফাইটার চলে আসতে পারে।'

আরেকটা হাত উঁচু হলো। 'কিন্তু আমরা কেউ যদি খনির ভেতর পথ হারিয়ে ফেলি?'

'তাকে ফেলে চলে আসব আমরা। আর কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

'যে সোনা উদ্ধার করা হবে, আমরা কি তার কিছু ভাগ পাব?' প্রশ্নটা শুনে হেসে উঠল সবাই।

'মিশন শেষ হলে আপনাদের সবাইকে সার্চ করা হবে, কাপড় খুলে।' ক্যাপটেনের দিকে তাকালেন কর্নেল। 'যার কাছে যত সোনাই পাওয়া যাক, সব সুইটজারল্যাণ্ডে আমার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।'

'মেয়েদেরকেও কি ওই একইভাবে সার্চ করা হবে?' সকৌতুকে জানতে চাইল এক সুন্দরী।

হাসলেন কর্নেল। 'হ্যাঁ, যদি তাদেরকে আমার পছন্দ হয়।'

স্যাটেলাইট থেকে ছবি নিয়ে নেভিগেশনাল কমপিউটর অটোমেটিক পাইলটকে কোর্স জানিয়ে দিল, অটোমেটিক পাইলট ইউএন এয়ারবাসকে নিয়ে চলে এল তেবেজা মালভূমিতে। কর্নেল মিরাকের চারজন কমাণ্ডো লাফ দিল অন্ধকার শূন্যে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল, উত্তর দিকে সরে গিয়ে বিশ মিনিট চক্কর দিল পাইলট।

এয়ারস্ট্রিপে নিরাপদে নামল ওরা। প্লেনের রিয়ার র‍্যাম্প নিচু হলো, ভেহিকেলগুলো লাইন দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে, সামনে রয়েছে অ্যাটাক ডিউন বাগি। সবার শেষে নামল ছয়জনের একটা সিকিউরিটি টীম, প্লেনটাকে ঘিরে ফেলল তারা। মেইন ফোর্স আগেই উঠে পড়েছে পারসোনেল ক্যারিয়ারে। প্যারাশুট টীমের লীডার ছুটে এসে রিপোর্ট করল, 'গোটা এলাকা খালি, স্যার। গার্ড বা ইলেকট্রনিক সিকিউরিটির কোন চিহ্ন নেই।'

'কোন রকম ফ্যাসিলিটি?' প্রশ্ন করলেন কর্নেল।

'শুধু একটা ছোট বিল্ডিং, ভেতরে টুলস, ডিজেল ড্রাম আর এয়ারক্রাফট জেট ফুয়েল। আমরা কি ওটা উড়িয়ে দেব, স্যার?'

'খনি থেকে আমরা বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।' রানার হাতে একজোড়া নাইট-ভিশন-গগলস ধরিয়ে দিলেন কর্নেল, তারপর ইঙ্গিতে অ্যাটাক ভেহিকেলের ড্রাইভিং সীটটা দেখালেন। 'আপনি মাইনের পথ চেনেন। পথ দেখান, প্লীজ।' ক্যাপটেন জুয়ান ডিগোর দিকে তাকালেন তিনি। 'পিছনের ক্যারিয়ারে থাকছ তুমি। বিশেষ করে আকাশের দিকে লক্ষ রাখবে। আমি চাই না কোন ফাইটার পিছন থেকে এসে কনভয়ের ওপর বোমা ফেলুক।'

ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল পিছনের পারসোনেল ক্যারিয়ারে উঠছে মুরল্যাণ্ড, সীটে উঠে বসল ড্রাইভারের পাশে। পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল ওরা। চোখে গগলস রানা, ওর মাথার ওপর ছয় ব্যারেল বিশিষ্ট ভলকান মেশিন গান। চোখে গগলস পরে স্টার্ট দিল ও, বলল, 'ত্রিশ মিটার সামনে, আমাদের ডান দিক থেকে শুরু হয়েছে মাইনে যাবার ট্র্যাক।'

'প্লীজ গো, মি. রানা,' বললেন কর্নেল।

অ্যাটাক ডিউন বাগি ছেড়ে দিয়ে রানা জানতে চাইল, 'এর স্পীড কত?'
'লেভেল সারফেসে দুশো দশ কিলোমিটার।'
'তারমানে ঘণ্টায় প্রায় একশো ত্রিশ মাইল। অবাক কাণ্ড।' খানিক পর রানা আবার মুখ খুলল, 'আপনার ড্রাইভারদের বলুন বাম দিকে ত্রিশ ডিগ্রী বাঁক ঘুরছি, তারপর সোজা আট কিলোমিটার এগোতে হবে।'
রেডিও কমিউনিকেশন সিস্টেমের সাহায্যে নির্দেশ পাঠালেন কর্নেল।
মালভূমির ক্যানিয়ন ও এয়ারস্ট্রিপের মাঝখানে ট্র্যাকটা অস্পষ্ট, ল্যাণ্ডমার্কও সংখ্যায় খুব কম। খানিকটা স্মৃতি, খানিকটা চোখের ওপর নির্ভর করে এগোচ্ছে রানা।
এক সময় সামনে ঝুলতে দেখা গেল মালভূমি, পশ্চিম দিগন্তের তারাগুলোকে আড়াল করে রেখেছে। চার মিনিট পর স্বস্তি অনুভব করল রানা। মালভূমির কালো পাঁচিল ভেঙে বিশাল গহ্বর তৈরি করেছে ক্যানিয়নটা। স্পীড কমিয়ে সাবধানে এগোল ও। পারসোনেল ক্যারিয়ারগুলো এক লাইনে পিছনে রয়েছে। খাড়া পাঁচিলের গোড়ায় পৌঁছে গেল কনভয়, বিশেষভাবে মডিফায়েড মাফলার থাকায় এগজস্ট থেকে প্রায় কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। রাতের বাতাস ঠাণ্ডা, সামান্য বইছে। অন্ধকারে হঠাৎ দেখা গেল গুহামুখটা, ডিউন বাগি নিয়ে মেইন গ্যালারিতে চলে এল রানা। অফিস টানেল থেকে বেরিয়ে আসা আলো ছাড়া অন্য কোন আলো নেই ভেতরে, একটা রেনোয়া ট্রাক ছাড়া জায়গাটা খালি পড়ে আছে। মাথায় পাগড়ি বাঁধা একজন মাত্র টুয়ারেগকে দেখা গেল; কৌতূহলী মনে হলো তাকে, মোটেও সতর্ক নয়। ডিউন বাগি কাছাকাছি চলে আসতে বড় হতে শুরু করল তার চোখ। কাঁধ থেকে মেশিন পিস্তল নামাতে যাচ্ছে, কর্নেল তার দুই চোখের মাঝখানে গুলি করলেন।
ব্রেক কষে অ্যাটাক ভেহিকেল দাঁড় করাল রানা। 'নাইস শট।'
হাতঘড়ি দেখলেন কর্নেল। 'ধন্যবাদ, মি. রানা। নির্দিষ্ট সময়ের বারো মিনিট আগে পৌঁচেছি আমরা।'
পিছনের ভেহিকেল থামতেই লাফ দিয়ে নিচে নামল ট্যাকটিকাল টীমের সদস্যরা, ভাগ হয়ে নিজেদের ইউনিট তৈরি করল তারা, সময় নষ্ট না করে টানেলে ঢুকে পড়ছে। কর্নেলের লোকজন করিডর থেকে খিলান আকৃতির প্রবেশপথ দিয়ে ভেতরে ঢুকে এরিক শানিনের হতভম্ব এঞ্জিনিয়ারিং ক্রুদের ঘিরে ফেলল। মুরল্যাণ্ড রওনা হলো প্রধান এলিভেটরের দিকে, সঙ্গে তিনটে ইউনিট।
একটা দরজার গায়ে লেখা রয়েছে 'সিকিউরিটি মনিটরিং সেন্টার'। চাপ দিয়ে কবাটটা খুললেন কর্নেল। ভেতরে আলো জ্বলছে না, তবে অনেকগুলো টেলিভিশন মনিটর অন করা রয়েছে, স্ক্রীনে দেখা যাচ্ছে খনির বিভিন্ন অংশের ছবি। দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে রয়েছে একজন ইউরোপিয়ান, পরনে ডিজাইনার শার্ট আর বারমুডা শর্টস। তার পিছনে লোকজন, এটা সে টিভির স্ক্রীনে দেখে ফেলল, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হাত চলে গেল এক সারি লাল বোতামের দিকে। লাফ দি[illegible] তার পিছনে পৌঁছুলেন কর্নেল, হাতের হেকলার অ্যাণ্ড কোচ দিয়ে আঘাত কর[illegible] মাথায়। চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল সিকিউরিটি গার্ড, মাথাটা ঠুকে গেল কনসে[illegible]

জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তবে বোতামে চাপ লাগায় গোটা খনিতে অ্যামবুলেন্স সাইরেনের মত বেজে উঠল অ্যালার্ম।

'সারপ্রাইজের বারোটা বাজল!' বলে কনসোল লক্ষ্য করে দশ রাউণ্ড গুলি করলেন কর্নেল। কনসোল থেকে ধোঁয়া আর আগুনের ফুলকি ছুটল, থেমে গেল অ্যালার্ম।

করিডর ধরে ছুটে কমিউনিকেশন রুমে চলে এল রানা। এখানে অপারেটর একজন সুন্দরী মেয়ে, চেহারা দেখে মনে হলো আফ্রিকান। সাইরেনের আওয়াজ পেয়ে হেডসেটের মাইক্রোফোনে দ্রুত কথা বলছে সে। কর্নেলের মত, রানারও দেরি হয়ে গেছে। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ার আগে জেনারেল ভিনসেন্টের সিকিউরিটি ফোর্সকে সতর্ক করে দিয়েছে মেয়েটা।

ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকলেন কর্নেল। 'ভিনসেন্ট খবর পেয়ে গেছেন!' তাঁকে বলল রানা।

'সার্জেন্ট নিকোল!' হুঙ্কার ছাড়লেন কর্নেল।

'স্যার!' কমব্যাট সুট পরে থাকায় বোঝা মুশকিল যে সার্জেন্ট একজন মহিলা।

'রেডিওতে কথা বলো,' নির্দেশ দিলেন কর্নেল। 'মালিয়ানদের জানাও, শর্ট সার্কিটের কারণে অ্যালার্ম বেজে উঠেছিল। বলো কোন রকম ইমার্জেন্সী দেখা দেয়নি। কেউ যেন কোন অ্যাকশন শুরু না করে।'

'ইয়েস স্যার!' অচেতন রেডিও অপারেটরকে লাথি মেরে সরাল সার্জেন্ট, বসে পড়ল রেডিওর সামনে।

'করিডরের শেষ মাথায় এরিক শানিনের অফিস,' করিডরে বেরিয়ে এসে কর্নেলকে বলল রানা, দু'জনেই ছুটছে।

দরজাটা খোলা পাওয়া গেল। হাতে কুৎসিতদর্শন অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে রিসেপশনিস্ট মেয়েটা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে ঢুকল যেন একটা অন্ধ ঝড়, মেয়েটাকে নিয়ে মেঝেতে পড়ে গেল রানা। ওর বুকে পরপর দুটো গুলি করেছে মেয়েটা। বুলেটপ্রুফ অ্যাসল্ট ভেস্টে লাগায় নির্ঘাত মৃত্যুকে এড়িয়ে যেতে পারল ও। বুকে হাতুড়ির বাড়ি অনুভব করল, ফুসফুসে কোন বাতাস থাকল না। আবার গুলি করল মেয়েটা, মেঝেতে শুয়ে থাকা অবস্থায়। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। ছোঁ দিয়ে অস্ত্রটা কেড়ে নিল রানা। নিজে দাঁড়াল, হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করাল মেয়েটাকে, তারপর একটা বস্তার মত ছুঁড়ে দিল কাউচের ওপর।

জোড়া ব্রোঞ্জ মূর্তির মাঝখানে এসে দাঁড়াল রানা, শানিনের অফিসের দরজা খোলার জন্যে হাতল ঘোরাল। ভেতর থেকে বন্ধ দরজা। তালায় মাজল ঠেকিয়ে পরপর তিনটে গুলি করল ও। এক পাশে সরে এসে পা দিয়ে কবাট খুলল।

ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এরিক শানিন, হাত দুটো পিছনে। তার চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই। ভেতরে ঢুকে হেলমেট খুলল রানা, ওকে চিনতে পেরে হিসহিস করে উঠল সে, 'আপনি!'

'তোমাকে শায়েস্তা করতে ফিরে এলাম,' বলল রানা। 'সঙ্গে কিছু বন্ধু নিয়ে

এসেছি। মহিলা ও শিশুদের ওপর অত্যাচার করো, এ-কথা শুনে তোমার ওপর ওরা খুব খেপে আছে।'

'আপনার তো মারা যাবার কথা। পানি ছাড়া কিভাবে মরুভূমি পাড়ি...।'

'দেখতেই পাচ্ছ, মরিনি।'

হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না শানিন, তবে এখনও তার চেহারায় ভয়ের কোন ছাপ নেই। 'কেন এসেছেন? নিজের লোকজনকে মুক্ত করতে, নাকি সোনা নিতে?'

'প্রথমটা ঠিক আছে, দ্বিতীয়টা ভুল। আর, ওই যে বললাম, তোমাকে শায়েস্তা করতে ফিরে এসেছি।'

'আপনারা স্বাধীন সার্বভৌম একটা রাষ্ট্রে অনধিকার প্রবেশ করেছেন...।'

'কে তোমার লেকচার শুনতে চায়?' বলে এক পা সামনে বাড়াল রানা, হাতের পিস্তল দিয়ে শানিনের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করল। লোকটা লুটিয়ে পড়ছে, পিছনে লুকিয়ে রাখা হাত থেকে খসে পড়ে গেল একটা রিভলভার। সেটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরল রানা, শানিনকে কাঁধে তুলে বেরিয়ে এল করিডরে।

'শানিন?' জানতে চাইলেন কর্নেল।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।' তারপর খোঁজ নিল, 'আমাদের অবস্থা?'

'চার নম্বর ইউনিট ওর রিকভারি লেভেল দখল করেছে। দুই আর তিন নম্বর ইউনিট গার্ডদের কাছ থেকে তেমন কোন বাধা পায়নি। দুর্বল লেবারদের ওপর অত্যাচার করতে পারে ওরা, প্রফেশনালদের সামনে দাঁড়াতে পারে না।'

বাঁক ঘুরে পাশের করিডরে চলে এল রানা, ভিআইপি এলিভেটরের দিকে যাচ্ছে। এক নম্বর ইউনিট অপেক্ষা করছিল, সবাইকে নিয়ে মেইন লেভেলে নেমে এল ও। লোহার একটা দরজা দেখা গেল, পালাবার সময় ডিনামাইট ফাটিয়ে তালা ভেঙেছিল রানা ও মুরল্যাণ্ড। এখানে পৌঁছুনোর পর খনির নিচ থেকে ভেসে আসা গোলাগুলির আওয়াজ পেল ওরা। শানিনের অচেতন শরীরটা একজন দৈত্যাকার কমাণ্ডোর কাঁধে তুলে দিল রানা, তারপর শ্যাফট ধরে ছুটল একটা গুহার দিকে, যেখানে বন্দীদের আটকে রাখা হয়।

ওখানে ট্যাকটিকাল টীমের লোকজন আগেই পৌঁচেছে, গার্ডদের দেখা গেল মাথায় হাত তুলে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। ছুটে এসে কর্নেলকে রিপোর্ট করল ক্যাপটেন জুয়ান ডিগো। 'ষোলোজন গার্ডকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। ভুল করায় মারা গেছে সাতজন। আমাদের লোক আহত হয়েছে মাত্র দু'জন।'

মুরল্যাণ্ডকে দেখতে পেয়ে রানা জানতে চাইল, 'অলিভা কোথায়?'

'আমি তাকে খুঁজছি,' জবাব দিল মুরল্যাণ্ড।

গুহার ভেতর প্রথমে ঢুকল ট্যাকটিকাল টীমের সদস্যরা। ভেতরে গরু-ছাগলের মত গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে বন্দীরা। দুর্গন্ধে বমি পেল সবার। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা। ড. সুনারিলকে একটা বাক্সে বসে থাকতে দেখল ও, শূন্যদৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন দেয়ালের দিকে। অসুস্থ, রুগ্ন লাগছে তাঁকে। দাঁড়ালেন তিনি, আলিঙ্গন করলেন রানাকে। বললেন, 'সত্যি আপনি ফিরে

এসেছেন? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি?'

'দেরি করার জন্যে দুঃখিত,' বলল রানা।

'সিলভিয়ার সঙ্গে এ নিয়ে সারাক্ষণ ঝগড়া হয়েছে আমার। আপনার ওপর তার অটল বিশ্বাস...'

'কোথায় সে?' চারদিকে তাকাল রানা।

ইঙ্গিতে একটা বাঙ্ক দেখালেন ড. সুনারিল। 'ওর অবস্থা ভাল নয়।'

বাঙ্কে কাত হয়ে পড়ে আছে যেন পাথরের একটা মূর্তি। রানার চোখে-মুখে কাতর ভাব ফুটে উঠল। এক হপ্তার মধ্যে সিলভিয়া এত রোগা ও বিবর্ণ হয়ে গেছে যে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ও, বলল, 'সিলভিয়া, তোমাকে আমি নিতে এসেছি।'

'প্লীজ, আমাকে আরেকটু শুতে দিন,' বিড়বিড় করল সিলভিয়া।

'সিলভিয়া, আর কোন ভয় নেই। আমি রানা, আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?'

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া। তার চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। 'আমি জানতাম আমাদের জন্যে তুমি ফিরে আসবে।' দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে ধরতে চাইল সে। ঝুঁকে তার কপালে চুমো খেলো রানা।

মেডিকেল টীম আহত ও অসুস্থ বন্দীদের চিকিৎসা শুরু করল। বাকি সবাইকে আপার লেভেলে তুলে এনে বসানো হলো পারসোনেল ক্যারিয়ারে। শিশু ও মহিলাদের যত্ন নেয়া হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সিলভিয়াও আছে; আসছি বলে তার কাছ থেকে বিদায় নিল রানা। কর্নেলের এক কমাণ্ডোর কাছ থেকে খানিকটা প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ সংগ্রহ করল ও, তারপর চলে এল শানিনের কাছে। এক লেডি কমাণ্ডোর পাহারায় একটা ওর কারে বসে রয়েছে শানিন, খানিক আগে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। 'এসো, শানিন, আমরা খানিক হেঁটে আসি।'

'কোথায়?' এই প্রথম শানিনের চেহারায় আতঙ্ক দেখা গেল।

'এত লোককে খুন করলে, এখন নিজের মৃত্যুর সময় ভয় পাচ্ছ কেন?' হাসল রানা। 'তোমাকে আমি ডেথ চেম্বারে নিয়ে যাচ্ছি। লাশগুলো যেখানে গাদা করে ফেলে রেখেছ।' হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওর কার থেকে নামাল তাকে, ধাক্কা দিয়ে শ্যাফটের ভেতর ঢোকাল।

খনির ভেতর দিয়ে এগোবার সময় কেউ কোন কথা বলল না। ভুল করায় মারা পড়েছে, এরকম কয়েকটা টুয়ারেগের লাশ টপকাল রানা। লাশের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল শানিন, পিছন থেকে আবার তাকে ধাক্কা দিতে হলো। দু'পা এগিয়ে রানার দিকে ঘুরল শানিন। 'এখানে নিয়ে আসার মানে কি? মারার আগে আমার লোকদের অত্যাচার সম্পর্কে লেকচার শোনাবেন?'

'ভুল করছ। তোমাকে আমি মারব না।' হেসে উঠল রানা।

'তাহলে?' হতভম্ব দেখাল শানিনকে।

লাশগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা। একটা বাচ্চা মেয়ে ওর দিকে চোখ খুলে তাকিয়ে রয়েছে, খুব বেশি হলে দশ বছর বয়েস হবে। রাগে ও ঘৃণায় সারা শরীর

রিরি করে উঠল ওর। 'তুমি মরবে, শানিন, তবে খুব ধীরে ধীরে।'

'না! এখুনি মারুন আমাকে! গুলি করুন!'

রানার ঠোঁটে নিষ্ঠুর, শীতল হাসি। ও কোন কথা বলল না। শানিনের বুকে পিস্তল চেপে ধরল, ঠেলে দিল গুহার আরও ভেতর দিকে। পিছিয়ে এসে এন্ট্রান্স টানেলের বিভিন্ন জায়গায় প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ বসাল, ইগনিটারে সেট করল টাইমার। শানিনের উদ্দেশে শেষ একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে এল শ্যাফট থেকে, আড়াল নিল ওর কারের একটা ট্রেনের পিছনে।

একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটল। মেইন শ্যাফট আর এন্ট্রান্স টানেলের অবলম্বনগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। ধুলো সরে যাবার পরও কান পেতে থাকল রানা। নিজের ওপর রাগ হচ্ছে ওর। বিস্ফোরক কি ঠিক জায়গা মত বসানো হয়নি? চারদিকে নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। তারপর গুরুগম্ভীর একটা আওয়াজ ভেসে এল। এতক্ষণে টানেলের ছাদ ধসে পড়েছে, ডেথ চেম্বারের প্রবেশপথ শত শত টন পাথরে চাপা পড়ে গেল।

একটা শব্দ শুনল মুরল্যাণ্ড, ওর বাম দিকে শ্যাফটের তেমাথায় নড়াচড়ার আভাস পেল। ট্রেনের রেইল ধরে এগোল সে, সামনে একটা নিঃসঙ্গ ও খালি ওর কার দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিড়ালের মত নিঃশব্দে লাফ দিয়ে রেইল টপকাল সে, আগ্নেয়াস্ত্রের মাজল ঢোকাল ওর কারের ভেতর। 'অস্ত্র ফেলে দাও!'

ওর কারের খালি মেঝে থেকে ধীরে ধীরে সিধে হলো গার্ড, মেশিন গান ধরা হাতটা মাথার ওপরে। মুরল্যাণ্ডের পরবর্তী নির্দেশ পেয়ে অস্ত্রটা কারের বাইরে ফেলে দিল লোকটা।

'অলিভা কোথায়?'

লোকটা মাথা নাড়ল। তার মুখের ভেতর মাজল ঢোকাল মুরল্যাণ্ড, ভাব দেখাল ট্রিগার টেনে দেবে। আবার চিৎকার করল সে, 'অলিভা!'

গার্ডের গলায় ঢুকে গেছে মাজল, ব্যথায় ছটফট করছে সে। চোখ ইশারায় শাফটের বাম দিকের শাখাটা দেখাল। কার থেকে নামিয়ে তাকে তেমাথার দিকে ঠেলে দিল মুরল্যাণ্ড, তারপর পিছন থেকে আঘাত করল মাথায়। অচেতন লোকটাকে টপকে সাবধানে সামনে এগোল সে।

তেমাথায় এসে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। বাম দিকের শাখাটা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে সে, প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে গুলি হবে।

রেইলের ওপর দিয়ে হাঁটছে মুরল্যাণ্ড, কোন শব্দ করছে না। দু'বার থামল, তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছে। একটা বাঁকে এসে আবার থামল। বাঁকের ওদিক থেকে আলো আসছে। একটা ছায়া দেখা গেল, পাথরের সঙ্গে ঘষা খেলো পাথর। কমব্যাট সুট থেকে ছোট্ট একটা সিগন্যাল মিরর বের করল মুরল্যাণ্ড, অবলম্বন হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা সারি সারি বাঁশের ফাঁকে বাড়িয়ে ধরল সেটা।

অলিভাকে উন্মাদিনীর মত লাগছে। প্রচণ্ড ব্যস্ততার সঙ্গে পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে শাফটের শেষ মাথায় একটা পাঁচিল খাড়া করতে চেষ্টা করছে সে, ইচ্ছে

ওটার পিছনে লুকাবে। মুরল্যাণ্ডের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে, তবে প্রায় দশ মিটার দূরে। অলিভা নিরস্ত্র নয়, টানেলের একটা শেলফে রয়েছে তার আগ্নেয়াস্ত্র, নাগালের মধ্যে। দ্রুত কাজ করার সময় একবারও পিছন ফিরে তাকাচ্ছে না, কারণ জানে গার্ড তাকে পাহারা দিচ্ছে। ইচ্ছে করলে বাঁক ঘুরে পিছন থেকে গুলি করতে পারে মুরল্যাণ্ড। কিন্তু এক নিমেষে কাজ সারা তার ইচ্ছা নয়।

নিঃশব্দে বাঁক ঘুরল সে। ধীরে ধীরে এগোল। একেবারে কাছে এসে শেলফ থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল অস্ত্রটা, ছুঁড়ে ফেলে দিল পাঁচিলের ওপারে।

বন করে ঘুরল অলিভা। দু'সেকেণ্ডে বুঝে নিল পরিস্থিতি। খেপা বাঘিনীর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, কোত্থেকে কে জানে হাতে চলে এসেছে ভয়ঙ্কর থংটা। মুরল্যাণ্ড এক চুল নড়ল না, সোজা গুলি করল তার হাঁটুতে।

অলিভাকে কষ্ট দিয়ে মারতে চাইছে মুরল্যাণ্ড। তার বিচারে, এটা ওর পাওনা। কোন কারণ ছাড়াই শিশু ও মহিলাদের খুন করেছে ও, খুন করেছে স্রেফ আনন্দ পাবার জন্যে। এমনকি এই মুহূর্তেও, আলগা পাথরে পড়ে তার শরীরটা যখন মোচড় খাচ্ছে, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে হিংস্র আক্রোশে ফুঁসছে সে। থংটা ছাড়েনি, মেঝে থেকেই মুরল্যাণ্ডকে আঘাত হানতে চেষ্টা করল, সেই সঙ্গে অশ্লীল গালিগালাজ চলছে।

'তুমি অনুতপ্ত নও,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'তোমার মুখে আমি পেচ্ছাব করি,' জবাব দিল অলিভা।

লক্ষ্যস্থির করে তার পেটে দুটো গুলি করল মুরল্যাণ্ড। 'ডিং ডং,' বিড়বিড় করল সে। 'দা উইচ ইজ ডেড।'

তিন

হন্তদন্ত হয়ে স্যাভয় গাসকিলের অফিসে ঢুকলেন জেনারেল পিয়েত্রো ভিনসেন্ট। গাসকিল মুখ তুলে তাকাবার আগে নিজেই একটা গ্লাসে জিন ঢাললেন তিনি, তারপর চেয়ার টেনে ডেস্কের দিকে মুখ করে বসে পড়লেন।

গাসকিল মুখ তুলে বললেন, 'আপনার অপ্রত্যাশিত আগমন সম্পর্কে আগেই আমাকে জানানো হয়েছে। এত রাতে কি ব্যাপার বলুন তো!'

গ্লাসের ভেতর বরফের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন জেনারেল, বললেন, 'ভাবলাম আমি নিজেই বলি আপনাকে।'

'কি?'

'তেবেজায় হামলা হয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে গাসকিল বিস্ময় প্রকাশ করলেন, 'কি বলছেন আপনি!'

'ন'টার দিকে আমার কমিউনিকেশন সেকশন একটা ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট রিসিভ করে। কয়েক মিনিট পর তেবেজা রেডিও অপারেটর অল-ক্লিয়ার ঘোষণা করে, বলে ইলেকট্রিকাল সার্কিটে ত্রুটি থাকায় অ্যালার্ম বেজেছিল।'

'এরকম ঘটতেই পারে।'

'আমার মন মানেনি। এয়ার ফোর্সকে নির্দেশ দিই তারা যেন এলাকাটার ওপর একবার চক্কর দিয়ে আসে। পাইলট রেডিওতে জানায়, তেবেজা এয়ারস্ট্রিপে একটা জেট ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন দাঁড়িয়ে আছে, কোন মার্কিং নেই। গাও থেকে আমেরিকান লোকটাকে তুলে নেয়ার সময় ঠিক এ-ধরনের একটা ফ্রেঞ্চ এয়ারবাস ব্যবহার করা হয়েছিল।'

গাসকিলের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'আপনার পাইলট কোন ভুল করেনি তো?'

'ভুল করেনি, তার প্রমাণ সে বেসে ফিরে আসেনি। আমি তাকে এয়ারবাসটা ধ্বংস করতে বলি। আমার নির্দেশ সে পালন করে। তারপরই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।'

'যান্ত্রিক গোলযোগ?' প্রশ্ন করলেন গাসকিল। 'ফিরে না আসার অনেক কারণই থাকতে পারে।'

'আমার ধারণা তেবেজার খনিতে যারা হামলা করেছে তারাই গুলি করে ফেলে দিয়েছে আমার ফাইটার।'

'স্রেফ ধারণা করছেন।'

'এলাকায় একটা ফাইটার স্কোয়াড্রন পাঠাতে বলেছি। পরিস্থিতি বোঝার জন্যে এলিট সিকিউরিটি ফোর্সও যাচ্ছে, হেলিকপ্টার নিয়ে।'

'শানিনের খবর কি? সে যোগাযোগ করেনি?'

'কোন সাড়া নেই। ইমার্জেন্সী অস্বীকার করার চল্লিশ মিনিট পর তেবেজার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করলেন গাসকিল, তারপর জানতে চাইলেন, 'খনিতে কেন হামলা করা হলো? কারা দায়ী? তাদের উদ্দেশ্য কি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন জেনারেল। 'কি করে বলি। হয়তো সোনার লোভে।'

'তা কি করে হয়! ওর চুরি করে কি লাভ? সোনা তো প্রসেস করার পরপরই সরিয়ে ফেলি আমরা সাউথ প্যাসিফিকের গুদামে। মাত্র দু'দিন আগে শেষ শিপমেণ্ট পাঠানো হয়েছে।'

'এই মুহূর্তে আমার কোন থিওরি নেই,' স্বীকার করলেন জেনারেল ভিনসেণ্ট। 'আমার ফোর্স এখন বোধহয় তেবেজায় ল্যাণ্ড করছে। এক ঘণ্টার মধ্যে সব জানা যাবে বলে আশা করছি।'

'আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে অদ্ভুত একটা কাণ্ডই ঘটছে।'

'আমি ভাবছি গাওতে জাতিসংঘের যে ফোর্স হামলা করেছিল, এরা তারাই কিনা।'

'গাও-এর ব্যাপারটা আলাদা ছিল। ফিরে এসে তারা তেবেজায় হামলা করবে কেন?'

'ভুলে যাচ্ছেন কেন, জাতিসংঘের বিজ্ঞানীরা রয়েছে তেবেজায়। খবরটা হয়তো ফাঁস হয়ে গেছে।'

'অসম্ভব! আপনার লোকজন যদি ফাঁস করে না থাকে...'
'আমার লোকজন ফাঁস করবে না, করলে আপনার লোকজন করতে পারে।'
'নিজেরা তর্ক করে লাভ কি। অতীত বদলানো যায় না, তবে ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।'
'কিভাবে?'
'আপনি বলছেন, আপনার পাইলট এয়ারবাস ধ্বংস করে দিয়েছে?'
'ওটাই ছিল তার শেষ রিপোর্ট।'
'তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি মালি ছেড়ে হানাদারদের পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।' চেয়ার ছেড়ে পায়চারি শুরু করলেন গাসকিল। 'আপনি যদি হানাদারদের কমাণ্ডার হতেন, প্লেন ধ্বংস হয়ে গেছে জানার পর কি করতেন?'
'করার কাজ একটাই থাকত, আলজিরিয়া সীমান্তের দিকে ছুটতাম।'
'ওদের ভেহিকেল যদি অক্ষত থাকে, আর যদি ফুয়েল থাকে, ওরা আলজিরিয়ায় পৌঁছুবে ভোরের দিকে, তাই না?'
ভিনসেণ্ট পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'সীমান্তে পৌঁছানোর আগে ওদেরকে কি ধরা সম্ভব?'
'প্রশ্নটা তো আমি করব আপনাকে।'
জেনারেল এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললেন, 'রাতে কাজটা করা কঠিন। দিনের বেলা সম্ভব।'
'দিনে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'
জেনারেল একটা চুরুট ধরালেন। 'মালির সঙ্গে আলজিরিয়ার কোন ঝগড়া নেই। সীমান্তের ওপারটা খাঁ খাঁ মরুভূমি, আলজিরিয়ান মিলিটারি মাঝে মধ্যে টহল দেয়। আমার সিকিউরিটি ফোর্স সহজেই একশো মাইল ভেতরে ঢুকে আঘাত হানতে পারে।'
চেহারা কঠিন হলো গাসকিলের, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। 'প্রতিপক্ষ যদি ইউএন ফোর্স হয়ে থাকে, হু টীমের কাউকে বা আমার এঞ্জিনিয়ার ও তাদের পরিবারের কাউকে পালাতে দেয়া চলবে না। মাত্র একজন পালাতে পারলেও ওয়েস্ট প্রজেক্টের রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে, বিজনেস পার্টনার হিসেবে খতম হয়ে যাব আমরা।'
জেনারেল হাসতে শুরু করলেন। 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না, গাসকিল। আমি কথা দিচ্ছি, কাল দুপুরের মধ্যে ওরা প্রত্যেকে শকুনের খোরাক হয়ে যাবে।'

জেনারেল বিদায় নেয়ার পর ইন্টারকমে মঈন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে কথা বললেন গাসকিল। জাহাঙ্গীর বলল, 'হ্যাঁ, মনিটরে দেখলাম ও শুনলাম। ভদ্রলোককে আমার একই সঙ্গে চতুর আবার বোকাও মনে হলো।'
'ঠিক চিনেছ। লাগাম পরানোর কাজটা তোমার জন্যে সহজ হবে না।' একটু থেমে আবার বললেন গাসকিল, 'প্রেসিডেণ্ট তাহিরের সম্মানে আমি একটা ডিনার পার্টি দিচ্ছি, ওখানে তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।'

নিউ ইয়র্ক, জাতিসংঘ ভবনের কমাণ্ড সেন্টার অফিসে বসে কর্নেল মিরাক ও রানার

রিপোর্ট পড়লেন জেনারেল ইথার, রিলে করা হয়েছে ইউএন কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। রিপোর্টটা পড়ার পর থমথমে হয়ে উঠল চেহারা, রিসিভার তুলে অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের প্রাইভেট নম্বরে ফোন করলেন তিনি। আট মিনিটের মাথায় লাইনে এলেন অ্যাডমিরাল। 'এই মাত্র কর্নেল মিরাক ও মি. রানার রিপোর্ট পেলাম, অ্যাডমিরাল। দুঃসংবাদ।'

'ইয়েস?'

'মালিয়ান এয়ার ফোর্স ওদের ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন ধ্বংস করে দিয়েছে– গ্রাউণ্ডে। আটকা পড়ে গেছেন ওঁরা।'

'মাইনের রেসকিউ অপারেশন?'

'সেটা সফল হয়েছে। কর্নেল বলছেন, এখন একমাত্র উপায় রাতের মধ্যেই আলজিরিয়ান বর্ডারে পৌঁছুনো। ওঁরা ভয় পাচ্ছেন, যে-কোন মুহূর্তে জেনারেল ভিনসেণ্টের ফোর্স অ্যাটাক করবে। কর্নেল একটা মস্ত ভুল করেছেন, অ্যাডমিরাল।'

'এ-কথা বলছেন কেন?'

'রিপোর্ট করেছেন তিনি ওপেন ফ্রিকোয়েন্সিতে। সন্দেহ নেই ভিনসেণ্টের কমিউনিকেশন অপারেটররা মেসেজটা পেয়ে গেছে।'

'ভুল না-ও হতে পারে,' দ্রুত নোট নিচ্ছেন অ্যাডমিরাল। 'কর্নেল যা বলছেন তা করবেন না। অন্তত আমার তাই ধারণা। প্রতিপক্ষকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে এভাবে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তিনি।'

'আর মি. রানা আপনাকে বলতে বলেছেন, কোড করছি– "আমি যখন ওয়াশিংটনে পৌঁছুব, অ্যাডমিরালকে বলবেন যে তাঁকে নিয়ে হার্ভের গার্লফ্রেণ্ড জুডিকে দেখতে যাব, এটিঅ্যাণ্ডএস সেলুনে যে মেয়েটা গান গায়"। এটা কি ধরনের কৌতুক, বলতে পারেন?'

'থামুন!' চিন্তা করছেন অ্যাডমিরাল। 'রানা আমার সঙ্গে কৌতুক করবে না। ও বোধহয় কিছু বলতে চাইছে।'

'এই হার্ভেকে আপনি চেনেন?'

'রানার মুখে এই নাম কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'ওয়াশিংটনে এটিঅ্যাণ্ডএস সেলুন নামে কিছু আছে, যেখানে জুডি নামে কোন গায়িকা গান করে?' জানতে চাইলেন কমাণ্ডার ইথার।

'আমার অন্তত জানা নেই,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল, স্মৃতির ভাণ্ডার তন্নতন্ন করে খুঁজছেন। 'জুডি নামে একমাত্র যে গায়িকাকে চিনি...।' অকস্মাৎ চপেটাঘাতের মত আঘাত করল জবাবটা। পুরানো দিনের সিনেমার পোকা অ্যাডমিরাল, সে-কথা মনে রেখে একটা ধাঁধার মাধ্যমে মেসেজ দিয়েছে রানা। কৌশলটা বুঝতে পেরে হেসে উঠলেন তিনি।

'এর মধ্যে হাসির কিছু তো আমি দেখছি না, অ্যাডমিরাল!'

'ওরা আলজিরিয়ান বর্ডারের দিকে যাচ্ছে না,' বিজয়ীর উল্লাস প্রকাশ পেল অ্যাডমিরালের গলায়।

'কি বলছেন!'

'কর্নেল মিরাকের ফোর্স দক্ষিণে যাচ্ছে, ফোর্ট ফরো আর সাগরের মাঝামাঝি রেল লাইন ওদের গন্তব্য।'

'জানতে পারি, কিভাবে আপনি বুঝতে পারছেন?'

'দি হার্ভে গার্লস নামে একটা সিনেমায় গায়িকা ছিল জুডি গারল্যাণ্ড, নায়ক ছিল হার্ভে। এটিঅ্যাণ্ডএস কোন সেলুন নয়, একটা গান, সেই গানে একটা রেলরোডের কথা বলা হয়েছে।'

'তারমানে খোলা লাইনে কথা বলে জেনারেল ভিনসেন্টের কমিউনিকেশন অপারেটরদের ভুল তথ্য দিয়েছেন কর্নেল মিরাক, তাদেরকে ধারণা দিয়েছেন উত্তর দিকে যাচ্ছেন ওঁরা।'

'অথচ যাচ্ছেন ঠিক উল্টোদিকে।'

'প্রশ্ন হলো, রেললাইনে পৌঁছুনোর পর কি করবেন ওরা।'

'হয়তো একটা ট্রেন চুরি করবে।'

'মি. রানার ধাঁধা এখানেই শেষ নয়,' বললেন জেনারেল ইথার। 'কোড করছি– ''অ্যাডমিরালকে আরও বলবেন যে গ্যারি, রে আর বব যাচ্ছে ব্রেইন-এর বাড়িতে, ওখানে গিয়ে তারা খুব হুল্লোড় করবে''। এর মানেও কি আপনার কাছে পরিষ্কার, অ্যাডমিরাল?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন অ্যাডমিরাল। 'এক্ষেত্রেও রানা যদি সিনেমা কোড ব্যবহার করে থাকে, তাহলে গ্যারি নিশ্চয়ই গ্যারি কুপার হবে। আর রে মানে রে মিল্যাণ্ড।'

'ওরা একসঙ্গে কোন ছবিতে ছিল কি?'

'ছিল।' টেলিফোনে অ্যাডমিরালের হাসির শব্দ ভেসে এল। 'তিন ভাইয়ের গল্প। ছবিটায় ব্রেইন-এর বাড়ি বলা হত একটা দুর্গকে।' এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন তিনি। রানা নিশ্চয়ই গাসকিলের ওয়েস্ট প্রজেক্টের কথা বলতে চাইছে না, কারণ দুনিয়ার এই একটা জায়গায় অন্তত কর্নেল মিরাক যাবেন না। এলাকায় অন্য কোন দুর্গ আছে কি?'

ম্যাপ দেখে কমাণ্ডার ইথার বললেন, 'হ্যাঁ, পুরানো একটা ফ্রেঞ্চ লীজান আউটপোস্ট, ওয়েস্ট প্রজেক্টের কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে। ওটার নামেই নিজের প্রজেক্টের নামকরণ করেছেন গাসকিল।'

'রানার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওখানে ওরা রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'সেক্ষেত্রে, ওদের সাহায্য দরকার হবে।'

'আপনাকে ফোন করার সেটাই কারণ,' বললেন কমাণ্ডার ইথার। 'আপনি আপনাদের প্রেসিডেন্টকে প্রস্তাব দিন, আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স পাঠিয়ে কর্নেলের লোকজন আর মুক্ত বন্দীদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হোক। ইউএন মহাসচিব এই মুহূর্তে মস্কোয়, কাজেই ওদিক থেকে কোন সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই।'

'হাতে আমাদের সময় আছে কি রকম?'

'মরুভূমিতে দু'ঘণ্টার মধ্যে সকাল হতে যাচ্ছে,' সংক্ষেপে জবাব দিলেন

কমাণ্ডার ইথার।

'দেখি কি করতে পারি,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'এর আগে প্রেসিডেন্টের সাহায্য চেয়ে পাইনি আমি। এই মুহূর্তে উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন কিনা তা-ও আমার জানা নেই।'

ওয়াশিংটন ডি. সি. থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে, মেরিল্যাণ্ডের শহরতলিতে, সমতলভূমির মাঝখানে বেমানান একটা পাহাড় আছে। প্রায় কেউই জানে না যে ওটা প্রাকৃতিক কোন ব্যাপার নয়, চুপিচুপি মানুষকে দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে। পাহাড়টা আসলে একটা বিশাল গর্ত থেকে তোলা মাটি, গর্তের ভেতর রয়েছে একটা আশ্রয় কেন্দ্র ও কমাণ্ড সেন্টার– দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিপদ দেখা দিলে ওই আশ্রয় কেন্দ্রে রাজধানীর রাজনীতিক ও সামরিক নেতারা আত্মগোপন করতেন। স্নায়ুযুদ্ধের সময়ও পরিত্যক্ত হয়নি ওটা, পাতালপুরীটাকে আকারে আরও বড় করা হয়, সেখানে জমা করা হয় জন্মের সময় থেকে দেশের যাবতীয় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রাষ্ট্রীয় তথ্য ও ইতিহাস। এই গোপন আর্কাইভ মিটার বা একর দিয়ে মাপা হয় না, মাপা হয় বর্গ কিলোমিটার দিয়ে। এর অস্তিত্ব সম্পর্কে যারা জানে, তাদের কাছে এটা এএসডি নামে পরিচিত– মানে হলো, আর্কাইভাল সেফকীপিং ডিপজিটরি।

এএসডিতে কয়েক লক্ষ গোপন দলিল রাখা হয়েছে, নির্দিষ্ট কিছু বুরোক্র্যাট ছাড়া এগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কেউ সচেতন নয়। এখানকার ক্লাসিফায়েড রেকর্ড বা বস্তু সম্পর্কে জনসাধারণকে কোনদিনই কিছু জানানো হবে না। চেরনোবিলে আসলে কি ঘটেছিল, কেনেডি হত্যা রহস্য, আমেরিকান স্পেস রকেট ও স্যাটেলাইটের বিরুদ্ধে রাশিয়ানদের ষড়যন্ত্র, কিউবা সঙ্কট ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ যা জানে এখানকার রেকর্ড বলে তার উল্টো কথা।

প্রেসিডেন্টের অনুমোদন আছে, কাজেই এএসডি-র ভেতরে ঢুকতে বিউ মরটনের কোন অসুবিধে হলো না। সিকিউরিটি গার্ডরা প্রতি পদে বাধা দিল তাকে, তবে কাগজ-পত্র দেখে ছেড়ে দিতেও দেরি করল না। এলিভেটরে চড়ে পাতালে নেমে এল সে। নিচে তার জন্যে পুরানো বন্ধু ফ্রেড মুর অপেক্ষা করছিল। করমর্দন করল ওরা। 'শেষবার এসেছিলে দু'বছর আগে,' মুর বলল। 'জার্মান ভি-টু রকেট সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে। এবার কি চাই তোমার?'

'সিভিল ওঅর সম্পর্কে পড়াশোনা করছি,' বিউ মরটন জবাব দিল। 'একটা নিখোঁজ আয়রনক্ল্যাডের রহস্য উন্মোচন করতে চাই।'

'আমাদের সিভিল ওঅর রেকর্ড রয়েছে এখান থেকে দু'কিলোমিটার দূরে,' মুর জানাল।

কিউরেটর-ইন-চার্জ ডেকে পাঠালেন মরটনকে। কাগজ-পত্রে সই করতে হলো। ওগুলো আসলে শপথনামা, প্রতিজ্ঞা করতে হলো সরকারী অনুমতি ছাড়া এখানকার কোন তথ্য পাবলিশ করা হবে না।

চারটে চারতলা বিল্ডিঙে রাখা হয়েছে সিভিল ওঅর রেকর্ড। প্রতিটি কামরার কংক্রিট সিলিং পনেরো মিটার উঁচু। প্রতিটি বিল্ডিঙের সামনে সারি সারি সাজিয়ে

রাখা হয়েছে গৃহযুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন ধরনের কামান। 'রেকর্ড আছে বিল্ডিং এ-তে। বি, সি. ও ডি-তে আছে অস্ত্র, ইউনিফর্ম, ফার্নিচার, অ্যান্টিকস, মুদ্রা– এ-সব ব্যবহার করতেন লিংকন, জেফারসন ডেভিস, লী, গ্র্যান্ট সহ অন্যান্য বিখ্যাত ব্যক্তিরা।'

বিল্ডিং এ-তে ঢুকল ওরা। মরটন জানতে চাইল, 'কনফেডারেট আয়রনক্ল্যাড টেক্সাস সম্পর্কে কোন তথ্য থাকলে কোথায় পাব?'

কোথায় কি আছে, ডাইরেক্টরি দেখে আধ ঘণ্টা বক্তৃতা দিল মুর, সবশেষে একটা কামরায় ঢুকিয়ে দিল মরটনকে, ইঙ্গিতে শেলফ আর চেয়ার-টেবিল দেখিয়ে বিদায় নিল সে।

প্রথম দু'ঘণ্টায় দুটো মেটাল ফাইল কেবিনেট পরীক্ষা করল মরটন। শেষের দিকে একটা ফাইল পেল, গায়ে লেখা রয়েছে 'কনফেডারেট স্টীমশিপ টেক্সাস'। ভেতরে যে তথ্য পাওয়া গেল, বেশিরভাগই মরটনের জানা। ফাইলের শেষ দিকে ভঙ্গুর একটা নিউজ ক্লিপিং পেল সে। ভাঁজ খুলে সাবধানে টেবিলে রাখল। ক্ল্যারেন্স বীচার নামে এক লোক একজন ব্রিটিশ রিপোর্টারের কাছে মৃত্যুশয্যা থেকে একটা বিবৃতি দিয়ে গেছে। তার বক্তব্য ছিল, সে-ই একমাত্র জীবিত লোক যে নিখোঁজ টেক্সাসের রহস্য সম্পর্কে জানে। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে টেক্সাস বড় একটা আফ্রিকান নদীতে ঢুকে পড়ে। কোন বিপদ ছাড়াই সবুজ-শ্যামল দুই তীরের মাঝখান দিয়ে কয়েকশো মাইল যাবার পর মরুভূমির কিনারা দেখতে পায় তারা। সঙ্গে ম্যাপ না থাকায় ভুল করে মেইন চ্যানেল ছেড়ে একটা শাখা নদীতে ঢুকে পড়ে পাইলট। আরও দু'দিন পার হয়ে যাবার পর ভুলটা ধরা পড়ে। ভাটির দিকে আসার জন্যে জাহাজ ঘোরাবার সময় আয়রনক্ল্যাডের খোল নদীর তলায় আটকে যায়, তারপর আর কোনভাবেই সেটাকে মুক্ত করা যায়নি।

অফিসাররা বর্ষা মরশুমের জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। ফুড সাপ্লাই সীমিত হলেও, নদী থেকে সুপেয় পানি পেতে কোন অসুবিধে হয়নি। বেদুইন টুয়ারেগদের কাছ থেকে সোনার বিনিময়ে বিভিন্ন পণ্য কেনেন ক্যাপটেন, মরুপথে প্রায়ই তাদেরকে দেখা যেত। বেদুইনদের বড় দুটো ডাকাতদল সোনা লুঠ করার চেষ্টা করেছিল, তবে সফল হয়নি। অগাস্টের মধ্যে টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া ও অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগে বহু লোক মারা যায়, এক পর্যায়ে বেঁচে থাকে মাত্র দু'জন অফিসার, প্রেসিডেন্ট ও দশ জন নাবিক।

পড়া থামিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল মরটন, কৌতূহলে মরে যাচ্ছে। ক্ল্যারেন্স বীচার যে প্রেসিডেন্টের কথা বলছেন, কে তিনি? ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে তার, খুঁত খুঁত করছে মন।

এরপর বীচার তার বিবৃতিতে বলেছেন, সশস্ত্র চারজনকে বাছাই করা হয় আয়রনক্ল্যাড থেকে বোট নিয়ে বেরিয়ে বাইরের দুনিয়া থেকে সাহায্য আনার জন্যে। এই চারজনের মধ্যে তিনিও ছিলেন। একা শুধু তিনিই নাইজারনদীর মোহনায় পৌঁছুতে সমর্থ হন। একটা ব্রিটিশ ট্রেডিং আউটপোস্ট-এর ব্যবসায়ীরা তাকে বাঁচিয়ে তোলে, বিনা পয়সায় পৌঁছে দেয় ইংল্যাণ্ডে। সেখানে এক সময়

বিয়ে করেন তিনি, এবং ইয়র্কশায়ারের একজন কৃষক হিসেবে নতুন জীবন শুরু করেন।

বীচার তাঁর জন্মস্থান জর্জিয়ায় কোনদিনই ফেরেননি, কারণ তাঁর ভয় ছিল টেক্সাসের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্যে তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো হতে পারে। সে কারণেই মৃত্যুর আগে মুখ খোলেননি তিনি।

বীচারের মৃত্যুর পর ডাক্তার ও তার স্ত্রী বিবৃতিটাকে মুমূর্ষু রোগীর প্রলাপ বলে ধরে নেন। পত্রিকার গ্যাপ পূরণ করার জন্যে রিপোর্টার তার এডিটরকে বিবৃতিটা দেয়, এডিটরও সেটা খেয়ালের বশে ছাপেন।

আর্টিকেলটা দ্বিতীয়বার পড়ল মরটন। তারপর সে ক্রুর তালিকা চেক করল। হতাশ হতে হলো তাকে, কারণ তালিকায় দেখা যাচ্ছে টেক্সাসে ক্ল্যারেন্স বীচার নামে কেউ ছিল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফাইলটা বন্ধ করল সে।

এরপর মুরের সাহায্য নিয়ে ইউনিয়ন-এর রেকর্ড-পত্র ঘাঁটতে শুরু করল মরটন। নির্দিষ্ট ফাইলটা পাবার পর আবার টেবিলে এসে বসল সে। আঠারোশো পঁচাশি সালের দুই এপ্রিল রিচমণ্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছিল টেক্সাস। অফিসারদের দেয়া যুদ্ধের বিবরণ পড়ল মরটন। তারপর প্রত্যক্ষদর্শীদের রিপোর্টের ওপর চোখ বুলাল, এদের মধ্যে জেমস নদীর তীরে দাঁড়ানো দর্শক আছে, আছে ইউনিয়ন যুদ্ধজাহাজের কিছু ক্রু। দু'ঘণ্টার মধ্যে ষাটটা চিঠি আর পনেরোটা ডায়েরী পড়ে ফেলল সে, গুরুত্বপূর্ণ মনে হলে তথ্যগুলো লিখে রাখছে একটা প্যাডে। আরও এক ঘণ্টা এভাবে কাজ করার পর নোট প্যাডটা পড়ল মরটন, এখন সে জানে এরপর কি দরকার তার। 'আর কতক্ষণ থাকতে পারব এখানে?' মুরকে জিজ্ঞেস করল সে।

'দু'ঘণ্টা দশ মিনিট।'

'প্রেসিডেন্ট লিংকনের যুদ্ধমন্ত্রী, এডউইন ম্যাকমাস্টার স্ট্যানটন সম্পর্কে তথ্য দরকার আমার।'

'তার কাগজ-পত্র পুরোপুরি ক্যাটালগ করা হয়নি,' জবাব দিল মুর। 'ওপরতলায়, ইউএস গভর্ণমেণ্ট ডকুমেন্টস ফ্লোরে পাবে সব।'

স্ট্যানটন-এর ডকুমেন্ট দশটা ফাইল ক্যাবিনেট ভর্তি। একমনে কাজ শুরু করল মরটন, একবার মাত্র উঠল বাথরুম সারার জন্যে। পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে। যুদ্ধের শেষ দিকে লিংকনের সঙ্গে তাঁর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর যোগাযোগ খুব কম ছিল দেখে বিস্মিত হলো সে। ইতিহাসের এই অংশটুকু সবাই জানে যে লিংকনকে তাঁর প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোটেও পছন্দ করতেন না– লিংকনের আততায়ীর যে ডায়েরী পাওয়া যায় তার কয়েকটা পাতা তিনি নষ্ট করে ফেলেন। মরটনের মনে আছে, লিংকনের আততায়ী ছিল জন উইলকেস বুথ। শুধু বুথের ডায়েরীর পাতা নয়, তার সহযোগী সম্পর্কেও অনেক তথ্যও নষ্ট করেন স্ট্যানটন। ফোর্ড থিয়েটারে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল সে-সম্পর্কে বহু প্রশ্নরই উত্তর পাওয়া যায়নি, সেজন্যে স্ট্যানটনকেই দায়ী করা হয়।

হাতে আর মাত্র চল্লিশ মিনিট আছে, এই সময় ঘটনাটা ঘটল।

একটা কেবিনেটের পিছন দিকে লুকিয়ে ছিল প্যাকেটটা, কালের আঁচড়ে

হলদেটে হয়ে গেছে, তবে সীলটা অক্ষত। খয়েরি কালিতে লেখা, তারিখ দেয়া হয়েছে আঠারোশো পঁয়ষট্টির নয় জুলাই। ওয়াশিংটনের কারাগারে বুথের সহকারী মেরী সারাট, লুইসপেইন, ডেভিড হ্যারল্ড ও জর্জ অ্যাটজেরোটকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তার দু'দিন পরের তারিখ। তারিখের নিচে লেখা– 'আমার মৃত্যুর পর একশো বছর পার না হলে খোলা যাবে না'। নিচে সই করেছেন এডউইন এম. স্ট্যানটন।

আবার টেবিলে বসল মরটন। সীল ভেঙে প্যাকেটটা খুলল সে, পড়তে শুরু করল ভেতরের কাগজ। তার বিবেকে বাধছে না, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের পরও পার হয়ে গেছে একত্রিশ বছর।

পড়ার সময় তার মনে হলো সে যেন অতীতে ফিরে গেছে। তারপর ঘামতে শুরু করল মরটন। সবগুলো কাগজ পড়তে চল্লিশ মিনিটই লাগল তার। আপনমনে মাথা নাড়ল সে, সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ফিসফিস করে বলল, 'মাই গড!'

টেবিলের ওদিক থেকে মুর জানতে চাইল, 'ইণ্টারেস্টিং কিছু পেলে?'

মরটন কোন জবাব দিল না। পুরানো কাগজগুলোর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে, বারবার একই কথা আওড়াচ্ছে: 'মাই গড! মাই গড!'

চার

বালিয়াড়ির চূড়ার ঠিক নিচে পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা, বালির ওপর বিস্তৃত খালি ট্র্যাকের ওপর চোখ। ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই, প্রাণের একমাত্র আভাস বলতে দূরে ফোর্ট ফরো ওয়েস্ট সাইটের আলো। ট্র্যাকের ওপারে, প্রায় এক মাইল পশ্চিমে, কালো আকাশের গায়ে ফুটে আছে আরও কালো পরিত্যক্ত ফ্রেঞ্চ লীজান দুর্গটা।

মরু পাড়ি দিয়ে আসার সময় কোন সমস্যা হয়নি। ট্র্যাকের ঝাঁকি খেয়ে কষ্ট পেয়েছে বন্দীরা, তবে মুক্তির আনন্দে কেউ কোন অভিযোগ করেনি। প্রাচীন ক্যামেল ট্রেইল ধরে ওদেরকে ঠিকভাবেই নিয়ে এসেছেন মেজর সিডনি কামার, এই ট্রেইল সল্ট মাইন থেকে টিমবাকটুর কাছাকাছি পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে আসার পথে জেট ফাইটার আর হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেয়েছে ওরা, তেবেজা আর আলজিরিয়ান বর্ডারের দিকে উড়ে গেছে। রানার নির্দেশে সে সময় কনভয়টা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল, অন্ধকারে নিচে কি আছে দেখতে পায়নি পাইলটরা।

'ধন্যবাদ, মি. কামার,' প্রশংসা করলেন কর্নেল মিরাক। 'আপনার সাহায্য না পেলে এখানে আমরা পৌঁছুতে পারতাম না।'

'ইন্সটিঙ্কট।' হাসলেন সিডনি কামার। 'সেই সঙ্গে কপালগুণ।'

'এবার ট্র্যাক পেরিয়ে দুর্গে ঢুকতে হয়,' কর্নেলের আরেক পাশ থেকে বলল রানা। 'ভোরের আলো ফুটতে আর এক ঘণ্টা বাকি আছে, তার আগেই

ভেহিকেলগুলো লুকিয়ে ফেলতে হবে।'

ডিউন বাগি আর পারসোনেল ক্যারিয়ারগুলো কংক্রিট দিয়ে কিনারা মোড়া ট্র্যাক টপকে এগোল, পৌছে গেল দুর্গের সামনে। পরিত্যক্ত রেনোয়া ট্রাকটাকে পাশ কাটাল রানা, ট্রেনে চড়ে ফোর্ট ফরোতে ঢোকার সময় এটার আড়ালেই আত্মগোপন করেছিল ও আর মুরল্যাণ্ড। গেটের সামনে চলে এল ওরা, খোলাই রয়েছে সেটা। কনভয়টা ঢুকে পড়ল প্যারেড গ্রাউণ্ডে। রানার পরামর্শ গ্রহণ করে চারজন লোককে বালির ওপর চাকার দাগ মোছার জন্যে পাঠালেন কর্নেল। বিপদের কোন ভয় নেই, কারণ মালিয়ানদের জানার কথা নয় এখানে ওরা আশ্রয় নিয়েছে, তবু প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া হলো। একজন অফিসার জানতে চাইল, 'কর্নেল, স্যার, এখান থেকে আমরা রওনা হচ্ছি কখন?'

'মি. রানা?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

'রাতে প্রথম যে ট্রেনটা এই পথ দিয়ে যাবে সেটা দখল করব আমরা,' জবাব দিল রানা।

ক্যাপটেন জুয়ান ডিগো বলল, 'ট্রেনে যদি কমিউনিকেশন সিস্টেম থাকে...'

রানা হাসল। 'ওদিকটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন, ট্রেন হাইজ্যাক করার অভ্যাস আছে আমাদের। কি বলো, ববি?'

মুরল্যাণ্ড সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল।

খানিক খোঁজাখুঁজি করতেই ব্যারাকের মেঝের নিচে পাতালে নামার সিঁড়ি পাওয়া গেল, দুটো কামরা পরিষ্কার করে থাকতে দেয়া হলো মুক্ত বন্দীদের, মেডিকেল টীম তাদের দেখাশোনা করছে।

কাউকে কিছু না বলে মেইন গেট দিয়ে দুর্গের বাইরে বেরিয়ে এল রানা, পাঁচিল ঘেঁষে হাঁটার সময় লক্ষ রাখল পায়ের ছাপ যাতে থেকে না যায়। সরু একটা শুকনো নালায় নামল ও, বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে খাড়া ঢালের পাশে বালির একটা স্তূপের সামনে থামল।

প্রাচীন সেই ভয়সিনটাকে যেখানে ওরা রেখে গিয়েছিল, সেখানেই রয়েছে। হুড আর ছাদে বালি নেই বললেই চলে, উড়িয়ে নিয়ে গেছে বাতাস, তারপরও যে-টুকু আছে ভিনসেন্টের এয়ার পেট্রলকে ফাঁকি দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। দরজা খুলে হুইলের পিছনে বসল রানা, চাপ দিল স্টার্টার বাটনে। সঙ্গে সঙ্গে সচল হলো এঞ্জিন।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকল রানা, পুরানো গাড়িটার প্রশংসা করছে মনে মনে। ইগনিশন কী ঘুরিয়ে নিচে নামল ও, নতুন করে বালি দিয়ে ঢেকে রাখল ভয়সিনকে।

দুর্গে ফিরে এসে সিঁড়ি বেয়ে পাতালে নামল রানা। একবার চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারল, শারীরিক বিপর্যয়টা কাটিয়ে উঠেছে সিলভিয়া। এখনও ম্লান দেখাচ্ছে তাকে, কাপড়চোপড় নোংরা ও ছেঁড়া। একটা ছোট শিশুকে দুধ খাওয়াতে সাহায্য করছে সে, মায়ের কোলে হাত-পা ছুঁড়ছে বাচ্চাটা। রানাকে দেখে হাসল সিলভিয়া। বাচ্চার বাবাকে দেখিয়ে বলল, 'উনি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন।'

ভদ্রলোকের একদিকের মুখে কালো দাড়ি, অন্য দিকে সাদা ব্যাণ্ডেজ। রানার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, 'আমি সিপার, সিপার দেঁস্তা। আমার গোটা পরিবারকে আপনি বাঁচিয়েছেন, আপনার প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ...।'

রানা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এখনও আমরা মালি থেকে বেরুতে পারিনি।'

'এখন যদি মারা যাই সেটা হবে দুর্ভাগ্য...।'

রানা তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'কাল এই সময়ের মধ্যে ভিনসেন্টের নাগালের বাইরে চলে যাব আমরা।' তারপর জানতে চাইল, 'গাসকিলের ওয়েস্ট প্রজেক্টে কি কাজ করতেন আপনি?'

'প্রজেক্টের কাজ শুরু হবার সময় থেকে আমরা যারা ছিলাম, সবাইকে গাসকিল ওখানেও বন্দী করে রাখে,' জবাব দিলেন দেঁস্তা। 'উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, উনি যে নিউক্লিয়ার বর্জ্য মাটির তলায় পুঁতে ফেলেছেন বা পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা করেছেন আমরা যেন তা বাইরের দুনিয়ায় প্রকাশ করতে না পারি। আমার প্রধান কাজ ছিল বর্জ্য ধ্বংস করার জন্যে থারমাল রিয়্যাক্টরের ডিজাইন করা।'

'বর্জ্য যদি ধ্বংসই করা হয় ওখানে, ট্রেন ভর্তি করে নিউক্লিয়ার বর্জ্য এনে মাটির নিচে পুঁতে ফেলার কি দরকার?' জানতে চাইল রানা। 'শত শত কোটি ডলার খরচ করে এতবড় কারখানা তৈরি করল কেন?'

'জার্মানী, রাশিয়া, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ আরও অনেক দেশেই নিউক্লিয়ার ওয়েস্ট উপচে পড়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে। কত পোড়ানো বা ধ্বংস করা সম্ভব? যতই ধ্বংস করুক, তারপরও কোটি কোটি গ্যালন থেকে যায়। এই পরিস্থিতিতে গাসকিল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ায় দেশগুলো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। নিউক্লিয়ার বর্জ্য যে সব পোড়ানো হচ্ছে না, সংশ্লিষ্ট দেশগুলো তা জানে, জেনেও চুপ করে আছে। আমরা যারা জানতে পেরে প্রতিবাদ করি তাদেরকে তেবেজোয় লেবার হিসেবে পাঠানো হয়।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি জানেন যে মাটির তলার পানিতে কেমিকেল ওয়েস্ট মিশছে?'

'কেমিকেল ওয়েস্ট?'

'আমি যতটুকু বুঝেছি, মরুভূমিতে যে কয়েক হাজার মানুষ মারা গেছে তার জন্যে দায়ী একটা কেমিকেল কমপাউণ্ড, সিনথেটিক অ্যামিনো অ্যাসিড আর কোবাল্ট দিয়ে তৈরি।'

'তেবেজোয় আসার পর কোন খবর পাইনি,' বললেন দেঁস্তা, শিউরে উঠলেন তিনি। 'যা ধারণা করেছিলাম, এ দেখছি তারচেয়েও খারাপ। তবে আরও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। নিউক্লিয়ার ও টক্সিক ওয়েস্ট স্টোর করার জন্যে সস্তাদরের ক্যানিস্টার ব্যবহার করেছেন গাসকিল। গোটা স্টোরেজ চেম্বার, সেই সঙ্গে চারদিকে মাইলের পর মাইল তরল মৃত্যুর লেকে পরিণত হবে।'

'আপনি আরও একটা বিষয় জানেন না,' বলল রানা। 'মাটির নিচের স্রোতের সঙ্গে মিশে কমপাউণ্ডটা নাইজার নদীতে গিয়ে পড়ছে, সেখান থেকে চলে যাচ্ছে সাগরে। ওখানে রেড টাইডের একটা বিস্ফোরণ সৃষ্টি করছে ওটা, হজম করে

ফেলছে সামুদ্রিক সমস্ত প্রাণ ও অক্সিজেন।'

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথার চুলে আঙুল ঢোকালেন দেঁস্তা। 'আমাদের কি করার ছিল বলুন! যদি জানতাম গাসকিল এ-ধরনের একটা অপরাধ করতে যাচ্ছেন, কেউ আমরা তাঁকে সাহায্য করতাম না।'

সিলভিয়া এত ক্লান্ত যে তার ঘুম আসবে না। রানাকে সে জিজ্ঞেস করল, 'ভোরের রোদে আমার সঙ্গে একটু বাইরে হাঁটবে নাকি? কতদিন আমি আকাশ দেখি না।'

'বাইরে বেরুবার অনুমতি নেই কারও। তবু, তুমি যখন বলছ…' ওর কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে সাহায্য করল রানা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল ওপরে। প্যারেড গ্রাউণ্ডে এসে সাবধানে প্ল্যাটফর্মে উঠল। 'এখানে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করা যেতে পারে। তবে কিনারায় যেয়ো না, জানতে পারলে কর্নেল রেগে যাবেন।'

ট্যাকটিকাল টীমের সদস্যরা সতর্ক নজর রাখছে চারদিকে। এক মহিলা সার্জেণ্ট এগিয়ে এসে বলে গেল, 'এখনও সন্দেহজনক কিছু দেখছি না আমরা।'

সিলভিয়া এখনও খুব দুর্বল, হাঁটার সময় রানার একটা হাত ধরে থাকল। তবে কথা বলার সময় তার সুরে চাপা আবেগ প্রকাশ পেল। 'সৈকতে হঠাৎ পরিচয়, তা-ও বিপদের মধ্যে। তোমার সম্পর্কে খুব বেশি কিছু আমার জানাও হয়নি। আমাকেও তুমি ভাল করে চেন না। তোমার কথা জানি না, কিন্তু আমার কেন মনে হবে তোমাকে আমি জন্মেরও আগে থেকে চিনি?'

দাঁড়িয়ে পড়ল সে, রানার গায়ে হেলান দিল। তারপর আবার বলল, 'আমাকে নির্লজ্জ ভেবো না। কিন্তু কথাটা সত্যি– তোমার ছোঁয়া পাবার জন্যে লালায়িত হয়ে ছিলাম, সেই পরিচয়ের মুহূর্ত থেকে। আমার জীবনে তোমার চেয়েও সুদর্শন পুরুষ অনেক এসেছে, কখনও তো এরকম ঘটেনি। তুমি কিছু বলছ না কেন?'

সত্যি কথাই বলল রানা। 'আমার ভয় করছে। বুঝতে পারছি না কি বলব।'

'বোধহয় আমাকে তুমি ভুল বুঝছ। হয়তো ধরে নিচ্ছ আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেছি, নিজেকে উজাড় করে তুলে দিতে চাইছি তোমার হাতে, সেই সঙ্গে তোমাকে দখল করারও একটি ফন্দি আঁটছি। রানা, ব্যাপারটা সেরকম নয়, বিলিভ মি। তুমি আমাকে সাংঘাতিক রোমাঞ্চিত করো, শুধু এই কথাটাই বলতে চাইছি আমি। তবে একবার তোমাকে আমি আপন করে পেলে এই রোমাঞ্চের ভাবটা আর না-ও থাকতে পারে। সেই ভয়ে আমি হয়তো কোনদিনই আমার সবটুকু তোমাকে দিতে চাইব না।'

সিলভিয়ার কপাল থেকে চুল সরিয়ে ছোট্ট করে চুমো খেলো রানা। তারপর পরস্পরকে দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল ওরা। সিলভিয়া জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে পালিয়ে যাবার পর তুমি কি ওয়াশিংটনে কিছু দিন থাকবে?' রানার কানে ঠোঁট বুলাচ্ছে সে।

'বলতে পারছি না। আমার কোনকিছুরই স্থিরতা নেই। তুমি?'

'আমি হয়তো একটা মিশনের সঙ্গে অন্য কোন অনুন্নত দেশে রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে চলে যাব। এটাই আমার পেশা। এটাই আমি ছোটবেলা থেকে করতে চেয়েছি।'

'প্রেম-ট্রেম করার তেমন সুযোগ নেই, বলতে চাইছ?'

'দু'জনেই আমরা যার যার পেশায় বন্দী।'

খানিক পর নিচে নেমে এল ওরা। সিলভিয়ার হাত ছাড়েনি রানা, প্যারেড গ্রাউণ্ড হয়ে ঢুকল ছোট আকারের খালি একটা স্টোররূমে, এক সময় এটা কিচেন বা মেস হল ছিল। ভেতরে বা আশেপাশে কেউ নেই। দরজা বন্ধ করে দিল ও।

'কি করছ?'

'ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারে কি যেন বলছিলে তুমি, মনে আছে?' হাসছে রানা। 'ভয় পাচ্ছিলাম, নিজেকে আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। সেই ভয়টাই সত্যি হতে যাচ্ছে।'

'কিন্তু, রানা...' রানার গায়ে সেঁটে এল সিলভিয়া, '...আমার অন্য রকম ভয় লাগছে, আমি মারা যেতে পারি!' সারা শরীরে অদ্ভুত এক শিহরণ বয়ে যাচ্ছে, আনন্দময় পুলক অথচ অসহ্য মনে হচ্ছে তার। 'সত্যি আমি মারা যেতে পারি!' তারপর নিজেই সে ব্যাকুল আগ্রহে জড়িয়ে ধরে উন্মাদিনীর মত চুমো খেতে শুরু করল।

স্যাভয় গাসকিলের চীফ এইড, জাঁ ককরু, তার বসের অফিসে ঢুকল। 'জেনারেল ভিনসেন্টের হেডকোয়ার্টার থেকে মঈন জাহাঙ্গীর ফোন করেছে, মসিয়ে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ফোনের রিসিভার তুললেন গাসকিল, 'হ্যাঁ, বলো, জাহাঙ্গীর। আশা করি ভাল কোন খবর দেবে।'

'আমি দুঃখিত, মসিয়ে।'

'মানে? ভিনসেন্ট ইউএন কমব্যাট ইউনিটকে ধরতে পারেননি?'

'না, এখনও পারেননি। প্লেনটা ধ্বংস হয়েছে ঠিকই, তবে মরুভূমির কোথাও তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'খুঁজে না পাবার কি কারণ? বালিতে কোন দাগ নেই?'

'হয়তো ছিল, বাতাসে তা মুছে গেছে।'

একটু থেমে গাসকিল জিজ্ঞেস করলেন, 'খনির কি অবস্থা?'

'বন্দীরা দাঙ্গা বাধায়, গার্ডদের খুন করে...সমস্ত ইকুইপমেন্ট ভেঙে ফেলেছে, তছনছ করেছে অফিস। আপনার অনেক এঞ্জিনিয়ারও মারা গেছে। মাইন আবার চালু করতে ছ'মাস লেগে যাবে।'

'শানিন?'

'কোন খোঁজ নেই। লাশও পাওয়া যায়নি। আমার লোকজন অবশ্য অলিভাকে পেয়েছে। মানে লাশটা আর কি। চেনার কোন উপায় নেই, বন্দীরা খেপে গিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে বলে মনে হয়।'

'শানিনকে তাহলে বন্দীরা নিয়ে গেছে, আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষি দেয়ানোর জন্যে!'

'এখুনি বলা মুশকিল,' জবাব দিল জাহাঙ্গীর। 'মালিয়ান বন্দীদের এইমাত্র জেরা শুরু করেছে জেনারেলের অফিসাররা। আপনার জন্যে আরও একটা খারাপ খবর আছে, মসিয়ে। একজন আহত গার্ড বলছে, মাসুদ রানা আর ববি

মুরল্যাণ্ডকে সে নাকি চিনতে পেরেছে। ধরে নিতে হয় এক হপ্তা আগে মাইন থেকে পালিয়ে আলজিরিয়া চলে যায় তারা, ফিরে আসে ইউএন টীম নিয়ে।'

'সর্বনাশ! তারমানে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে ওদের।' মাথাটা ঘুরে উঠল গাসকিলের। 'তারা পালিয়েছে, এ খবর শানিন আমাদেরকে জানায়নি কেন?'

'বোঝাই যায়, ভয়ে।'

'মাইনের বন্দীরা অনেকেই আমাদের ফোর্ট ফরোর রহস্য সম্পর্কে জানে, এখন তাহলে তো সবই ফাঁস হয়ে যাবে।'

'ওদের কাছে কোন প্রমাণ নেই,' বলল জাহাঙ্গীর। 'দু'জন বিদেশী, বেআইনীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে মালির বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কাজ করেছে, আন্তর্জাতিক মহলে খুব একটা গুরুত্ব পাবে না তারা।'

'নিউজ মিডিয়ার লোকজন ঝাঁকে ঝাঁকে চলে আসবে, তাদের সঙ্গে থাকবে এনভায়রনমেণ্টাল ইনভেস্টিগেটররা।'

জাহাঙ্গীর অভয় দিয়ে বলল, 'চিন্তা করবেন না। জেনারেলকে আমি বলে দিচ্ছি, তিনি যেন সীমান্ত সীল করে দেন। তারপরও যদি কেউ ঢুকে পড়ে, তাকে দেখামাত্র বহিষ্কার করা হবে।'

'জেনারেলের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানো তুমি?' জিজ্ঞেস করলেন গাসকিল।

'উনি বলছেন, ওরা আলজিরিয়ায় যায়নি, মালিতেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে।'

'মৌরিতানিয়ার দিকে যায়নি তো?'

'অসম্ভব। কারণ ওদিকে গেলে এক হাজার কিলোমিটার মরু পেরুতে হবে।'

'যেভাবে হোক ওদেরকে থামাতে হবে, জাহাঙ্গীর,' গাসকিল যেন আবেদন জানাচ্ছেন। 'ওদের চিহ্ন পর্যন্ত রাখা চলবে না।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,' বলল জাহাঙ্গীর, 'মালি থেকে তারা বেরুতে পারবে না। জেনারেল ভিনসেণ্টকে তারা ফাঁকি দিলেও, আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করব আমি।'

মোহাম্মদ কাসিম ট্রেন দেখার অপেক্ষায় তার উটের ছায়ার বসে আছে। নিজের গ্রাম থেকে রওনা হবার পর দু'শো কিলোমিটার পেরুতে হয়েছে তাকে, কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও উটের পিঠে চড়ে। একজন ব্রিটিশ কয়েকজন ট্যুরিস্ট নিয়ে ওদের গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল, তার কাছ থেকে এই ট্রেনের গল্প শুনেছে সে।

কাসিমের বয়স মাত্র পনেরো, অনেক মিনতি করে বাপের কাছ থেকে একটা উট নিয়ে এসেছে সে। ইস্পাতের তৈরি বিশাল দানবকে দেখার খুব শখ তার। চারচাকার গাড়ি, প্লেন, ক্যামেরা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি অবাক করা জিনিস দেখেছে সে, কিন্তু কখনও কোন ট্রেন দেখেনি। অপেক্ষা করার সময় শুকনো মিষ্টি আর চা খাচ্ছে সে। লাইনের ধারে তিন ঘণ্টা ধরে বসে আছে, অথচ এখনও কিছু আসছে না। এক জায়গায় বসে থাকতে ভাল লাগল না, উটের পিঠে চড়ে রওনা

হলো ফোর্ট ফরোর দিকে। মরুভূমির মাঝখানে মাথাচাড়া দিয়ে আছে প্রকাণ্ড সাদা বিল্ডিংগুলো, এই সুযোগে কাছ থেকে একবার দেখে নেয়া যাক।

বহুকাল আগে পরিত্যক্ত ফরেন লীজন দুর্গটাকে পাশ কাটাবার সময় তার কৌতূহল হলো। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা জায়গা একদম নির্জন পড়ে আছে। গেটের কাছে এসে দেখল, ভেতর থেকে বন্ধ সেটা। উট থেকে নেমে পাঁচিল ঘেঁষে এগোল সে, ভেতরে ঢোকার আর কোন পথ আছে কিনা দেখছে। কিন্তু না, হতাশ হতে হলো তাকে; মাটি আর পাথরের নিরেট পাঁচিল ছাড়া কিছুই তার চোখে পড়ল না।

পশ্চিমে, রেললাইনের দিকে তাকাল কাসিম। লাইন ধরে ছোট আকৃতির কি যেন একটা এগিয়ে আসছে দেখে উট নিয়ে এগোল সে। জিনিসটা কাছাকাছি আসতে মনটা দমে গেল তার। না, এটা কোন ট্রেন নয়। লাইন ধরে এল, তবে ছোট একটা মোটরকারের মত দেখতে। ওকে দেখে দু'জন লোক নামল সেটা থেকে। লোক দু'জন আসলে সেকশন হ্যাণ্ডস, রেললাইন চেক করতে বেরিয়েছে। দু'জনের মধ্যে একজন বিদেশী শ্বেতাঙ্গ, অপরজন মুর। তাদেরকে সালাম দিল কাসিম।

জবাব দিল মুর লোকটা। তারপর সে জানতে চাইল, 'কোত্থেকে আসছ, বাছা?'

গ্রামের নাম বলল কাসিম, তারপর জানাল, 'ট্রেন দেখতে এসেছি।'

'এত দূর থেকে একা চলে এলে? তোমার তো খুব সাহস!'

'ও কিছু না!' কাসিমের বলার সুরে গর্ব প্রকাশ পেল।

'তোমার উটটা দেখছি খুব তাজা।'

'হবে না, এটাই আব্বুর সেরা যে।'

হাতঘড়ি দেখল মুর। 'একটা ট্রেন মৌরিতানিয়া রওনা হবে...আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর।'

'শুকরিয়া, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করব,' বলল কাসিম।

'পুরানো দুর্গের ভেতর ঢুকেছিলে? কিছু চোখে পড়ল?'

মাথা নাড়ল কাসিম। 'কি করে ঢুকব, গেট তো ভেতর থেকে বন্ধ।'

পরস্পরের দিকে তাকাল লোক দু'জন, ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলল নিজেদের মধ্যে। তারপর আবার কাসিমকে প্রশ্ন করা হলো, 'তুমি ঠিক জানো? দুর্গের গেট তো সব সময় খোলা থাকে। ভেতরে আমরা লাইন মেরামতের সরঞ্জাম রাখি।'

'আমি মিথ্যে বলি না। বিশ্বাস না হয় আপনারা নিজেরা দেখে আসুন।'

লাইনের দিকে পিছন ফিরে খানিক হাঁটল মুর, গেটের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এল আবার। শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীকে বলল, 'ঠিকই বলছে ও। গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ।'

চেহারায় উদ্বেগ, সঙ্গী বলল, 'এখুনি প্রজেক্টে গিয়ে রিপোর্ট করা দরকার।'

মোটর কার্ট-এ চড়ল তারা। কাসিমকে মুর বলল, 'ট্রেন যখন আসবে, লাইনের খুব কাছাকাছি থেকো না, আর উটটাকে সামলে রেখো।' মোটর কার্ট

ওয়েস্ট প্রজেক্টের দিকে চলে গেল।

অদৃশ্য এক ডজন মেশিন গান তাক করা থাকলেও, কর্নেল মিরাক বেদুইন বালক ও রেলরোড সেকশন হ্যাণ্ডদের গুলি করে ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিতে পারলেন না। মোটর-কার্ট চলে যাবার পর ক্যাপটেন জুয়ান ডিগো বলল, 'কি মনে হয় আপনার?'

এখনও লাইনের ধারে উট নিয়ে বসে রয়েছে কিশোর ছেলেটা, সেদিকে তাকিয়ে থেকে কর্নেল বললেন, 'ওরা যদি প্রজেক্টের সিকিউরিটি গার্ডকে রিপোর্ট করে যে দুর্গের গেট ভেতর থেকে বন্ধ, আর্মড পেট্রল চলে আসবে।'

হাতঘড়ি দেখল ক্যাপটেন। 'রাত হতে এখনও সাত ঘণ্টা। এই আশায় থাকতে হবে যে পেট্রল পাঠাতে দেরি করবে ওরা।'

'জেনারেল ইথারের কাছ থেকে কোন খবর এল?'

'যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে,' জানাল ক্যাপটেন। 'তেবেজা থেকে আসার পথে রেডিওটা পড়ে গিয়েছিল, সার্কিটে ক্রটি দেখা দিয়েছে। ট্র্যান্সমিট করতে পারছি না, রিসেপশনও খুব দুর্বল। জেনারেলের শেষ মেসেজটা ভালভাবে ডিকোড করা যায়নি। অপারেটর যতটুকু বুঝতে পেরেছে তারচেয়ে বেশি আন্দাজ করছে।'

'কি মেসেজ?'

'একটা আমেরিকান স্পেশাল অপারেশন ফোর্স আমাদেরকে তুলে নেবে মৌরিতানিয়া থেকে।'

কর্নেলের চোখে অবিশ্বাস। 'আমেরিকানরা আসছে, তবে মৌরিতানিয়া পর্যন্ত? গুড গড, মৌরিতানিয়া এখান থেকে তিনশো কিলোমিটার দূরে!'

'মেসেজটা পরিষ্কার নয়, স্যার।'

'মি. রানার ধাঁধার অর্থ অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বুঝতে পেরেছেন কিনা তাই বা কে বলবে। ক্যাপটেন, তুমি বুঝতে পারছ কি, আমরা এখানে ফাঁদে আটকা পড়ে গেছি?'

'আমি আশাবাদী, স্যার।'

'ভাল, ভাল!' আবার কিশোর ছেলেটার দিকে তাকালেন কর্নেল।

এককালে হয়তো মোটর পুল ছিল, ছাদটা অনেক আগেই ধসে পড়েছে; ঘুরেফিরে জায়গাটা দেখছে রানা। বাতিল লোহা-লক্কড়ের আবর্জনার ভেতর দশ-বারোটা ডিজেল ফুয়েলের স্টীল ড্রাম দেখল ও। মেটাল কনটেইনারে টোকা দিতে বোঝা গেল গোটা ছয়েক খালি নয়। প্যাঁচ ঘুরিয়ে ক্যাপ খুলছে, ছায়ার ভেতর এসে দাঁড়াল মুরল্যাণ্ড। 'কি, দোস্ত, আগুন ধরাবার আয়োজন করছ?'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়, বিশেষ করে যদি আর্মারড ভেহিকেল হামলা করে,' বলল রানা। 'প্লেনটার সঙ্গে ইউএন ট্রুপের অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইল লঞ্চারও ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'এখানে ডিজেল ফুয়েল এল কোত্থেকে? রেল কর্মীরা রেখে গেছে?'

ক্যাপ খুলে ভেতরে আঙুল ঢোকাল রানা। 'বোধহয়।'

'মলোটভ ককটেল ছাড়া আর কি কাজে লাগবে? অবশ্য শত্রুরা পাঁচিলের নিচে এলে, ওপর থেকে তাদের মাথায় ঢেলে দেয়া যায়, তারপর একটা দেশলাইয়ের কাঠিই যথেষ্ট।'

'টরশন স্প্রিঙ বো দেখেছ কখনও?'

'যদি বলি ছবি এঁকে দেখিয়ে দাও, বোকা ভাববে?'

মুরল্যাণ্ডকে অবাক করে দিয়ে ঠিক তাই করল রানা। পায়ে বাঁধা খাপ থেকে দু-ধারী কমাণ্ডো নাইফ বের করে হাঁটু গেড়ে বসল, মেঝের ধুলোয় একটা ডায়াগ্রাম আঁকছে। নকশাটা একটু ভোঁতা হলো, তবে রানা কি ভাবছে তার একটা ধারণা পাওয়া গেল। কাজটা শেষ হতে জিজ্ঞেস করল ও, 'কি মনে হয়, এরকম একটা জিনিস তৈরি করা সম্ভব?'

'সম্ভব,' জবাব দিল মুরল্যাণ্ড। 'দুর্গে বীম আছে প্রচুর। পারসোনেল ভেহিকেল থেকে পাওয়া যাবে নাইলন লাইন, ইমার্জেন্সী টোইং-এর জন্যে রাখা হয়েছে। তবে টরশন-এর জন্যে কিছু একটা দরকার হবে।'

'রিয়ার অ্যাক্সেলের লীফ স্প্রিঙ?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল মুরল্যাণ্ড। 'হ্যাঁ, চলবে।'

'তুমি হাত লাগাও, আমি একটু ঘুরে আসি,' বলে চলে গেল রানা।

ঘুরে আসি বলে দেড়-দু'ঘণ্টা পর ফিরল রানা। একটা পারসোনেল ক্যারিয়ারের নিচে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে মুরল্যাণ্ড, চেসিসের একটা স্প্রিঙ খুলছে, তার সীমিত দৃষ্টিপথে রানার বুট জোড়া দেখা গেল। 'কোথায় ছিলে তুমি?' জানতে চাইল সে, একটা শ্যাকল বোল্ট থেকে পাঁচ ঘুরিয়ে নাট-বল্টু খুলছে।

'অসুস্থ আর দুর্বলদের সেবা করছিলাম,' জবাব দিল রানা।

'এবার তাহলে তোমার অভূতপূর্ব আইডিয়ার সেবা করো খানিক। অফিসার্স কোয়ার্টারের সিলিং থেকে বীমগুলো খুলে নিয়ে এসো।'

'তোমাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে।'

'দুঃখের বিষয় যে তুমিও নও,' অভিযোগের সুরে বলল মুরল্যাণ্ড। 'এ-সব তুমি কিভাবে জোড়া লাগাবে ভেবে ঠিক করো।'

মুরল্যাণ্ডের দৃষ্টিপথের ভেতর কাঠের একটা ছোট পিপে নামাল রানা। 'সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। মেস হলে আধ পিপে ভর্তি স্পাইক পেয়েছি আমি।'

'মেস হলে?'

'মানে মেস হলের লাগোয়া একটা স্টোররূমে।'

ভেহিকেলের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে রানাকে খুঁটিয়ে দেখল মুরল্যাণ্ড, লক্ষ করল রানার চুল এলোমেলো হয়ে আছে, বুটের ফিতে লাগানো হয়নি, কমব্যাট সুট আধখোলা। সে সকৌতুকে বলল, 'ওখানে তুমি শুধু স্পাইক খুঁজতে গিয়েছিলে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

রেলরোড সেকশন হ্যাণ্ডদের রিপোর্ট ফোর্ট ফরো থেকে জেনারেল ভিনসেণ্টের সিকিউরিটি হেডকোয়ার্টারে সময় মতই পৌঁছুল। রিপোর্টটা পড়ল মেজর সাদি মোসাদ্দেক, জেনারেলের পার্সোনাল ইণ্টেলিজেন্স অফিসার। রিপোর্টটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি, কাজেই স্যাভয় গাসকিলের প্রতিনিধি মঈন জাহাঙ্গীরকে জানাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি সে। প্রতিপক্ষ নিখোঁজ হয়েছে চারশো কিলোমিটার উত্তরে, তার সঙ্গে দুর্গের গেট ভেতর থেকে বন্ধ থাকার কি সম্পর্ক। সে ধরে নিল, সেকশন হ্যাণ্ড দু'জন ভুল দেখেছে।

কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছে অথচ নিখোঁজ ইউএন ফোর্সের কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না দেখে রিপোর্টটা আবার পড়ল সে। ইতিমধ্যে কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। মাথা চুলকে কিছুক্ষণ চিন্তা করল সে, তারপর ফোনের রিসিভার তুলে কথা বলল মালিয়ান এয়ার ফোর্স কমাণ্ডারের সঙ্গে, অনুরোধ করল তেবেজার দক্ষিণে আকাশ থেকে যেন বালির ওপর চোখ বুলানো হয়– চাকার দাগ পাবার আশায়। সাবধানের মার নেই ভেবে একটা নির্দেশ জারি করল সে, ফোর্ট ফরো থেকে কোন ট্রেন বেরুবে না, বাইরে থেকেও কোন ট্রেন ভেতরে ঢুকবে না। ইউএন ফোর্স যদি কোনভাবে মরুভূমি পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে এসে থাকে, নিশ্চয়ই তারা পরিত্যক্ত ফরেন লীজন দুর্গে আশ্রয় নেবে, ভাবল মোসাদ্দেক। তার ধারণা হলো, অন্তত দিনের বেলা ওরা ওখান থেকে বেরুবে না, ট্রেনে চড়ে পালাতে চাইলে রাতের জন্যে অপেক্ষা করবে।

তারপর রিপোর্ট এল, তেবেজা থেকে রেলরোড পর্যন্ত ভেহিকেলের চাকার দাগ পাওয়া গেছে। উত্তেজিত হয়ে উঠল মোসাদ্দেক, আর কোন সন্দেহ নেই। সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ভিনসেণ্টকে ফোন করল সে।

দুর্গের ভেতর সবচেয়ে বেশি ভোগাচ্ছে সময়। কখন অন্ধকার নামবে, তারই অপেক্ষায় মিনিট গুণছে সবাই। আক্রমণের আভাসবিহীন প্রতিটি ঘণ্টাকে ঈশ্বরের সদয় কৃপা বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু বিকেল চারটের দিকে কর্নেল মিরাকের সন্দেহ হলো, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটতে চলেছে।

চোখে বিনকিউলার, একটা র‍্যামপার্ট-এ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন ওয়েস্ট প্রজেক্টের দিকে, এই সময় রানাকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলো ক্যাপটেন জুয়ান ডিগো।

'আমাকে ডেকেছেন, কর্নেল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে রানার দিকে তাকালেন কর্নেল। 'হ্যাঁ, মি. রানা। আচ্ছা, আপনি আর মি. মুরল্যাণ্ড ওয়েস্ট প্রজেক্টে যখন ঢুকলেন, ট্রেন চলাচলের সময়সূচী খেয়াল করেছিলেন?'

'একটা পৌঁছুলে তিন ঘণ্টা পর আরেকটা রওনা হয়,' জবাব দিল রানা।

'তাহলে গত সাড়ে চার ঘণ্টায় কোন ট্রেন দেখা যায়নি কেন?'

'লাইনে ত্রুটি দেখা দিতে পারে। এরকম অনেক কারণেই দেরি হওয়া সম্ভব।'

'আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?'

'না।'

'তাহলে কি ভাবছেন?'

খালি রেললাইনের দিকে তাকিয়ে থেকে রানা বলল, 'ওরা বোধহয় জেনে ফেলেছে আমরা এখানে আছি। ট্রেন রওনা হচ্ছে না, কারণ ওরা ধরে নিয়েছে আমরা সেটা হাইজ্যাক করতে পারি।'

'জেনারেল ইথারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না,' বলল ক্যাপটেন ডিগো। 'আমার প্রস্তাব, স্যার, অনুমতি দিন আমি একাই রওনা হয়ে যাই। সীমান্তে পৌঁছে আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সের সঙ্গে দেখা করি, পথ দেখিয়ে নিয়ে আসি ওদেরকে।'

'সেটা হবে তোমার সুইসাইড মিশন।'

কর্নেলের কথার ওপর কথা বলল রানা, 'প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে, কর্নেল। সাহস করে কেউ কিছু একটা না করলে সবাইকে আমরা বাঁচাতে পারব না।'

'কি বলছেন! সঙ্গে ম্যাপ নেই, যথেষ্ট ফুয়েল নেই, কিভাবে মৌরিতানিয়া পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব?'

রানা জবাব দিল, 'ম্যাপ দরকার নেই, রেললাইন ধরে গেলেই হবে। আর পারসোনেল ক্যারিয়ার থেকে ফুয়েল পাওয়া যাবে। ক্যাপটেন রওনা হবেন ডিউন বাগি নিয়ে, সঙ্গে আমার বন্ধু মি. মুরল্যাণ্ড থাকবেন।'

দু'জন মিলে আধঘণ্টা ধরে যুক্তি দিয়ে বোঝানোর পর রাজি হলেন কর্নেল। ক্যাপটেনকে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, ক্যাপটেন। ভেহিকেলটা রেডি করো তুমি।'

'জ্বী, স্যার। ধন্যবাদ, স্যার।'

'আরেকটা কথা, ক্যাপটেন।'

'স্যার?'

'তোমাকে পালাতে দিতে পারছি না বলে দুঃখিত। বলতে চাইছি, তুমি আমার সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড, তাই এখানে তোমার সার্ভিস আমার দরকার। তোমার জায়গায় অন্য কাকে পাঠানো যায় চিন্তা করে বলো। লেফটেন্যাণ্ট স্টকহোম মণ্টি কার্লো র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছিল বলে শুনেছি।'

হতাশ ভাবটা গোপন করতে পারল না ক্যাপটেন ডিগো। কিছু বলতে গিয়েও বলল না সে, স্যালুট করে ঘুরল, মই বেয়ে নেমে গেল প্যারেড গ্রাউণ্ডে।

রানার দিকে তাকালেন কর্নেল। 'আপনি নিজে যেতে না চেয়ে, আপনার বন্ধুকে পাঠাতে চাইছেন কেন, মি. রানা?'

'মরুভূমি পাড়ি দেয়া কি যে কষ্টকর, সে আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

'আপনি ভয় পাচ্ছেন?' রানার দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল কর্নেল।

'সাংঘাতিক।'

হঠাৎ হাসলেন কর্নেল। 'অভিনয় দেখছি ভালই জানেন। আমরা দু'জনেই জানি যে এখানে থেকে যাওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। এ আপনার বন্ধুকে বাঁচার একটা সুযোগ করে দেয়া। আজকাল এ রকম মহত্ত্ব দেখা যায় না। ইউ হ্যাভ মাই ডীপেস্ট রেসপেক্ট, স্যার!'

'এর মধ্যে কোন মহত্ত্ব নেই, কর্নেল। আমি আসলে একটা কাজ অসমাপ্ত রেখে নড়তে চাইছি না।'

র‍্যামপার্ট-এর কিনারা থেকে নিচের দিকে ঝুঁকলেন কর্নেল, দেখলেন পাঁচিলের আড়ালে অদ্ভুত দর্শন একটা মেশিন ধীরে ধীরে আকৃতি পাচ্ছে। 'আপনার ওই ক্যাটাপাল্ট-এর কথা বলছেন?'

'আসলে ওটা এক ধরনের স্প্রিঙ বো।'

'সত্যি আপনি মনে করেন আর্মারড ভেহিকেলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে?'

'অবশ্যই ব্যবহার করা যাবে,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'তবে কতটা ভালভাবে, সেটা বলা মুশকিল।'

সূর্য অস্ত যাবার খানিক পরই মেইন গেটের সামনে থেকে বালির বস্তা ও অন্যান্য বাধা সরিয়ে ভারি কবাট দুটো খোলা হলো। লেফটেন্যান্ট স্টকহোম প্রকাণ্ডদেহী একজন অস্ট্রেলিয়ান, হুইলের পিছনে নিজেকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকে নিয়েছে, শেষ বারের মত তাকে নির্দেশ দিচ্ছে ক্যাপটেন ডিগো।

ডিউন বাগি থেকে অনেক কিছু খুলে নেয়ার ফলে হালকা হয়ে গেছে সেটা।

রানা ও সিলভিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে মুরল্যাণ্ড। 'বিদায়, দোস্ত।' আড়ষ্ট হাসি লেগে রয়েছে তার ঠোঁটে। 'তোমাদের ফেলে যেতে খারাপ লাগছে আমার।'

বন্ধুকে আলিঙ্গন করল রানা। 'নরম বালির কথা মনে রেখো।'

'লাঞ্চের সময় বিয়ার আর পিজা নিয়ে ফিরে আসছি আমরা দু'জন।'

বলা হলেও, এ-সব কথার কোন অর্থ নেই। সবাই জানে, কাল দুপুরের মধ্যে দুর্গ আর দুর্গের ভেতরের লোকজন স্রেফ একটা স্মৃতিতে পরিণত হবে।

'জানালায় আলো জ্বেলে রাখব আমি,' কৌতুক করল রানা।

মুরল্যাণ্ডের কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল সিলভিয়া, হাতে একটা প্যাকেট গুঁজে দিল। 'সামান্য কিছু খাবার।'

'ধন্যবাদ,' বলে তাড়াতাড়ি ওদের দিকে পিছন ফিরে ডিউন বাগিতে উঠে পড়ল মুরল্যাণ্ড, মুখের হাসি মুছে গেছে। 'আমরা রেডি,' স্টকহোমকে বলল সে।

গিয়ার বদল করল স্টকহোম, পা চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটারে। সামনে লাফ দিল ডিউন বাগি, খোলা গেট দিয়ে ছুটল, পিছনের চাকা থেকে ধুলোর মেঘ উঠল। সীটে বসে মোচড় খেলো মুরল্যাণ্ড, পিছন দিকে তাকাল। গেটের বাইরে রয়েছে রানা, এক হাতে সিলভিয়ার কোমর জড়িয়ে। একটা হাত তুলে নাড়ল ও।

প্রতিপক্ষ ইউএন ফোর্স পরিত্যক্ত দুর্গে লুকিয়ে আছে, জেনারেলকে এ তথ্য দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল পদে প্রমোশন পেয়ে গেল সাদি মোসাদ্দেক। অপারেশনে সে তার দায়িত্ব পালন করেছে, এটা ধরে নিয়ে ছুটির একটা দরখাস্ত রেখে নিজের গ্রামের বাড়িতে চলে গেল সে। জেনারেল ভিনসেন্টের দুর্ভাগ্য, যখন তার ইন্টেলিজেন্স চীফকে সবচেয়ে বেশি দরকার তখনই তাকে পাওয়া যাবে না।

ফোনে মঈন জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন স্যাভয় গাসকিল, পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বশেষ খবর রাখছেন।

'আমরা ওদেরকে পেয়ে গেছি,' বলল জাহাঙ্গীর, সাদি মোসাদ্দেকের কৃতিত্বটা নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছে। 'সীমান্তের দিকে না গিয়ে মালির আরও ভেতরে ঢুকে পড়েছে ওরা। এই মুহূর্তে পরিত্যক্ত দুর্গের ভেতর ফাঁদে আটকা পড়েছে।'

'শুনে খুশি হলাম,' বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন গাসকিল। 'জেনারেলের প্ল্যানটা কি?'

'ওদেরকে তিনি আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানাবেন।'

'যদি আত্মসমর্পণ করে? তারপর কি হবে?'

'কমাণ্ডো আর অফিসারদের বেআইনী অনুপ্রবেশের অভিযোগে বিচার করা হবে। রায় ঘোষণার পর ওদেরকে জিম্মি হিসেবে আটক রাখা হবে, মুক্তিপণ হিসেবে চাওয়া হবে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক সাহায্য। আর তেবেজো বন্দীদের পাঠিয়ে দেয়া হবে ইন্টারোগেশন চেম্বারে।'

'না,' বললেন গাসকিল। 'আমি ঠিক এ-ধরনের সমাধান চাইছি না। একমাত্র সমাধান হলো ওদের সবাইকে মেরে ফেলা, এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। কথা বলতে পারে এমন একজনেরও বেঁচে থাকা চলবে না। আমি চাই না জটিলতা আরও বাড়ুক। আমি কি চাইছি জেনারেলকে এখুনি তুমি জানাও।'

গাসকিলের চাহিদা এমন অপ্রত্যাশিত ও ভীতিকর লাগল, কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারল না জাহাঙ্গীর। 'ঠি-ঠিক আছে, মসিয়ে। জেনারেলকে আমি বোঝাতে চেষ্টা করছি তিনি যেন ভোর হলেই ফাইটার জেট পাঠান। সঙ্গে হেলিকপ্টার অ্যাসল্ট ইউনিটও থাকবে। ভাগ্যটা ভাল, কারণ চারটে হেভি ট্যাংক আর তিনটে ইনফ্যানট্রি কম্পানি কাছাকাছিই আছে।'

'আজ রাতে তিনি আক্রমণ করতে পারেন না?'

'প্রস্তুতির জন্যে সময় দরকার, মসিয়ে। ভোরের আগে সম্ভব বলে মনে হয় না।'

'যাই ঘটে যাক, মাসুদ রানা আর তার বন্ধু যেন কোন ভাবেই পালাতে না পারেন।'

'বিশেষ করে ওরা দু'জন পালাতে চেষ্টা করবে ভেবেই তো ট্রেন ছাড়তে নিষেধ করে দিয়েছি আমি,' বলল জাহাঙ্গীর।

'তুমি এখন কোথায়?'

'গাও থেকে বলছি, জেনারেলকে উপহার দেয়া আপনার কমাণ্ড এয়ারক্রাফটে উঠতে যাচ্ছি। জেনারেল নিজে ফিল্ডে থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।'

'মনে থাকে যেন, জাহাঙ্গীর,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন গাসকিল, 'কাউকে যেন বন্দী করা না হয়।'

ঠিক সকাল ছ'টায় হামলা হলো।

পাঁচিলের গোড়ায় গভীর গর্ত খুঁড়তে হয়েছে, ইউএন ট্যাকটিকাল টীমের সদস্যরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেও সজাগ ছিল সবাই, আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বেশিরভাগই গর্তের ভেতর ছিল, জানত যে-কোন মুহূর্তে এয়ার অ্যাটাক শুরু হবে। ব্যারাকের নিচে পাতালে ফিল্ড হসপিটাল খুলেছে টীমের মেডিকেল সদস্যরা। ফ্রেঞ্চ এঞ্জিনিয়াররাও বসে নেই, সিলিং থেকে পাথর বা ফার্নিচার পড়লে দ্রুত সরিয়ে ফেলার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে আছে। ভলকান-এ কয়েকজন ক্রু রয়েছে, কর্নেল মিরাক ও ক্যাপটেন ডিগোও রয়েছে তাদের সঙ্গে। ভলকানটাকে অ্যাসল্ট ভেহিকেল থেকে তুলে আনা হয়েছে দুর্গের পাঁচিলে, ওটাকে আড়াল করে রেখেছে প্যারাপিট আর বালির বস্তা।

দেখতে পাবার আগেই জেট প্লেনের আওয়াজ ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে বিপদসঙ্কেত বাজিয়ে দেয়া হলো।

রানা ছুটল না, স্প্রিংগু বো নিয়ে ব্যস্ত, দ্রুত হাতে শেষ মুহূর্তে কয়েকটা জিনিস অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছে। এলোমেলোভাবে সাজানো অনেকগুলো কাঠের বীমের ওপর খাড়া করা হয়েছে ট্রাক স্প্রিংগু, বাঁকিয়ে প্রায় দু'ভাঁজ করা হয়েছে সেটাকে। কাজটা সম্ভব হয়েছে অন্যান্য রেলরোড সাপ্লাইয়ের সঙ্গে একটা ফর্কলিফট থাকায়, ওই ফর্কলিফটে হাইড্রলিক লিফটিং গিয়ার ছিল। বাঁকানো স্প্রিংগুলোর সঙ্গে আটকানো হয়েছে খাঁজ কাটা বোর্ডে শোয়ানো একটা ডিজেল ড্রাম, অর্ধেকটা তেলে ভরা। ড্রামের ওপর দিকটায় অনেকগুলো গর্ত করা হয়েছে। বোর্ডটা একদিকে বেশ অনেকটা ঢালু।

জিনিসটা জোড়া লাগাতে কর্নেলের লোকজন সাহায্য করেছে, যদিও তাদের সন্দেহ আছে যে পাঁচিলের ওপর থেকে ফুয়েল ভর্তি ড্রাম নিচে ছুঁড়ে ফেলা সম্ভব কিনা। তাদের ভয়, দুর্গের ভেতরই না বিস্ফোরিত হয় ওটা। সেক্ষেত্রে প্যারেড গ্রাউণ্ডে সবাই তারা মারা পড়বে।

প্যারাপিটের পিছনে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছেন কর্নেল, তাঁর পিছন দিকটা বালির বস্তা দিয়ে সুরক্ষিত, মুখ তুলে তাকিয়ে আছেন মেঘমুক্ত আকাশের দিকে। চোখে বিনকিউলার থাকায় তিনিই প্রথমে প্লেনগুলোকে দেখতে পেলেন। মরুভূমির

সারফেস থেকে মাত্র পাঁচশো মিটার উঁচুতে ওগুলো, দুর্গ থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দক্ষিণে।

জেনারেল ভিনসেন্ট ফরাসীদের কাছ থেকে মিরেজ ফাইটার কিনেছেন যতটা না যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে, তারচেয়ে বেশি লোককে দেখানোর জন্যে। প্রতিবেশীরা আরও বেশি দুর্বল, কাজেই তাদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা অর্জনের অভিলাষ তাঁর পুরোপুরি পূরণ হয়েছে মালিয়ান এয়ারফোর্সে মিরেজ ফাইটার থাকায়।

মালিয়ান অ্যাটাক ফোর্সকে সাহায্য করছে হালকা অস্ত্রে সজ্জিত হেলিকপ্টারের একটা ছোট বহর। শুধু ফাইটারগুলো মিসাইল ছুঁড়তে পারে, আর্মারড ট্যাংক ধ্বংস করার জন্যে। মিসাইল থাকলেও, লেযার-গাইডেড নয়। মাইক্রোফোনে নির্দেশ দিলেন কর্নেল, 'ক্যাপটেন ডিগো, ভলকান ক্রুদের তৈরি হতে বলো। রেডি টু ফায়ার।'

'রেডি টু ফায়ার,' উল্টোদিকের র‍্যামপার্ট থেকে পুনরাবৃত্তি করল ক্যাপটেন।

'প্রথম প্লেনটা আগে মিসাইল ছুঁড়ুক,' বললেন কর্নেল। 'বাঁক নিয়ে ফিরে যাবার সময় পিছন থেকে গুলি করবে। সময়ের হিসেবটা নির্ভুল হওয়া চাই। দ্বিতীয় প্লেন মিসাইল ছোঁড়ার আগেই আঘাত হানবে।'

'ইয়েস, স্যার।'

ক্যাপটেনের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁক থেকে বেরিয়ে এল একটা মিরেজ, পঁচাত্তর মিটার নিচে নেমে এল, গ্রাউণ্ড ফায়ার এড়াবার জন্যে আঁকাবাঁকা পথও ধরেনি পাইলট। একজোড়া মিসাইল ছুঁড়ল সে, সামান্য একটু দেরি করে।

দুর্গের মাথার ওপর দিকে ছুটে গেল প্রথম মিসাইল, হাই এক্সপ্লোসিভ ওঅরহেড বিস্ফোরিত হলো বালির ওপর, কারও কোন ক্ষতি হলো না। দ্বিতীয়টা আঘাত হানল উত্তর প্যারাপিটে, বিস্ফোরিতও হলো, পাঁচিলের বড় একটা অংশ উড়িয়ে নিয়ে গেল, নিচের প্যারেড গ্রাউণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল একরাশ পাথর।

ভলকানের ক্রুরা ফায়ার ওপেন করল ফাইটারটা যখন দুর্গের ঠিক মাথার ওপর। বাঁক ঘোরার সঙ্গে ওপরে উঠে নাগালের বাইরে চলে যেতে চাইছে পাইলট, একরাশ বিশ মিলিমিটার শেল আঘাত করল পিছন থেকে। একটা ডানা এমন ভাবে কাটা পড়ল, যেন মাখনের ওপর কেউ ছুরি চালিয়েছে। চিৎ হয়ে গেল ফাইটার, পড়ে গেল বালির ওপর।

কোন বিরতি নেয়নি ভলকান, আরেক পশলা শেল ছুটে গেল দ্বিতীয় ফাইটারের সামনের পথে, আঘাত করল নাকে-মুখে। কালো খানিকটা ধোঁয়া দেখা গেল, তারপরই বিস্ফোরিত হলো কমলা রঙ, সেটা ছড়িয়ে পড়ল দুর্গের আউটার ওয়ালের গায়ে।

তৃতীয় ফাইটার মিসাইল ছুঁড়ল সময়ের অনেক আগে, কাছাকাছি না এসে বাঁক ঘুরে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। কর্নেল মিরাকের ঠোঁটে সকৌতুক হাসি, তাকিয়ে আছেন দুর্গের দুশো মিটার সামনে জোড়া গর্তের দিকে।

লিডারকে হারিয়ে রণে ভঙ্গ দিল মালিয়ান স্কোয়াড্রন, নাগালের বাইরে উদ্দেশ্যবিহীন চক্কর দিচ্ছে।

'নাইস শুটিং,' ক্রুদের বাহবা দিলেন কর্নেল। 'এখন ওরা জানে যে আমরা কামড় দেব, কাজেই মিসাইল আরও দূর থেকে ছুঁড়বে।'

'আর মাত্র ছ'শো রাউণ্ড হাতে আছে,' রিপোর্ট করল ক্যাপটেন ডিগো।

পাইলটরা তারস্বরে রেডিওতে চিৎকার করছে, শুনতে পাচ্ছেন জেনারেল ভিনসেণ্ট, ভিডিও টেলিফটো সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যর্থ এয়ার অ্যাটাকের শুরুটাও চাক্ষুষ করার সুযোগ হলো তাঁর। অপ্রত্যাশিত পাল্টা আক্রমণ হওয়ায় ঘাবড়ে গেছে পাইলটরা, আতঙ্কিত শিশুর মত জানতে চাইছে এরপর কি করা হবে।

রাগে কমলা হয়ে গেল চেহারা, কমিউনিকেশন কেবিনে ঢুকে রেডিওতে চিৎকার জুড়ে দিলেন তিনি। 'কাপুরুষের বাচ্চারা! আমি জেনারেল ভিনসেণ্ট বলছি! তোমরা আমার ডান হাত। ঝাঁপিয়ে পড়ো, ঝাঁপিয়ে পড়ো! সব কিছু তছনছ করে দাও! কেউ যদি সাহসের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হও, নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হবে তাকে, পরিবারের সদস্যদের পাঠিয়ে দেয়া হবে জেলে।'

পাইলটদের ট্রেনিং এখনও শেষ হয়নি, তাদের আত্মবিশ্বাসও প্রবল নয়, শত্রু নিধনের চেয়ে সুন্দরী মেয়েদের পিছু ধাওয়া করতেই বেশি অভ্যস্ত তারা। জেনারেলের হুমকি শুনে হামলা চালিয়ে গেলেও, দুর্গের কাছাকাছি ভুলেও গেল না।

র‍্যামপার্টগুলোর মাঝখানে এমন নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কর্নেল মিরাক, তিনি যেন মরণশীল নন। দ্বিতীয় দফায় হামলা করল এক জোড়া মিরেজ ফাইটার। দূর থেকে মিসাইল ছুঁড়ে পালিয়ে গেল পাইলটরা। চারটে মিসাইলই বিস্ফোরিত হলো রেললাইনের ওপরে।

এরপর বিভিন্ন দিক থেকে এল মিরেজ, কখন কোনদিক থেকে আসবে আগে থেকে কিছু বুঝতে না দিয়ে। নিয়ম অনুসারে দুর্গের বিশেষ একটা অংশে বারবার হামলা করা উচিত ছিল, যতক্ষণ সেদিকটা পুরোপুরি ধ্বংস না হয়, তা না করে যেখানে সুযোগ পেল সেখানেই হামলা চালাল। পাল্টা গুলি হচ্ছে না, কাজেই ধীরে ধীরে তাদের সাহস বাড়ছে, আগের মত লক্ষ্যভ্রষ্টও হচ্ছে না। দুর্গের পাঁচিল ধসে পড়তে শুরু করল।

তারপর কর্নেলের ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হলো। পাইলটদের সাহস মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। মিসাইল ছোঁড়ার আগে একদম কাছে চলে আসছে তারা। ছোট্ট কমাণ্ড পোস্টের পিছনে সিধে হলেন তিনি, হাত ঝাপটা দিয়ে কমব্যাট সুট থেকে ধুলো ঝাড়লেন। 'ক্যাপটেন ডিগো, আমরা কেউ হতাহত হয়েছি?'

'সেরকম কোন রিপোর্ট এখনও পাইনি, স্যার।'

'এবার ভলকান তার শেষ দায়িত্ব পালন করতে পারে।'

'আপনার হুকুমের অপেক্ষায়, স্যার।'

'তোমার প্ল্যান যদি নিখুঁত হয়, যা শেল আছে তা দিয়ে ওদের আরও দুটোকে ফেলে দেয়া যায়।'

কাজটা সহজ হয়ে গেল একজোড়া মিরেজ ডানা সোজা রেখে খোলা মরুভূমির ওপর দিয়ে ছুটে আসায়। ব্যারেল ঘুরিয়ে লক্ষ্যস্থির করল ভলকান, তারপর ফায়ার হলো। প্রথমে মনে হলো ক্রুরা ব্যর্থ হয়েছে, তারপর দেখা গেল ডানদিকের মিরেজটা কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ল, ধোঁয়ার ভেতর থেকে আগুনের শিখা বেরুচ্ছে। প্লেনটা বিস্ফোরিত হয়নি, এ-ও মনে হলো না যে পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। শুধু নাকটা নিচের দিক তাক করে নামতে শুরু করল, বালিতে আঘাত না করা পর্যন্ত থামল না।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মিরেজের দিকে ঘুরে গেছে ভলকান। শেষ রাউণ্ডগুলো বেরিয়ে গেল। রিভলভিং ব্যারেল অকস্মাৎ বোবা হয়ে গেছে। তবে এবারও লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। কোন ধোঁয়া বা আগুন দেখা গেল না। খেলনা প্লেনের মত নিচে পড়ল মিরেজ, ড্রপ খেলো একবার, ছুটে এসে ধাক্কা মারল পুবদিকের পাঁচিলে, পাঁচিল ভেঙে ঢুকে পড়ল ভেতরে। ধাক্কা খাবার সময়ই বিস্ফোরিত হয়েছে, প্যারেড গ্রাউণ্ডের চারদিকে পাথর আর জ্বলন্ত আবর্জনা ছড়িয়ে পড়ল, কাত হয়ে পড়ে গেল অফিসার্স কোয়ার্টারের দেয়াল।

রানাকে যেন একটা ঘূর্ণিতে পেল, তুলে ধরে আছাড় মারল মেঝেতে। মনে হলো বিস্ফোরণটা সরাসরি ওর ওপর দিকে কোথাও ঘটেছে, যদিও প্লেনটা বিস্ফারিত হয়েছে দুর্গের উল্টোদিকে। এত দীর্ঘ শ্বাস নিচ্ছে, যেন অক্সিজেনের অভাব মিটছে না। ধীরে ধীরে উঠে বসল, গলায় ধুলো লাগায় কাশতে শুরু করল। প্রথমেই স্প্রিঙ বো-র কথা ভাবল ও। ধুলোর রাজ্যে এখনও অক্ষত রয়েছে ওটা। তারপর লক্ষ করল, ওর পাশে একটা লোক পড়ে রয়েছে।

'মাই...গড!' থেমে থেমে, কর্কশস্বরে বলল সে।

এতক্ষণে ক্যাপটেন ডিগোকে চিনতে পারল রানা, বিস্ফোরণের ধাক্কায় র‍্যামপার্ট থেকে ছিটকে নিচে পড়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ও, বন্ধ চোখ দুটোর ওপর ঝুঁকল। ক্যাপটেনের ঘাড়ের পাশে পালস থাকায় বোঝা গেল বেঁচে আছে সে। 'আপনার আঘাত কতটুকু গুরুতর?' জিজ্ঞেস করল ও, আর কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'ফুসফুসে বাতাস নেই, আর পিঠটা বোধহয় ভেঙে গেছে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ক্যাপটেন।

প্যারাপিটের ধসে পড়া অংশের দিকে তাকাল রানা। 'অনেকটা ওপর থেকে পড়েছেন আপনি। তবে কোন রক্ত দেখছি না।' ক্যাপটেনের গায়ে-পিঠে হাত বুলাল ও। 'কোন হাড়ও ভাঙেনি। পা দুটো নাড়তে পারেন কিনা দেখুন চেষ্টা করে।'

হাঁটু উঁচু করল ক্যাপটেন ডিগো, বুট পরা পা দুটো ঘোরাল। 'অন্তত মেরুদণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়নি।' তারপর হাত তুলে রানাকে প্যারেড গ্রাউণ্ডটা দেখাল সে। ধুলো সরে যেতে শুরু করেছে, আবর্জনার স্তূপে তার বেশ কয়েকজন লোক চাপা পড়েছে। 'ওদেরকে বের করুন! প্লীজ, ওদেরকে বের করুন!'

সেদিকে তাকিয়ে নড়ার শক্তি হারিয়ে ফেলল রানা। দুর্গের পাঁচিলটা অসম্ভব

উঁচু আর পুরু ছিল, ভেঙে পড়ায় পাথরের বিশাল স্তূপ ছাড়া কিছুই সেখানে দেখা যাচ্ছে না। ওই স্তূপের ভেতর যদি কোন মানুষ থাকে, তার বেঁচে থাকার কোন প্রশ্ন ওঠে না। একই ভাগ্য বরণ করেছে গর্তের ভেতর যারা ছিল। তাছাড়া, হাত দিয়ে ওই পাথরের স্তূপ সরানো সম্ভব নয়, মেশিন লাগবে।

কি করা উচিত বুঝতে পারার আগেই আরও মিসাইল ছুটে এল, ভেঙে চুরমার করে দিল মেস হল। ছাদের সাপোর্ট বীমগুলোয় আগুন ধরে গেল, সকালের রোদে কাঁপতে শুরু করল লাল শিখাগুলো। দুর্গের বেশিরভাগ পাঁচিল ধসে পড়েছে, তবে সবচেয়ে কম ক্ষতি হয়েছে উত্তরের পাঁচিল। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, গেটটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

তিনটে প্লেন হারিয়ে, ফুয়েল শেষ হয়ে যাওয়ায়, মিরেজ ফাইটারের বহরটা ঝাঁক বেঁধে তাদের দক্ষিণ বেসে ফিরে যাচ্ছে। প্রাণে বেঁচে যাওয়া ইউএন কমাণ্ডোরা আণ্ডারগ্রাউণ্ড শেলটার থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করল, যেন কবর থেকে উঠে আসছে। তাদের মধ্যে অনেককেই দেখা গেল উন্মাদের মত পাথর সরিয়ে সঙ্গীদের উদ্ধার করার কাজে নেমে পড়েছে। কাজটা যে সম্ভব নয়, তারা যেন তা বুঝতে পারছে না।

প্যারাপিট থেকে নেমে এসে নির্দেশ দিতে শুরু করলেন কর্নেল মিরাক। আহতদের সরিয়ে নেয়া হলো, ব্যারাকের নিচে মেডিকেল টীম চিকিৎসা করবে তাদের। সিলভিয়া একা নয়, তার সঙ্গে অন্যান্য মহিলারাও সাহায্য করছে ডাক্তারদের।

আবর্জনা সরাতে নিষেধ করলেন কর্নেল। নির্দেশ শুনে ট্যাকটিকাল টীমের সদস্যরা কাতর হলো, তবে কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। তাদের ব্যথায় কর্নেলও ব্যথিত, তবে তাঁর দায়িত্ব জীবিতদের নিয়ে। যারা মারা গেছে তাদের জন্যে তাঁর কিছুই করার নেই।

পিঠে ব্যথা নিয়ে থেমে থেমে হাঁটছে ক্যাপটেন ডিগো। গোটা দুর্গ ঘুরে আসছে, খোঁজ নিচ্ছে কে কোথায় আহত হয়েছে, উৎসাহ যোগাচ্ছে সবাইকে।

জানা গেল মারা গেছে ছ'জন, গুরুতর আহত হয়েছে তিনজন। প্রাথমিক চিকিৎসা পাবার পর আরও সাতজন নিজেদের পোস্টে ফিরে এল। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত, নিজেকে বোঝালেন কর্নেল। তবে তিনি জানেন যে, এ সবে মাত্র শুরু।

তাঁর ধারণাই সত্যি হলো। একটু পরই দক্ষিণ পাঁচিলের গায়ে বিস্ফোরিত হলো একটা মিসাইল, দু'হাজার মিটার দক্ষিণ থেকে চারটে ট্যাংকের একটা ছুঁড়েছে। এরপর আরও তিনটে ওআয়্যার-গাইডেড মিসাইল আঘাত হানল দুর্গে।

তাড়াতাড়ি আবর্জনার স্তূপে উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল, খানিক আগে যেখানে পাঁচিল ছিল। চোখে বিনকিউলার তুলে ট্যাংকগুলো দেখলেন তিনি। 'ফ্রেঞ্চ এএমএক্স-থারটি-টাইপ ট্যাংক, ফায়ার করছে এসএস-ইলেভেন ব্যাটলফিল্ড মিসাইল।' কথাগুলো রানা ও ক্যাপটেনকে শোনাচ্ছেন তিনি। 'ওরা পদাতিক

বাহিনী পাঠানোর আগে আমাদেরকে আরও একটু নরম করে নিচ্ছে।'

বিধ্বস্ত দুর্গের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। 'নরম করার তেমন কিছু আছে কি?' জনান্তিকে বলল ও।

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে ক্যাপটেনের দিকে ফিরলেন কর্নেল। 'সবাইকে নির্দেশ দাও, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে নেমে যেতে হবে। বাইরে থাকবে শুধু লুকআউট, বাকি সবাই ঝড়ের সময় নিচে থাকব।'

'কিন্তু ট্যাংকগুলো এসে যখন দরজায় নক করবে?' জানতে চাইল রানা।

'তখন আপনার স্প্রিঙ বো যতটুকু পারে সামলাবে,' জবাব দিল ক্যাপটেন ডিগো। 'ট্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে আপনার ওটাই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল।'

'যাক, আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন, স্প্রিঙ বো কাজে লাগতে পারে।' রানার মুখে গম্ভীর হাসি। যদিও ট্যাংক-বিধ্বংসী অস্ত্র হিসেবে স্প্রিঙ বো আদৌ কোন কাজে আসবে কিনা ওর নিজেরও তা জানা নেই।

ছয়

চারশো কিলোমিটার পশ্চিমে দিনের প্রথম আলো ফোটার মুহূর্তে কোথাও কিছু নড়ছে না, আকৃতিবিহীন বালির ওপর বাতাসের এতটুকু নড়াচড়া নেই। শব্দ বলতে শুধু ওদের দ্রুতগতি অ্যাটাক ভেহিকেলের এগজস্ট থেকে মৃদু গুঞ্জন উঠছে, দূর থেকে দেখলে সৈকতের ওপর একটা কালো পিঁপড়ে চরছে বলে মনে হবে।

অনেক নালা পেরুনো সম্ভব ছিল না, সেরকম অনেক বালিয়াড়িও ঘুরে আসতে হয়েছে, অন্তত দু'বার সঠিক পথের সন্ধানে বিশ কিলোমিটার পিছু হটতে হয়েছে ওদেরকে। এ-সব কারণে ঠিক কত দূর এল আন্দাজ করা কঠিন। সেজন্যে কমপিউটারের সামনে বসতে হয়েছে মুরল্যাণ্ডকে। স্ক্রীনের দিকে তাকাতে একটা হিসাব পাওয়া গেল। দুর্গ আর মৌরিতানিয়া সীমান্তের মাঝখানে চারশো কিলোমিটার পেরুতে সময় নিয়েছে ওরা বারো ঘণ্টা। অভিযানের বেশিরভাগ সময় রেললাইন থেকে দূরে ছিল ওরা, সাবধানের মার নেই ভেবে। পথের এক তৃতীয়াংশ ছিল পাথুরে শক্ত জমিন, এখানে সেখানে বোল্ডার ছড়ানো, বোল্ডারের মাঝখানে নুড়ি পাথর। তারপরও ঝাঁকি খেতে খেতে ঘণ্টায় নব্বুই মাইল গতিতে ছুটেছে ওরা, পরিস্থিতির সঙ্গে কোন আপোস করেনি, কারণ জানে সময় মত সাহায্য নিয়ে দুর্গে ফিরতে না পারলে বহু লোক মারা পড়বে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সকে খুঁজে পেতে হবে ওদের। দুপুরের মধ্যে ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে মুরল্যাণ্ড, সেই প্রতিশ্রুতি যেন ব্যঙ্গ করছে তাকে।

'সীমান্ত আর কত দূর?' জানতে চাইল স্টকহোম।

'খালি মরুভূমিতে সাইনবোর্ড থাকে না,' জবাব দিল মুরল্যাণ্ড। 'ইতিমধ্যে আমরা সীমান্ত পেরিয়ে থাকলেও আমি আশ্চর্য হব না।'

'তবু ভাগ্য ভাল যে সকাল হয়ে গেছে।'

'মালিয়ানদের চোখে ধরা পড়ার আশঙ্কা বরং বেড়েছে।'

'আমি বলি কি, চলুন উত্তরে সরে যাই, রেললাইনের পাশ ঘেঁষে এগোই। ফুয়েল গজ শূন্যের ঘরে চলে যাচ্ছে। আর ত্রিশ কিলোমিটার পর হাঁটতে হবে আমাদের।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড।

মিরেজ ফাইটারগুলো সকাল এগারোটায় আবার ফিরে এল। বিধ্বস্ত দুর্গের ওপর আবার তারা মিসাইল ছুঁড়ল। মিরেজ ফিরে যাবার পর কামান দাগল ট্যাংকগুলো, বিস্ফোরণের শব্দে ঘন ঘন কেঁপে উঠল মরুভূমি। তারপর দুর্গের তিনশো মিটারের মধ্যে চলে এল ভিনসেন্টের গ্রাউণ্ড ফোর্স, মর্টার আর স্নাইপার রাইফেল থেকে গুলি করছে অবিরাম। ইউএন ফোর্স দুর্বল হয়ে পড়ায় ক্রমশ তাদের সাহস বাড়ছে।

জেনারেল ভিনসেন্টের কমাণ্ড এয়ারক্রাফট কাছাকাছি একটা শুকনো লেকে ল্যাণ্ড করল। জেনারেলের সঙ্গে নিচে নামল তাঁর চীফ-অভ-স্টাফ কর্নেল খাদেম হুসেন, সঙ্গে আরও রয়েছে মঈন জাহাঙ্গীর। ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল ক্যাপটেন ফয়সল। পথ দেখিয়ে সবাইকে একটা স্টাফ কারে তুলল সে, গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এল ব্যস্ততার সঙ্গে খাড়া করা হেডকোয়ার্টারে। এখানে জেনারেলকে অভ্যর্থনা জানাল তাঁর ফিল্ড কমাণ্ডার, কর্নেল সাদিক জেবরিল।

'আপনি ওদেরকে একদম কোণঠাসা করে রেখেছেন তো?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল।

'ইয়েস, জেনারেল,' দ্রুত জবাব দিল জেবরিল। 'আমার প্ল্যান হলো চূড়ান্ত হামলার আগে ধীরে ধীরে দুর্গের যতটা সম্ভব কাছাকাছি চলে যাব।'

'ইউএন টীমকে সারেণ্ডার করার প্রস্তাব দিয়েছেন?'

'চারবার। প্রতিবারই ওদের লীডার, কর্নেল মিরাক, প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

'জেনারেল ভিনসেন্টের ঠোঁটে নিষ্ঠুর হাসি। 'ওরা যখন মরতেই চায়, আমরা সবরকমভাবে সাহায্য করব।'

'সংখ্যায় ওরা এখন খুবই কম,' তেপায়ায় বসানো টেলিস্কোপে চোখ রেখে বলল মঈন জাহাঙ্গীর। 'দুর্গ তো এরইমধ্যে গুঁড়িয়ে গেছে। আমার ধারণা বেশিরভাগ লোকই ভেঙে পড়া পাঁচিলের নিচে চাপা পড়েছে।'

'আমার লোকজন লড়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে,' বলল জিবরিল। 'নেতাকে ভালবাসে তারা, নেতার জন্যে জান দিতেও দ্বিধা করবে না।'

খুশি হলেন ভিনসেন্ট। 'লড়ার সুযোগ তারা পাবে। এক ঘণ্টার মধ্যে দুর্গ আক্রমণ করার নির্দেশ দিন।'

*

বৃষ্টির মত পড়ছে কামানের গোলা আর বুলেট। ব্যারাকের নিচে ভিড় করেছে কমাণ্ডোরা। তাদের সঙ্গে সিভিলিয়ানরাও রয়েছে। খিলান আকৃতির ছাদ, পাথুরে অবলম্বন এখানে-সেখানে ধসে পড়ছে, বাকিটুকুও যে-কোন মুহূর্তে খসে পড়বে।

সিঁড়ির কাছাকাছি উবু হয়ে বসে রয়েছে সিলভিয়া, এক মহিলা যোদ্ধার কপাল ও হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। আপার এন্ট্রান্সে একটা মর্টার শেল বিস্ফোরিত হবার সময় শ্র্যাপনেলের আঘাতে আহত হয়েছে মহিলা। সিলভিয়ার পাশেই আরেক আহত লোককে সাহায্য করছে রানা। হাতের কাজ সেরে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

'সিঁড়িটা ভেঙে পড়ার সময় আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম,' রানাকে বলল সিলভিয়া। 'আমরা কি এখানে আটকা পড়েছি?'

'না,' মাথা নেড়ে বলল রানা। 'সময় হলে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারব।'

'আমার ভয় করছে। জায়গাটা এমন অন্ধকার কেন, রানা?'

'ক্যাপটেন ডিগো তার লোকদের শুধু ছোট একটা গর্ত তৈরি করতে বলেছেন,' জবাব দিল রানা। 'আমরা যাতে অক্সিজেনের অভাবে না পড়ি। আলো কম পাচ্ছি, তবে শ্র্যাপনেল থেকেও বাঁচছি।'

'জানো, আমার কেমন যেন অসাড় লাগছে। কোন ব্যথাবোধ নেই কেন?'

সিলভিয়ার পাশ থেকে হেসে উঠলেন একজন ডাক্তার। কি ঘটেছিল, এই ভদ্রলোক জানেন। মর্টারটা যখন ফাটে, এক মহিলা ও তার বাচ্চাকে নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল সিলভিয়া। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে সে, সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায়। একটু পরই চোখ মেলে সে, নিজের কথা ভুলে আহতদের সাহায্যে হাত লাগায়। ডাক্তার ভদ্রলোক হেসে উঠে বললেন, 'আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে।'

'কি অবস্থা আমার?' এতক্ষণে নিজেকে নিয়ে উদ্বিগ্ন হলো সিলভিয়া।

'ডান হাত আর কাঁধে চোট পেয়েছেন, একটা বা দুটো পাঁজরের হাড় ভেঙে গেছে– তবে এক্স-রে না করা পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারছি না। কেটে-ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। সব মিলিয়ে, আর সবার চেয়ে আপনার অবস্থা ভালই।'

ক্ষীণ হাসল সিলভিয়া। 'ধন্যবাদ।' কতটুকু অসুস্থ সে, বোঝা গেল আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলায়। খপ করে ধরে ফেলল রানা, ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল ধুলোর ওপর।

রানার কোমরে গোঁজা অটোমেটিক পিস্তলটার দিকে তাকাল ক্যাপটেন ডিগো। 'একেবারে শেষ মুহূর্তে,' গম্ভীর সুরে বলল সে, 'আপনি তাঁর সম্মান বাঁচানোর জন্যে ওটা ব্যবহার করবেন, ধরে নিতে পারি আমি?'

রানা শুধু বলল, 'ওর সব দায়িত্ব আমার।'

কর্নেল মিরাক ওদেরকে দেখতে এলেন, ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত লাগছে তাঁকে। তিনি জানেন, কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে তাঁর লোকজন অসহায় বোধ করছে। মহিলা ও

শিশুদের ভোগান্তি আরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে তাঁকে। সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছেন গোলাগুলি থামার পর কি ঘটবে ভেবে। মালিয়ানরা সংখ্যায় অনেক গুণ বেশি, সন্দেহ নেই। দুর্গ দখল করে নেয়ার পর পাইকারী হত্যাকাণ্ড শুরু করবে তারা, মহিলাদের ধর্ষণ করবে।

তাঁর হিসেবে প্রতিপক্ষরা সংখ্যায় দেড় হাজারের কম নয়। যুদ্ধ করতে সমর্থ তাঁর লোকের সংখ্যা মাত্র ঊনত্রিশ, রানাকে ধরে। ওদের বিরুদ্ধে ট্যাংকও ব্যবহার করা হবে। হার মানার আগে কতক্ষণ লড়তে পারবেন, আন্দাজ করতে পারছেন না। হয়তো এক ঘণ্টা, খুব বেশি হলে দু'ঘণ্টা। তাঁরা যে লড়বেন, এটা নিশ্চিত। পাঁচিলের বেশিরভাগ অংশ ভেঙে পড়েছে উল্টোদিকে, আবর্জনা টপকে ভেতরে ঢোকা মালিয়ানদের জন্যে সহজ কাজ হবে না।

'কর্পোরাল গৌতম সিং রিপোর্ট করছে,' ক্যাপটেন ডিগোকে বললেন তিনি, 'ঝাঁক বেঁধে এগিয়ে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে মালিয়ানরা। গর্তটা বড় করার ব্যবস্থা নিন, ফায়ারিং বন্ধ হওয়া মাত্র লোকজনকে বের করতে হবে।'

'ইয়েস, স্যার।'

রানার দিকে ফিরলেন কর্নেল। 'মি. রানা, আপনার ইনভেনশন টেস্ট করার সময় হয়েছে বলে মনে হয়।'

দাঁড়াল রানা, আড়মোড়া ভাঙল। 'সত্যি অবাক কাণ্ড, এখনও ওটা অক্ষত আছে।'

'একটু আগে উঁকি দিয়ে যখন মাটির ওপর তাকালাম, দেখলাম পাঁচিলের আড়ালে দিব্যি সাজানো রয়েছে। পাঁচিলের শুধু ওই অংশটুকুই ধসে পড়েনি।'

'জেনারেল ভিনসেণ্ট যে সারেণ্ডার করার প্রস্তাব দিলেন, আপনার প্রতিক্রিয়া কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'নো।'

'তারমানে, যদি মরি, আমরা লড়ে মরব।'

ব্যারাকের নিচে পাতালপুরীতে হঠাৎ নিস্তব্ধতা নেমে এল। মুখ তুলে ওপরদিকে তাকাল সবাই, যেন তিন মিটার পুরু পাথর আর বালি ভেদ করে বাইরে কি ঘটছে দেখতে পাবে।

ছ'ঘণ্টা হলো পাতালে আটকা পড়েছে, ট্যাকটিকাল টীমের সদস্যরা উদ্বিগ্ন ও অসহায় বোধ করছে। নির্দেশ পাবার পর সক্ষম প্রতিটি লোক গা ঝাড়া দিয়ে আবর্জনা সরাবার কাজে হাত লাগাল। গর্তটা বড় হতে বাইরে বেরুতে শুরু করল তারা, আগুনে রোদ মাথায় করে ধ্বংসাবশেষের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সবাই তারা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত, মালিয়ানদের আক্রমণের জবাবে সাড়া দিতে না পেরে বিরক্তও বটে।

হেলমেট রেডিও থেকে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন কর্নেল, 'অন মাই কমাণ্ড মেইন্টেন আ ক্লিয়ার, স্টেডি ফায়ার।'

বললেন তিনি। একই সময়ে চারদিক থেকে হামলা শুরু করবে অ্যাসল্ট ট্রুপ। তাঁর দলের প্রতিটি লোককে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন তিনি, এক হাজার চারশো সত্তর জনের মধ্যে একজনও বাদ যাবে না। না, রিজার্ভ সৈন্য রাখার দরকার নেই।

'আমি সম্পূর্ণ বিজয় চাই,' অফিসারদের বললেন জেনারেল। 'ইউএন কমাণ্ডোদের যাকেই পালিয়ে যেতে দেখবেন তাকেই গুলি করে ফেলে দিন।'

'কাউকে বন্দী করা হবে না?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কর্নেল খাদেম হুসেন। 'কাজটা কি ভাল হবে, জেনারেল?'

'আপনি কোন সমস্যা দেখছেন?'

'ওরা জাতিসংঘবাহিনীর সদস্য, আমাদের বিরুদ্ধে গুরুতর পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে।'

'ওরা বেআইনীভাবে সীমান্ত পেরিয়েছে, ওদেরকে আমি শাস্তি না দিয়ে পারি না। দুনিয়ার লোককে জানানো দরকার, মালির জনসাধারণ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে কি করতে পারে।'

'আমি জেনারেলের সঙ্গে একমত,' বলল জাহাঙ্গীর। 'জনসাধারণের শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করা উচিত।'

যুদ্ধের উন্মাদনা অস্থির করে তুলেছে জেনারেল ভিনসেন্টকে, নিজের উত্তেজনা তিনি ধরে রাখতে পারছেন না। কোন যুদ্ধে আগে কখনও তিনি স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেননি। ষড়যন্ত্র, ঘুষ, মোসাহেবি ইত্যাদির মাধ্যমে পদোন্নতি বাগিয়ে এত ওপরে উঠেছেন। বিরোধিতাকারীদের খুন করার নির্দেশ ছাড়া কাজের কাজ খুব কমই করেছেন তিনি। একটা সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, এই মুহূর্তে নিজেকে তিনি একজন বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন।

একাধিক ঢেউয়ের মত ছুটে এল অ্যাসল্ট ট্রুপস। একদল খানিকটা ছুটে এসে শুয়ে পড়ল, গুলি শুরু করল অপরদলকে এগিয়ে যাবার সুযোগ দিয়ে। সিধে হয়ে আবার যখন ছুটল তারা, অপর একটা দল কাভারিং ফায়ার শুরু করল। দুর্গের দুশো মিটারের মধ্যে পৌঁছে জোর গলায় হুঙ্কার ছাড়ল এলিট ট্রুপের প্রথম দলটা, প্রতিপক্ষ গুলি করেনি দেখে উল্লাস চেপে রাখতে পারছে না। তাদের সামনে ট্যাংকগুলো ঠিকমত ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, ঝাঁকটাকে এলোমেলো মনে হলো।

পিছনের ট্যাংকটা বাছাই করল রানা। পাঁচজন কমাণ্ডোর সাহায্য নিয়ে স্প্রিঙ বো থেকে আবর্জনা সরাল, তারপর সেটাকে টেনে আনল খোলা জায়গায়। প্রাচীন সীজ এঞ্জিনে টেনশন ধারণ করত একটা উইণ্ডলাস ও ট্যাকল, কিন্তু রানার মডেলে ফর্কলিফটটাকে কাত করা হয়েছে, যাতে ওটার জোড়া লিফটিং প্রং বো-র স্প্রিঙ পিছন দিকে একটা হরাইজন্টাল লাইনে টেনে আনতে পারে। স্প্রিঙ বো-তে ফুটো করা একটা ড্রাম লোড করা হয়েছে, এরকম আরও পাঁচটা রাখা হয়েছে পাশেই, এক সারিতে সাজিয়ে।

'লক্ষ্মী সোনা, জ্যান্ত হও,' বিড়বিড় করে ফর্কলিফটের মোটাসোটা এঞ্জিন

স্টার্ট দিল রানা। খক খক করে কেশে চালু হয়ে গেল এঞ্জিন।

এর আগে, তখনও পুরোপুরি ভোর হয়নি, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কর্নেল মিরাক। দুর্গের চারদিকের পেরিমিটারে স্টেক সেট করেছেন তিনি, ফায়ারিং মার্ক হিসেবে। যারা প্রতিরোধে রয়েছে, আক্রমণকারীদের চোখের সাদা অংশ দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে নির্ঘাত মারা পড়বে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কাছাকাছি থেকে যুদ্ধ করা স্রেফ বোকামি। তাই স্টেকগুলো পঁচাত্তর মিটার দূরে সেট করেছেন তিনি।

এই মুহূর্তে, ট্যাকটিকাল টিম যখন ফায়ার শুরু করার অপেক্ষায় রয়েছে, সবার চোখ রানার ওপর নিবদ্ধ। ট্যাংকগুলোকে যদি থামানো না যায়, মালিয়ান অ্যাসল্ট ট্রুপের কাজ হবে শুধু লাশ সরানো।

লঞ্চপ্ল্যাঙ্কের যেখানে বাঁকা স্প্রিঙের প্রান্ত দুটো মিলিত হয়েছে সেখানে ছুরি দিয়ে একটা দাগ তৈরি করল রানা, দূরত্ব অনুসারে টেনশন মাপার জন্যে। এরপর একটা সাপোর্ট বীমে চড়ল ও, আবার তাকাল ট্যাংকগুলোর দিকে।

'আপনার টার্গেট কোনটা?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

লাইনের শেষ মাথার ট্যাংকটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'পিছন থেকে সামনের দিকে আসতে চাইছি।'

'যাতে সামনের ট্যাংক বুঝতে না পারে পিছনে কি ঘটছে।' কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল। 'দেখা যাক, কাজ হয় কিনা।'

পাল্টা আক্রমণ হয়নি দেখে ট্যাংক কমাণ্ডারদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে উঠে গেছে। তাদের ধারণা, দুর্গের ভেতর ঢুকে লাশ ছাড়া কিছুই তারা দেখতে পাবে না। কমাণ্ডার আর ড্রাইভাররা ট্যাংক নিয়ে সামনে বাড়ল হ্যাচ খোলা রেখেই, এখনও দাঁড়িয়ে থাকা দু'একটা পাঁচিলের দিকে গোলা ছুঁড়ছে।

সামনের ট্যাংকের ড্রাইভারকে যখন দেখা যাচ্ছে, একটা মশাল জ্বেলে আগুনটা ড্রামের একটা ফুটোয় ধরল রানা। আগুন সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। মশালের ডগাটা বালিতে গুঁজে আগুন নেভাল রানা, লাইন ধরে টান দিয়ে ট্রিগার ক্যাচ রিলিজ করল– বানিয়েছে একটা ডোর ল্যাচ দিয়ে। টান টান নাইলন লাইন আর কেবল, যেগুলো স্প্রিঙ আটকে রেখেছে, চাবুকের মত শব্দ করে মুক্ত হলো, ট্রাক স্প্রিঙ এক ঝটকায় সিধে হয়ে গেল।

ধসে পড়া পাঁচিলের ওপর দিয়ে জ্বলন্ত ডিজেল তেলের ড্রাম রঙিন উল্কার মত ছুটল, ছাড়িয়ে গেল পিছনের ট্যাংকটাকে, পড়ল গিয়ে অনেকটা দূরে বালির ওপর, তারপর বিস্ফোরিত হলো।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। 'এ তো দেখছি যতটুকু ধারণা করেছিলাম তারচেয়ে বেশি কাজ করছে,' বিড়বিড় করল ও।

'আরও পঞ্চাশ মিটার কম দূরে ফেলতে হবে, দশ মিটার ডান দিকে,' শান্ত সুরে বলল ক্যাপটেন ডিগো।

কর্নেলের লোকেরা জায়গামত আরেকটা ব্যারেল তুলছে, লঞ্চ প্ল্যাঙ্কে নতুন একটা দাগ কাটল রানা, দূরত্ব অ্যাডজাস্ট করার জন্যে। এরপর ফর্কলিফটের

হাইড্রলিক এনগেজ করল ও, স্প্রিঙ বো বাঁকা করল আবার। মশাল জ্বালিয়ে আগুন দেয়া হলো, মুক্ত করা হলো ট্রিগার মেকানিজম, সেই সঙ্গে রওনা হয়ে গেল ডিজেল ভরা দ্বিতীয় ড্রামটা।

দ্বিতীয়টা পিছনের ট্যাংকের কয়েক মিটার সামনে পড়ল, ড্রপ খেলো, তারপর বিস্ফোরিত হবার আগে গড়ান দিয়ে ঢুকে পড়ল ট্যাংকের তলায়। ট্যাংকটা সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা পড়ে গেল শিখায়। ক্রুরা নিজেদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করল, প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে কে কার চেয়ে আগে হ্যাচ গলে পালাতে পারে। চারজনের মধ্যে মাত্র দু'জন জান বাঁচাতে পারল।

তৃতীয় ড্রাম ছোঁড়ার প্রস্তুতি নিতে দেরি করেনি রানা। এটা সরাসরি আঘাত হানল। পরবর্তী ট্যাংকের টারিটে ঢুকল, আগুন ধরে গেল ভেতরে।

'অবিশ্বাস্য! এ আমি কি করে বিশ্বাস করি!' রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ক্যাপটেন ডিগো।

সেদিকে খেয়াল নেই, কমাণ্ডোদের সাহায্য নিয়ে আরেকটা ড্রাম জায়গামত বসাচ্ছে রানা। অক্ষত একমাত্র প্যারাপিটে দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন কর্নেল মিরাক। অপ্রত্যাশিতভাবে দুটো ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় বাকিগুলো এখন আর এগোচ্ছে না। রানার সাফল্যে সাংঘাতিক খুশি তিনি, তবে এ-ও জানেন যে একটা ট্যাংকও যদি দুর্গের ভেতর ঢুকতে পারে, পরিণতি সেই একই হবে।

চার নম্বর ড্রাম পাঁচিলের ওপর দিয়ে ছুটে গেল। আক্রমণ সম্পর্কে সচেতন, ট্যাংক কমাণ্ডার ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়েছে আঁকা-বাঁকা পথ ধরতে। তার নির্দেশে সুফল ফলল, ড্রামটা পড়ল ট্যাংক থেকে চার মিটার দূরে। বিস্ফোরিত হলো ওটা, তরল অনলের খুব সামান্যই ছলকে পড়ল ট্যাংকের আর্মারড টেইলে। আগের মতই দুর্গের দিকে এগিয়ে আসছে দৈত্যটা।

আবর্জনার আড়ালে লুকিয়ে থাকা যোদ্ধাদের মনে হলো পিঁপড়ের একটা ঝাঁক এগিয়ে আসছে, সংখ্যায় মালিয়ানরা এত বেশি। শুধু সংখ্যায় বেশি নয়, আসছেও গায়ে গা ঠেকিয়ে, ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াই অসম্ভব। মালিয়ানরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছে, সেই সঙ্গে হুঙ্কারও ছাড়ছে।

কর্নেলের ফায়ারিং স্টেক থেকে আর মাত্র কয়েক মিটার দূরে প্রথম ঢেউটা, অথচ এখনও তিনি ফায়ার ওপেন করার নির্দেশ দিচ্ছেন না। এখনও তিনি আশা করছেন বাকি দুটো ট্যাংকও ধ্বংস করতে পারবে রানা। তাঁর আশা আংশিক পূরণ হলো ট্যাংক কমাণ্ডারের মতলব রানা ধরে ফেলায়। কমাণ্ডার কোর্স চেঞ্জ করতে বলে রেখেছে ড্রাইভারকে। রানা ওর স্প্রিঙ বো সামান্য একটু অ্যাডজাস্ট করে নিল। পঞ্চম ড্রামটা ছুটে যাচ্ছে ভাঙা পাঁচিলের ওপর দিয়ে।

ড্রাইভারের সামনের হ্যাচে প্রায় সরাসরি আঘাত হানল সেটা। ট্যাংকের সামনের অংশ আগুনের শিখায় ঢাকা পড়ে গেল। গোটা পদাতিক বাহিনী পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, সবাই তাকিয়ে দেখছে ট্যাংকের টারিট বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। অনেকটা দূরে বালির ওপর পড়ে গেঁথে গেল

সেটা।

রানা ব্যস্ত হয়ে উঠল শেষ ড্রামটা নিয়ে। এত ক্লান্তবোধ করছে ও, মনে হলো দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

ষাট টনী বিশাল ট্যাংকটা ধুলো আর ধোঁয়ার ভেতর ঝুলে রয়েছে, ইস্পাতের তৈরি একটা রাক্ষস, সামনের যা পাবে সব গিলে ফেলবে। কমাণ্ডারের নির্দেশে পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গর্জে উঠল মেশিন গান।

স্প্রিঙ বো লাইন আপ করছে রানা; দম আটকে অপেক্ষা করছে সবাই। অনেকেই ভাবছে, আর রক্ষে নেই, ভবলীলা সাঙ্গ হলো বলে। এটাই শেষ ড্রাম, আর কিছু দিয়ে ট্যাংকটাকে থামানো যাবে না।

ট্যাংকটা সোজা এগিয়ে আসছে। কমাণ্ডার আঁকাবাঁকা পথ ধরার ঝামেলায় যায়নি। ট্রিগার টেনে দিল রানা। ওই একই সময়ে ট্যাংকের গানারও ফায়ার করল। কাকতালীয় বলা হোক বা অসম্ভব, ঘটনাটা ঘটল– ট্যাংকের ভারি শেল আর জ্বলন্ত ড্রাম মাঝ আকাশে মিলিত হলো।

ট্যাংক কমাণ্ডার উত্তেজনার মাথায় লোড করেছিল একটা আর্মারড ভেদকারী শেল, ফলে ড্রামটা ভেদ করে গেল ওটা। জলপ্রপাতের মত জ্বলন্ত তেল ঝরে পড়ল ট্যাংকের গায়ে। আগুনের লেলিহান শিখার ভেতর রাক্ষসটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আতঙ্কিত ড্রাইভার পিছু হটাতে চেষ্টা করল ট্যাঙ্ক। পিছনের জ্বলন্ত ট্যাংকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। জোড়া লেগে যাওয়ায় আগুনের ভেতর ওগুলো আর আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে না। শেল আর ফুয়েল ট্যাঙ্ক বিস্ফোরিত হতে শুরু করল।

সমস্ত আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল কমাণ্ডোদের উল্লাসধ্বনি। হাতে তৈরি রানার স্প্রিঙ বো অসাধ্যসাধন করেছে, অসম্ভবকে করেছে সম্ভব।

'টার্গেট প্র্যাকটিস করো!' কঠিন সুরে নির্দেশ দিলেন কর্নেল মিরাক, যদিও তাঁর ঠোঁটের কোণে বিজয়ীর হাসি লেগে রয়েছে। 'এবার আমরা ওদেরকে শায়েস্তা করার সুযোগ পেয়েছি।'

সাত

প্রবল বালি ঝড়ের মধ্যে সামনের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মুরল্যাণ্ড ভাবল, সে কি স্বপ্ন দেখছে? পাশাপাশি চারটে ট্রেন কোত্থেকে আসবে? 'কি মনে হয় আপনার?' স্টকহোমকে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমরা কি মৌরিতানিয়ায় পৌঁছে গেছি?'

'সে তো আপনার কমপিউটর বলবে।'

'ওটার হিসেবে দশ মাইল পিছনে সীমান্ত পেরিয়েছি।'

'তাহলে রেললাইনটা পেরুনো যেতে পারে।'

বিশাল একজোড়া পাথরের মাঝখান দিয়ে ঢালের মাথায় উঠে এল ডিউন বাগি, তারপর অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জন ওরা একই সময়ে শুনতে পেয়েছে। অস্পষ্ট, তবে ধপধপ আওয়াজটা অতি চেনা। প্রতি মুহূর্তে কাছে চলে আসছে। তারপর মনে হলো সরাসরি মাথার ওপর ওটা।

রিভার্স কোর্স সেট করে অ্যাটাক ভেহিকেল ঢালের মাথা থেকে নামাতে চেষ্টা করল স্টকহোম। খক খক করে থেমে গেল এঞ্জিন। ফুয়েল শেষ।

'গুডবাই জানাবার দরকার আছে কি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'একই সঙ্গে যখন পরলোকে যাচ্ছি আমরা?'

'ওরা বোধহয় রাডারে দেখে ফেলেছে আমাদের, সরাসরি চলে এসেছে।' প্রচণ্ড রাগে স্টিয়ারিং হুইলে ঘুসি মারল স্টকহোম।

ধূলিঝড়ের পর্দার ভেতর ধীরে ধীরে ফুটে উঠল কাঠামোটা, যেন ভিন গ্রহের কোন রহস্যময় পোকা। বালিময় জমিন থেকে মাত্র দু'মিটার ওপরে স্থিরভাবে ঝুলে থাকল। একটা ত্রিশ মিলিমিটার চেইন গান, দুই পড ভর্তি একত্রিশটা ২.৭৫ ইঞ্চি রকেট, আটটা লেযার-গাইডেড অ্যান্টি-ট্যাংক মিসাইলের দিকে তাকিয়ে থাকা, সত্যি কথা বলতে কি, স্নায়ুবিদারক অভিজ্ঞতা। মুরল্যাণ্ড আর স্টকহোম আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে থাকল ডিউন বাগিতে। মৃত্যুর প্রহর গুণছে।

কিন্তু আগুনের ফুলকি ছুটল না। পেটের একটা হ্যাচ থেকে একটা মূর্তি খসে পড়ল। এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। পরনে ডেজার্ট কমব্যাট সুট, হাই-টেক ইকুইপমেন্টে বোঝাই। মাথায় ক্যামোফ্লেজ কাপড়ে মোড়া হেলমেট, মুখে মাস্ক ও গগলস। হাতে একটা সাবমেশিন গান। ডিউন বাগির পাশে দাঁড়াল সে, মুরল্যাণ্ড আর স্টকহোমকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর মাস্ক খুলে বলল, 'আপনারা এলেন কোত্থেকে?'

পিছু হটলে গুলি করা হবে, জেনারেল ভিনসেন্টের এ-ধরনের হুমকি শুনে মালিয়ান পদাতিক বাহিনী দুর্গের দিকে ছুটে এল যেন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার ব্যাকুলতা নিয়ে।

আক্রমণ শুরু হবার এক ঘণ্টা পর গোলাগুলির সব শব্দ থেমে গেল। দুর্গের চারদিকে বালির ওপর ছড়িয়ে আছে লাশ, আহত লোকজন চিৎকার করছে। ইউএন টীমের সদস্যরা পাল্টা গুলিবর্ষণ থামিয়েছে অনেক আগেই, মালিয়ানরা যাতে তাদের আহত লোকদের সরিয়ে নিতে পারে, কিন্তু তা সরানো হয়নি।

আবর্জনার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলল কমাণ্ডোরা। ক্যাপটেন ডিগো রিপোর্ট করল, 'আমাদের তিনজন আহত হয়েছে, মারা গেছে একজন। আমি বলব, উচিত শাস্তি দেয়া হয়েছে ওদের।'

'ওরা আবার ফিরে আসবে,' মন্তব্য করলেন কর্নেল।

'আরও দুই হেলিকপ্টার ভর্তি লোক এনেছে ওরা,' বলল রানা। 'রক্ত ঝরিয়ে খেপে উঠেছে, এরপর ঠেকানো যাবে না।'

ক্লান্তিতে ঝুলে পড়েছে কর্নেলের মুখ। 'না,' সায় দিলেন তিনি। 'সম্ভবত

দ্বিতীয় আক্রমণটাই চূড়ান্ত আক্রমণ হতে যাচ্ছে।'

'এর মানে?' রাগে মুরল্যাণ্ডের গলা চড়ে গেল। 'কেন বলছেন সাহায্য করা সম্ভব নয়?'

কর্নেল রাসেল জবাবদিহি করতে অভ্যস্ত নন, বিশেষ করে কোন সিভিলিয়ানকে। তিনি শুধু বললেন, 'ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারছেন না, মি. মুরল্যাণ্ড।'

'বুঝতেই তো চাইছি আমি,' জবাব দিল মুরল্যাণ্ড। 'মরুভূমির মাঝখানে শিশু, মহিলা, ইউএন ফোর্সের কোণঠাসা সদস্যরা খুন হয়ে যাচ্ছে। আপনারা এসেছেনও তাদের সাহায্য করার জন্যে। অথচ বলছেন ওদেরকে উদ্ধার করে আনা সম্ভব নয়। এর মানে কি?'

'আপনি শান্ত হোন, আমি ব্যাখ্যা করছি। কোথাও একটা ইনফরমেশন লিক আছে, সম্ভবত জাতিসংঘে,' কর্নেল রাসেল বললেন। আমরা ওদের এয়ার স্পেস ক্রস করব, তার অপেক্ষায় রয়েছে মালিয়ানরা। ওদের এয়ার ফোর্সের অর্ধেক শক্তি টহল দিচ্ছে সীমান্তের ঠিক ভেতরে। আমাদের অ্যাপাচি হেলিকপ্টার মিসাইল প্ল্যাটফর্ম হিসেবে খুব ভাল, কিন্তু মিরেজ জেট ফাইটারের সঙ্গে ওগুলোর তুলনা করা চলে না। আমরা সীমান্ত পেরুলেই ওরা আমাদেরকে আকাশ থেকে ফেলে দেবে। এবার বুঝতে পারছেন?'

মুরল্যাণ্ডের মনে হলো তার তলপেটের ভেতরটা কে যেন খামচে ধরেছে। কর্নেলের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মরুভূমির দিকে তাকাল সে। বালি ঝড় থেমে গেছে, দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনগুলো এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। 'আপনার কমাণ্ডে কতজন লোক রয়েছে, কর্নেল?'

'ক্রুদের বাদ দিয়ে আটজনের একটা ফাইটিং ফোর্সের নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি।'

'আটজন?' হাঁ হয়ে গেল মুরল্যাণ্ড। 'আটজন নিয়ে মালিয়ান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।' এই প্রথম হাসলেন কর্নেল রাসেল। 'লোক সংখ্যা কম হলে কি হবে, আমাদের যে ফায়ারপাওয়ার, পশ্চিম আফ্রিকার অর্ধেকটা ধ্বংস করে দিতে পারি।'

'আচ্ছা,' বলল মুরল্যাণ্ড, তার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। 'কারও চোখে ধরা না পড়ে ওয়েস্ট প্রজেক্টে যাবার ব্যবস্থা করা গেলে আপনি রাজি হবেন যেতে?'

'ভাল একটা প্ল্যান গ্রহণ করতে সব সময় উৎসাহী আমি।'

'আমার প্রস্তাব মেনে নিলে, ওয়েস্ট প্রজেক্টে দু'আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছুতে পারব আমরা,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'কিভাবে?'

'একটা ট্রেন নিয়ে যাব আমরা। জেনারেল ভিনসেন্ট ধারণাই করতে পারবেন না যে আমরা ট্রেনে চড়ে আসছি।'

'গুড আইডিয়া!'

দ্বিতীয় দফার আক্রমণে সর্বনাশের ষোলো কলা পূর্ণ হলো। জেনারেল ভিনসেন্ট গরু-ছাগলের মত খেদাচ্ছেন মালিয়ানদের। কাতারে কাতারে ছুটে এল তারা। সামনের সারি ধরাশায়ী হলে তাদেরকে টপকাল দ্বিতীয় সারি, এভাবে দুর্গের ভাঙা পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়ল কয়েক শো মালিয়ান প্যারেড গ্রাউণ্ডের ভেতর। ইউএন টীমের অনেক সদস্য হতাহত হলো। আরও ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ হলো, অ্যামুনিশন শেষ হয়ে এসেছে।

আহতদের ধসে পড়া ব্যারাকের নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। ক্যাপ্টেন ডিগো গুণে দেখেছে, যুদ্ধ করতে পারবে এমন লোক মাত্র বারোজন আছে আর, রানাকে বাদ দিয়ে। কর্নেল মিরাককে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। গেট ভেঙে মালিয়ানরা ভেতরে ঢোকার সময় শেষবার তাঁকে দেখা গেছে প্যারাপিটের ওপর দাঁড়িয়ে ফায়ার করছিলেন।

ব্যারাকের কাছাকাছি আবর্জনার আড়ালে রানাকে চিনতে পেরে ভৌতিক হাসি দেখা গেল ক্যাপটেনের ঠোঁটে। 'আপনি দেখা যাচ্ছে রক্তে গোসল করেছেন, মি. রানা!'

'এখানে সেখানে কেটে-ছিঁড়ে গেছে, গুরুতর কিছু নয়,' বলল রানা। 'আপনাকেও তো অক্ষত মনে হচ্ছে না।'

'অ্যামুনিশনের কি অবস্থা?'

হাতের সাবমেশিন গান ফেলে দিল রানা। 'শুধু দুটো গ্রেনেড আছে।'

দখল করা একটা মেশিন গান রানার হাতে ধরিয়ে দিল ক্যাপটেন। 'ব্যারাকের নিচে পাতালে নেমে যান, প্লীজ। আমরা ক'জন যতক্ষণ পারি ঠেকিয়ে রাখব ওদের, ইতিমধ্যে আপনি...' কথাটা শেষ করতে না পেরে চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকাল সে। তারপর আবার বলল, 'ওরা পাগলা কুত্তা হয়ে আছে। মহিলা আর শিশুদের ওদের হাতে পড়তে দেয়া যায় না।'

'ওদেরকে আমি দেখব,' বলল রানা।

রানার চোখে বিষণ্নতা দেখল ক্যাপটেন। 'গুডবাই, মি. রানা। আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা সত্যি আমার জন্যে সম্মানজনক ছিল।' তার কথা শেষ হতেই আশপাশে এক পশলা বুলেট এসে লাগল।

ধুলোর ভেতর দিয়ে কাশতে কাশতে ব্যারাকের নিচে নামার সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছে রানা। নিচে নামতেই ওর দিকে এগিয়ে এলেন সিডনি কামার আর মাইকেল সুনারিল। ড. সুনারিল জানতে চাইলেন, 'কারা জিতছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমরা নই।'

'মরার জন্যে অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না,' বললেন কামার। 'তারচেয়ে লড়া ভাল। অতিরিক্ত কোন অস্ত্র আছে নাকি, মি. রানা?'

'থাকলে আমাকেও একটা দিন,' বললেন ড. সুনারিল।

রানা ওর মেশিনগানটা সিডনি কামারের হাতে ধরিয়ে দিল। ড. সুনারিলকে বলল, 'দুঃখিত, অটোমেটিক ছাড়া আর কিছু নেই আমার কাছে। ওপরে অনেক

আছে, তবে নিহত মালিয়ানদের কাছ থেকে তুলে আনতে হবে।'

'যাই, তাই নিয়ে আসি,' বললেন ড. সুনারিল। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কাছে বুলেট আছে ক'টা? সিজার দেস্তা বলছিলেন তাঁর এগারোটা বুলেট লাগবে। শিশু আর মহিলারা ওই এগারোজনই।'

রানা বলল, 'আগে আমি সিলভিয়ার সঙ্গে কথা বলি. তারপর পিস্তল আর অতিরিক্ত ক্লিপ তাঁর হাতে তুলে দেব।'

রানার সামনে এসে দাঁড়াল সিলভিয়া। 'সবই শুনলাম। আর কতক্ষণ?'

'দশ...খুব বেশি হলে পনেরো মিনিট,' বলল রানা। 'ক্যাপটেন ডিগো তার বেশি ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'

'এদের কি হবে?' আহত সৈনিকদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'ওদের, বাচ্চাদের, মেয়েদের, কাউকে মালিয়ানরা গ্রেফতার করবে না।'

কথা না বলে এগিয়ে এল সিলভিয়া, রানার কাঁধে মাথা রাখল নিঃশব্দে। খানিক পর কাঁধ থেকে তার মাথাটা তুলল রানা। দেখল. সাহস করে হাসছে সিলভিয়া, যদিও কাঁপা কাঁপা।

'তাহলে এই ছিল কপালে?' জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া। সে বলতে চাইছে, তোমার হাতেই আমার মরণ ছিল?

দম আটকে রেখেছে রানা। কথা বলতে চাইছে না ও। সিলভিয়া কেঁদে ফেললে কাজটা ওর জন্যে কঠিন হয়ে যাবে।

'শিস দেয় কে?' জানতে চাইল সিলভিয়া।

'শিস? কই?'

'না, ভুল শুনেছি...না! ওই তো, আবার হচ্ছে!'

পকেট থেকে অটোমেটিক পিস্তলটা বের করল রানা। 'গুডবাই, লাভ।'

পিস্তল সরিয়ে কান পাতল রানা। না, হুইসেলের শব্দ নয়। কেউ শিসও দিচ্ছে না। আওয়াজটা একটা লোকোমোটিভের এয়ার হর্ন থেকে বেরুচ্ছে।

'ট্রেনের হুইসেল! মুরল্যাণ্ড, মুরল্যাণ্ড ফিরে এসেছে!'

সামনে রণক্ষেত্র, সেদিকে তীর বেগে ছুটে চলেছে ট্রেন। এঞ্জিনিয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে এয়ার হর্ন কর্ডটা টেনে ধরে আছে মুরল্যাণ্ড। দেড় মিনিট পর ব্রেক অ্যাপ্লাই করল এঞ্জিনিয়ার, ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ল দুর্গ আর জেন্যারেল ভিনসেন্টের ফিল্ড হেডকোয়ার্টারের মাঝখানে। ট্রেনের দু'দিকেই লাফিয়ে পড়ল কর্নেল রাসেলের লড়াকু সৈন্যরা। একদল সরাসরি হামলা চালাল মালিয়ান ফিল্ড হেডকোয়ার্টার, বাকি সবাই মালিয়ান আর্মির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পিছন থেকে। ফ্ল্যাটবেড কারে করে নিয়ে আসা হয়েছে অ্যাপাচী হেলিকপ্টারগুলো, কাভার সরিয়ে আকাশে তুলতে মাত্র দু'মিনিট লাগল। আকাশে উঠেই মিসাইল ছুঁড়তে শুরু করল ওগুলো।

মাস্টার সার্জেন্ট জেমস হল আর তার টীম মালিয়ানদের ফিল্ড হেডকোয়ার্টার দখল করে নিল। উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিকেশন লাইন নষ্ট করা, মালিয়ানরা যাতে

এয়ার ফোর্সের কাছে সাহায্য চাইতে না পারে। লিডাররা পালাতে শুরু করায় সাধারণ মালিয়ান সৈন্যরা হতভম্ব হয়ে পড়েছিল, তারা কোন বাধা তো দিলই না, বরং পালাতে গিয়ে অনেকেই মারা পড়ল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসছে সার্জেন্ট হল, চোখের কোণ দিয়ে কি যেন নড়তে দেখল। ভাল করে তাকাতেই স্টাফ কারটাকে দেখতে পেল সে। বালিতে ডেবে গেছে চাকা, পালাতে পারছে না। কালক্ষেপণ না করে সেদিকে ছুটল সে।

কাছাকাছি পৌঁছুনো সম্ভব হলো না, চাকাগুলো বালি থেকে উঠে আসায় ছুটতে শুরু করল স্টাফ কার। সার্জেন্ট হল দেখল, পিছনের সীটে তিনজন, সামনের সীটে দু'জনের মাথা দেখা যাচ্ছে। একটা চিৎকারও শুনতে পেল সে, তবে তার জানা নেই যে ওটা মালিয়ান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ভিনসেণ্টের আর্তনাদ। তিনি ক্যাপটেন ফয়সলের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছাড়ছেন, 'আমাকে বাঁচাও! আমি তোমাকে অর্ডার দিচ্ছি, আমাকে বাঁচাও!'

গাড়িটা পালাচ্ছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সার্জেন্ট হল, মেশিন গান তুলে গুলি করল। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট গাড়ির জানালা আর দরজা ভেঙে চুরমার করে দিল। দুটো ক্লিপ খরচা করার পর গতি কমে গেল, দাঁড়িয়ে পড়ল স্টাফ কার। সাবধানে এগোল সে, দেখল হুইলের ওপর মরে পড়ে আছে ড্রাইভার। একজন সিনিয়র মালিয়ান অফিসারের লাশ জানালা দিয়ে অর্ধেকটা বেরিয়ে এসে ঝুলে আছে। আরেকজন অফিসার খোলা দরজা দিয়ে পড়ে গেছে বাইরে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে, চোখে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। তৃতীয় এক লোক বসে আছে পিছনের সীটের মাঝখানে, চোখ দুটো খোলা ও টান টান, যেন সম্মোহিত অবস্থায় দূরে কোথাও তাকিয়ে আছে। অবশ্য সামনের প্যাসেঞ্জার সীটে বসা লাশটার চেহারায় এক ধরনের প্রশান্তি লক্ষ করল সার্জেন্ট, তার মনে হলো সম্ভবত এই একজনই নিজের মৃত্যুকে শান্তভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিল। শুধু তার পরনেই ইউনিফর্ম নেই।

ব্যাক সীটের মাঝখানে বসা অফিসারকে কার্টুন পত্রিকায় আঁকা ফিল্ড মার্শাল বলে মনে হলো। ইউনিফর্মের কোটে সোনার পাত, রিবন, মেডেল ইত্যাদি বোঝাই। সার্জেন্ট হল বিশ্বাস করতে পারছে না এই লোকটাই ছিল মালিয়ান ফোর্সের লীডার। খোলা দরজা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে অফিসারের গায়ে গান বাট দিয়ে খোঁচা দিল সে। সীটের ওপর কাত হয়ে পড়ল শরীরটা, ঘাড়ের গোড়ায় একজোড়া বুলেটের গর্ত বেরিয়ে পড়ল।

সার্জেন্ট হল জানে না জেনারেল ভিনসেণ্ট সহ অন্যান্য মালিয়ান অফিসারদের মেরে ফেলে পশ্চিম আফ্রিকার একটা রাষ্ট্রের ইতিহাস বদলে দিয়েছে সে। ভিনসেণ্টের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন রত কয়েকটা রাজনৈতিক দল প্রকাশ্যে তৎপর হয়ে উঠবে, সামরিক জান্তাকে ক্যান্টনমেণ্টে ফিরে যেতে বাধ্য করে নির্বাচিত একটা সরকারকে ক্ষমতায় বসাবে।

জেনারেল ভিনসেণ্টকে কবর দেয়ার আগে পার হয়ে যাবে দশটা দিন। তাঁকে

কবর দেয়া হবে মরুভূমিতে, যেখানে তাঁর চূড়ান্ত পরাজয়টি ঘটেছিল। তাঁর মৃত্যুতে শোকাভিভূত, এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না। অচিহ্নিত হওয়ায়, ভবিষ্যতে তাঁর কবর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

প্যারেড গ্রাউণ্ডে উঠে এল রানা, প্রথমেই দেখা হয়ে গেল ক্যাপটেন ডিগোর সঙ্গে। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত পেয়েছে সে, ব্যথায় কাতর হয়ে আছে চেহারা। 'নতুন জীবন দীর্ঘ হোক!' রানাকে দেখে আড়ষ্ট হাসল সে।

ভাঙা পাঁচিলের আবর্জনার ভেতর থেকে ভূতের মত উত্থান ঘটল কর্নেল মিরাকের, একটা গ্রেনেড লঞ্চারকে ক্রাচ হিসেবে ব্যবহার করছেন, মাথায় হেলমেট নেই, বাম হাতটা মরা সাপের মত শরীরের পাশে ঝুলছে। দু'জনের কেউই তাঁকে জীবিত দেখবে বলে ভাবেনি। করমর্দনের সময় হাঁ করে থাকল ওরা।

'আপনাকে দেখে ভারি আনন্দ লাগছে, কর্নেল, স্যার,' বলল ক্যাপটেন। 'আমি ভেবেছিলাম পাঁচিলের নিচে চাপা পড়েছেন আপনি।'

'চাপা পড়েছিলাম, কিছুক্ষণের জন্যে,' বলে রানার দিকে ফিরে হাসলেন কর্নেল। 'মি. রানা, দেখতে পাচ্ছি এখনও আপনি আমাদের সঙ্গে আছেন।'

'পুরানো সিকি বারবার ফিরে আসে।'

কর্নেলকে অভিনন্দন জানাতে ইউএন টীমের সদস্যরা এগিয়ে আসছে। তাদের সংখ্যা এত কম, চেহারা বিষণ্ন হয়ে উঠল তার। 'মাত্র এই ক'জন?' ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'ওরা হারিয়েছে এক হাজারের ওপর, আমরা মাত্র দু'ডজন।'

'সবাইকে জড়ো করো, ক্যাপটেন,' নির্দেশ দিলেন কর্নেল।

ইউএস টীমের কর্নেল রাসেল এগিয়ে এলেন, সবার সঙ্গে পরিচিত হবার পর বললেন, 'দুঃখিত, আরও আগে আমরা পৌঁছুতে পারিনি।' ইউএন ফোর্সের সদস্যদের ওপর চোখ বুলালেন তিনি। 'এই আপনারা সবাই?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন কর্নেল মিরাক। 'বাকি সবাই শহীদ হয়েছে।'

'সব মিলিয়ে কতজন ছিল?'

'শুরুতে চল্লিশ জনের মত।'

যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছেন কর্নেল রাসেল, কর্নেল মিরাককে স্যালুট করলেন তিনি। 'গ্লোরিয়াস ডিফেন্সের জন্যে আমার কংগ্রাচুলেশন্স গ্রহণ করুন। এরকম বীরত্ব আগে কখনও দেখিনি আমি।'

এগিয়ে এসে রানাকে আলিঙ্গন করল মুরল্যাণ্ড। রানা বলল, 'আমি ধরেই নিয়েছিলাম, এবার তুমি আমাকে হতাশ করবে।'

'আরও আগে পৌঁছুনো সম্ভব ছিল না।'

'কেউ আশা করেনি তোমরা ট্রেন নিয়ে আসবে।'

রানার চোখে তাকাল মুরল্যাণ্ড। 'সিলভিয়া?'

'এখনও বেঁচে আছে। তবে আর দু'সেকেণ্ড দেরি হলে মারা যেত।'

'তাকে তুমি বাইরে বেরুতে দিয়েছিলে?'

'না, মারা যেত আমার গুলিতে,' বলল রানা। 'এসো, তোমাকে দেখে খুশি হবে সে।'

ব্যারাকের নিচে নেমে ওরা দেখল আহত লোকজনকে ইউএস টীমের মেডিকেল কর্মীরা স্ট্রেচারে তুলছে। মেঝেতে শুয়ে ছিল সিলভিয়া, ওদেরকে দেখে উঠে বসল। 'ববি···ববি··· তুমিই আমাদের বাঁচিয়েছ!'

তাকে ধরে দাঁড় করাল মুরল্যাণ্ড। 'তোমরা বেঁচে না থাকলে আমার বেঁচে থাকাটা অর্থহীন হয়ে যেত,' বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সে।

একটা স্ট্রেচারে তোলা হলো সিলভিয়াকে। স্ট্রেচারের সঙ্গে ওরাও উঠে এল প্যারেড গ্রাউণ্ডে। হেলিকপ্টারে তোলা হচ্ছে আহত লোকজনদের, সেদিক থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল, 'সিলভিয়া!'

সেদিকে তাকাতে ড. সুনারিলকে দেখতে পেল ওরা, একটা স্ট্রেচারে শুয়ে রয়েছেন। কাছাকাছি এসে রানা বলল, 'আমার মত আপনিও তাহলে বেঁচে আছেন!'

ম্লান হাসলেন ড. সুনারিল। 'হরিষে বিষাদ, মি. রানা, হরিষে বিষাদ।'

'সিডনি কামার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন ড. সুনারিল। 'আমরা তাঁকে হারিয়েছি।'

ইউএস রেঞ্জাররা স্ট্রেচার দুটো কপ্টারে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে, মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে পিছিয়ে এল রানা। সিলভিয়া জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ না?'

'একটা কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে আমাদের,' বলল রানা।

'এর মানে কি এই আমাদের শেষ দেখা?'

'আরে না, তা কেন হবে! সব যদি ঠিক মত ঘটে, আবার আমাদের দেখা হবে।'

'কবে?' ব্যাকুল সুরে জানতে চাইল সিলভিয়া।

'শিগগির,' বলে ঝুঁকল রানা, সিলভিয়ার কপালে চুমো খেলো। 'কেঁদো না,' ফিসফিস করল ও।

বুদ্ধিটা রানার। জেনারেল ভিনসেণ্টকে জিম্মি করা হয়েছে শুনলে মালিয়ান বাহিনী নতুন করে আক্রমণ করবে না, ফলে ইউএন ও ইউএস টীম দুটো নিরাপদে মালি ছেড়ে চলে যেতে পারবে। মালির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা কর্নেল রাসেলের সঙ্গে সরাসরি পুতুল প্রেসিডেন্টের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন। প্রেসিডেণ্ট অনুরোধ করলেন, 'জেনারেলকে দয়া করে মৃত্যুদণ্ড দিন, এবং এখুনি তা কার্যকরী করুন, প্লীজ!'

বুদ্ধিটা ধার দেয়ায় রানার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন কর্নেল রাসেল। কিন্তু পরমুহূর্তে ওর একটা প্রস্তাব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। রানা তাঁর পারসোনাল সিকোরস্কি এইচ-সেভেনটিসিক্স ঈগল হেলিকপ্টারটা ধার চাইছে, ক্রু

ও ছ'জন রেঞ্জার সহ। মনে মনে রেগে গেলেও, প্রস্তাবটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। এরপর রানা তাঁকে অনুরোধ করল, 'ফ্লোরিডার স্পেশাল অপারেশন কমাণ্ড-কে আমার প্রস্তাবটা অন্তত জানান, দেখুন তারা কি বলে।'

ভিনসেন্টের দখল করা কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে যোগাযোগ করার পর হতভম্ব হয়ে গেলেন কর্নেল রাসেল। স্পেশাল অপারেশন কমাণ্ড রানার প্রস্তাব যে শুধু মেনে নিল তা নয়, সেই সঙ্গে জানাল, এতে প্রেসিডেন্টেরও অনুমোদন আছে। কর্নেল রাসেল তিক্ত কণ্ঠে রানাকে বললেন, 'ওপর মহলে নিশ্চয়ই আপনার লোকজন আছে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন কে? উনি আপনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।'

'আপনার হেলিকপ্টার আর লোকজন নিয়ে আমি হাওয়া খেতে যাচ্ছি না,' বলল রানা। 'আপনাকে জানানো হয়নি, রেসকিউ মিশন সফল হওয়াতেই এখানকার বিপদ কাটেনি।'

'আমার লোকজন আর কপ্টার কতক্ষণ দরকার আপনার?' জানতে চাইলেন কর্নেল রাসেল।

'দু'ঘণ্টা।'

'তারপর?'

'সব ফিরে পাবেন। তারপর নিজেদের পথে চলে যাবেন।'

'আপনারা?'

'আমি আর ববি থেকে যাব।'

'কারণটা আমি জানতে চাইছি না,' বললেন কর্নেল রাসেল। 'গোটা অপারেশনটাই আমার কাছে রহস্যময় লাগছে।'

দুর্গ থেকে ওয়েস্ট প্রজেক্ট ছ'কিলোমিটার দূরে, তবে বিশ কিলোমিটার ঘুরে পরিত্যক্ত সেই গ্রামটা হয়ে উড়ে এল ঈগল হেলিকপ্টার। সেই বাজারের পাশে কুয়ার কাছেও গেল রানা, দুই ক্যান ভর্তি পানি নিয়ে এল। এই কুয়া থেকেই দূষিত পানির নমুনা সংগ্রহ করেছিল ওরা। রানার কথা মত ওয়েস্ট প্রজেক্টের মাথার ওপর বার কয়েক চক্কর দিল পাইলট। নিচের গার্ডদের ঈগলের অস্ত্রশস্ত্র ভালভাবে দেখার সুযোগ করে দেয়াটাই উদ্দেশ্য। তিনবার চক্কর দেয়ার পর পাইলট জানাল, 'নিচে থেকে কোন গুলি হচ্ছে না, স্যার। প্যাডে একটা হেলিকপ্টার দেখতে পাচ্ছি। কাছাকাছি পাঁচ-সাতজন লোক রয়েছে, নিরস্ত্র।'

জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে মুরল্যাণ্ড বলল, 'একজনকে চিনতে পারছি, ক্যাপটেন পল সমবেরি।'

'আমাদের নামিয়ে দিন,' বলল রানা।

জমিন থেকে আধ মিটার ওপরে স্থির হলো ঈগল, রকেট লঞ্চার আর চেইন গান গার্ডদের দিকে তাক করা। লাফ দিয়ে নিচে নামল মুরল্যাণ্ড, রানা নামল সাবধানে। লোকগুলোর দিকে একসঙ্গে এগোল ওরা, দেখল পল সমবেরি হাসছে। ওরা কিছু বলার আগে সেই মুখ খুলল, 'ভাবিনি আপনাদের আবার

দেখতে পাব।'

'আমরাও ভাবিনি দেখে তোমরা খুশি হবে। ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

হড়বড় করে সমবেরি যা বলল তার সারমর্ম হলো, স্যাভয় গাসকিলের ওয়েস্ট প্রজেক্টে যে-সব অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে তার সঙ্গে সে বা তার গার্ডরা জড়িত নয়। স্রেফ প্রাণের ভয়ে এখানে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে তারা, জানে পালাতে চেষ্টা করলে নির্ঘাত মারা যাবে। প্রজেক্ট সম্পর্কে অনেক কিছু জানে তারা, সব ফাঁস করে দেবে।

প্রকাণ্ড ডেস্কের পিছনে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন স্যাভয় গাসকিল। চেহারা দেখে মনে হলো রানা ও মুরল্যাণ্ডকে দেখে চরম বিরক্ত বোধ করছেন তিনি। বিশ্বস্ত শিষ্যের মত তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জ্যাঁ ককরু। 'কি চাই?' তীব্র তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল গাসকিলের কথায়।

'ভিনসেন্টের পথ ধরে আপনাকেও জাহান্নামে পাঠাতে চাই,' সকৌতুকে বলল রানা।

হাঁ হয়ে গেলেন গাসকিল। 'জেনারেল মারা গেছেন?'

'একা নন, সঙ্গে তাঁর স্টাফ আর অর্ধেক আর্মি নিয়ে।'

এতক্ষণে বেমানান ব্যাপারটা খেয়াল করলেন গাসকিল। রানা ও মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে একা শুধু ক্যাপটেন সমবেরি নয়, ছ'জন গার্ডও অফিসে ঢুকেছে, তারা দাঁড়িয়ে আছে ওদের দু'জনের দু'পাশে, কারও হাতে কোন অস্ত্র নেই। 'তোমরা?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, হতবিহ্বল দেখাল তাঁকে।

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সমবেরি। 'না, স্যার, আর নয়। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, এখন আমরা ন্যায়ের পক্ষে কাজ করব।'

'আপনার উদ্দেশ্যটা কি?' এবার সরাসরি রানাকে প্রশ্ন করলেন গাসকিল।

'ওয়েস্ট প্রজেক্টটা চাই,' বলল রানা। 'আর জানতে চাই তেবেজা থেকে সরিয়ে কোথায় রাখা হয়েছে খনির সোনা। এ দুটো জিনিস পেলে আপনাকে আপনার হেলিকপ্টারে উঠতে দেয়া হবে, যেখানে খুশি চলে যেতে পারবেন।'

'ওয়েস্ট প্রজেক্ট চান মানে? কেন?'

'ভবিষ্যতে যাতে এটা পরিবেশ দূষণের কারণ না হয়।'

'মালিয়ানরা কোনদিন বহিরাগত একজনকে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে না।'

'দেবে, আমি যদি বলি যে লাভের সবটুকু তারাই পাবে। এক সময় তারাই এটা চালাবে।'

'এরকম একটা টেকনিক্যালি অ্যাডভান্সড সোলার ওয়েস্ট প্রজেক্ট একদল বর্বরদের হাতে তুলে দেবেন আপনি? ওরা দু'দিনেই এটার বারোটা বাজিয়ে দেবে।'

'তা বাজাবে না, কারণ জাতিসংঘের বিজ্ঞানীরা সুপারভাইজ করবে এখানে,' বলল রানা। 'এ প্রসঙ্গ থাক। এবার বলুন সোনাগুলো কোথায় স্টক করেছেন?'

গাসকিল হাসলেন। বিনা যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করার মানুষ নন তিনি। 'ঠিক আছে, ওয়েস্ট প্রজেক্ট নিয়ে যা খুশি করুন। আমার আরও অনেক প্রজেক্ট আছে, ক্ষতিটা পুষিয়ে নিতে পারব। কিন্তু আমার সোনা বা জমা টাকার কথা ভুলে যান।'

'ওগুলো প্যাসিফিকের কোন দ্বীপে আছে, তাই না?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হয়তো। কিন্তু হাজার বছর খুঁজলেও পাবেন না। যা আমার তা আমার, কেউ তাতে হাত দিতে পারবে না।'

'ক্যাপটেন সমবেরি,' বলল রানা। 'তোমার সাবেক বসের কাপড়চোপড় খুলে রোদে ফেলে রাখো। মুখে পট্টি বাঁধতে ভুলো না।'

প্রতিবাদ করল ককরু, 'মসিয়ে গাসকিল একজন সম্মানিত ব্যক্তি, এভাবে আপনারা তাঁকে অপমান করতে পারেন না!'

'টিট ফর ট্যাট,' বলল রানা। গাসকিলের মুখে পট্টি বাঁধা হলো, তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল গার্ডরা।

'মুখে পট্টি কেন?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না মুরল্যাণ্ড।

'ওভাবে যদি তোমাকে রোদে ঝলসানো হয়, পালাবার জন্যে সমবেরি বা তার গার্ডকে কত টাকা ঘুষ দিতে চাইবে তুমি?'

'ও, বুঝেছি!' বলে হেসে উঠল মুরল্যাণ্ড। 'তোমার কি ধারণা, গাসকিল কথা বলবে?'

'যদি না বলে, সোনার সন্ধান আমরা তার সেক্রেটারির কাছ থেকে পেয়ে যাব।'

ককরু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করল, 'যীশুর কিরে, আমি কিছু জানি না!'

'জানো আর না জানো, মার তোমাকে খেতেই হবে,' বলল রানা। 'তবে জানলে, আর বলে ফেললে, কম মার খাবে। তার আগে বলে রাখি, মুরল্যাণ্ডের মনে দয়ামায়া বলে কিছু নেই। তোমাকে আমি ওর হাতেই তুলে দিচ্ছি। মুরল্যাণ্ড, এখনও তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'এই ব্যাটা, আয় আমার সঙ্গে,' ককরুর হাত ধরে দরজার দিকে এগোল মুরল্যাণ্ড।

শাওয়ার সেরে ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে নিল রানা, শরীরটা তাজা হয়ে গেল। গায়ে সিল্ক আলখেল্লা জড়িয়ে গাসকিলের ডেস্কে বসেছে, জানালা দিয়ে দেখছে গাসকিলকে। রোদ তো নয়, বাইরে আগুন জ্বলছে, সেই আগুনে আক্ষরিক অর্থেই সেদ্ধ হচ্ছেন গাসকিল। একটা বস্তার মত টানতে টানতে ককরুকে ভেতরে নিয়ে এল মুরল্যাণ্ড।

'মাত্র দু'ঘণ্টা হয়েছে, এরইমধ্যে কাজ হয়ে গেল?'

রানার কথা শুনে হাসল মুরল্যাণ্ড। 'ককরু বেচারা ব্যথা সহ্য করতে পারে না।'

'সব কথা স্বীকার গেছে?'

'তোমার ধারণাই ঠিক, প্যাসিফিকের একটা দ্বীপে লুকিয়ে রাখা হয়েছে সব সোনা.' বলল মুরল্যাণ্ড। 'দ্বীপের নাম, আকার, কোন পথে যেতে হয়, সব নকশা এঁকে দেখিয়ে দিয়েছে সে। শুধু তাই নয়, গাসকিলের সমস্ত গোপন ফাইলও আমাদের হাতে তুলে দেবে বলে কথা দিয়েছে।'

'ভেরি গুড।'

'আমি কি চাই সেটাও বলুন!' মেঝে থেকে বলল ককরু, তারপর কোন রকমে দাঁড়াল সে। 'জান বাঁচাবার একটা উপায় করে দিন, আমি রাজসাক্ষী হতে চাই।'

'সে দেখা যাবে, আগে ফাইলগুলো হাতে পাই,' বলল রানা। 'মুরল্যাণ্ড, গাসকিল সাহেব যথেষ্ট দগ্ধ হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

স্যাভয় গাসকিলের শরীরের সামনেটা ফুটন্ত পানিতে সেদ্ধ করা সেলফিশের মত দেখতে হয়েছে। এরইমধ্যে তাঁর চামড়ায় ফোস্কা পড়তে শুরু করেছে, কাল সকালের মধ্যে মাংস থেকে ফালি ফালি চামড়া উঠে আসবে। কারও সাহায্য না নিয়ে পল সমবেরি আর দু'জন গার্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন, লাল মুখে ক্রোধ আর ঘৃণা, খেপা কুকুরের মুখের মত দাঁতের ওপর থেকে সরে গেছে ঠোঁট।

'মুরল্যাণ্ড, মসিয়ে গাসকিলকে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার দাও,' বলল রানা। 'সমবেরি, একটা চেয়ারে বসতে বলো ওঁকে।'

বোতল থেকে সরাসরি পানি খেলেন গাসকিল। চেয়ারেও বসলেন। তারপর হিসহিস করে বললেন, 'এর জন্যে আপনাকে ভুগতে হবে!'

'আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিই,' বলল রানা, গাসকিলের কথা যেন শুনতে পায়নি। 'আপনার পার্সোন্যাল সেক্রেটারি ককরু মারা গেছে।'

'হোয়াট! আপনি তাকে খুন করেছেন?'

'সঙ্গে পিস্তল রয়েছে; এমন কোন লোককে কেউ ছুরি নিয়ে তাড়া করে?'

'ছুরি নিয়ে তাড়া করেছিল ককরু?' গাসকিল বিস্মিত হলেন। 'কিন্তু তাকে তো আমি কাপুরুষ হিসেবে জানি।'

রানা ও মুরল্যাণ্ড দৃষ্টি বিনিময় করল। মিথ্যে কথা বলছে রানা। ককরু এই মুহূর্তে বেসমেন্টের একটা কামরা থেকে গোপন ফাইল বের করছে, গার্ডদের পাহারায়। 'আমার একটা প্রস্তাব আছে,' বলল রানা।

কথা না বলে তাকিয়ে থাকলেন গাসকিল।

'আপনি যদি কথা দেন জীবনে আর মানুষের কোন ক্ষতি করবেন না, এখুনি আপনাকে এই কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেব আমি,' বলল রানা। 'হেলিকপ্টার নিয়ে মালি ছেড়ে চলে যাবেন আপনি।'

'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন?'

'না। আপনাকে আমার একটা আপদ বলে মনে হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি বিদায় করা যায় ততই ভাল।'

'কিন্তু রানা···' প্রতিবাদ করল মুরল্যাণ্ড।

তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'কোন তর্ক নয়। ক্যাপটেন সমবেরি, গাসকিলকে তাঁর হেলিকপ্টারে তুলে দাও। এখুনি!'

শরীরে ব্যথা সত্ত্বেও হাসলেন গাসকিল, কি ভেবে কে জানে। বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিতে ঘণ্টা দু'য়েক সময় লাগবে।'

'কিছুই সঙ্গে নিতে পারবেন না। আপনার হাতে সময় আছে মাত্র দু'মিনিট। এর পরেও যদি এখানে আপনি থাকেন, আমি নিজের হাতে খুন করব আপনাকে।'

এরপর আর দেরি করলেন না গাসকিল, গার্ডদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন অফিস থেকে।

খানিক পরের ঘটনা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে মুরল্যাণ্ড। 'উনি উত্তর-পুবদিকে যাচ্ছেন,' বলল সে। হেলিকপ্টারটা অদৃশ্য হবার পর রানার দিকে তাকাল।

'আমার ধারণা লিবীয়ায় যেতে চান,' বলল ক্যাপটেন সমবেরি।

'কোথায় যেতে চান না চান, সেটার কোন গুরুত্ব নেই,' বলল রানা।

'লোকটাকে তোমার ছেড়ে দেয়া উচিত হয়নি,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'মৃত্যুদণ্ডই ওর পাওনা ছিল।'

'চিন্তা কোরো না। উনি এক হপ্তাও বাঁচবেন না।'

'মানে?' মুরল্যাণ্ড অবাক হয়ে তাকাল। 'কি যেন লুকাচ্ছ তুমি।'

'গাসকিলকে রোদে ফেলে রাখার কারণ হলো আমি চেয়েছিলাম পিপাসায় ছটফট করুন উনি,' বলল রানা।

'বুঝলাম না!'

'এখানে মিনারেল ওয়াটারের যে বোতলগুলো রয়েছে সেগুলো খালি করে দূষিত পানি ভরে রেখেছিলাম আমি। আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টোরেজ ভল্ট থেকে কেমিকেল লিক করছে, মিশছে মাটির তলার পানির সঙ্গে। সেই পানি এখানে আসার পথে কাছাকাছি একটা গ্রামের কুয়া থেকে খানিকটা তুলে এনেছি আমি।'

'মাই গড! ঈগল নিয়ে সেজন্যেই তুমি গ্রামে নামো! আমি ভাবলাম আরও নমুনা দরকার হতে পারে ভেবে ক্যানগুলো ভরতে চাইছ তুমি।'

'আমি এটাকে বলব, পোয়েটিক জাস্টিস,' বলল রানা। 'গাসকিল প্রায় তিন লিটার পানি খেয়েছেন।'

'ওই পানি খেলে সত্যি বাঁচার কোন উপায় নেই?' জানতে চাইল সমবেরি।

মাথা নাড়ল রানা। 'বিছানার সঙ্গে বেঁধে রাখতে হবে গাসকিলকে, যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নিজের মৃত্যু কামনা করবেন তিনি। খুব ভাল হত তিনি যাদের খুন করেছেন তারা যদি দৃশ্যটা দেখার সুযোগ পেত।'

স্যাভয় গাসকিলের টক্সিক ওয়েস্ট প্রজেক্ট দখল করার দু'হপ্তা পরে জানা গেল, জানালেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দক্ষিণ আটলান্টিক সার্ভে করে দেখা গেছে রেড টাইডের ছড়িয়ে পড়ার হার কমতে শুরু করেছে। ভালর সঙ্গে খারাপ খবরও আছে। দুনিয়ার সর্বমোট অক্সিজেন সাপ্লাই পাঁচ পার্সেন্ট কমে গেছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হবে পরে।

জাতিসংঘ বিজ্ঞানীদের সহায়তায় ওয়েস্ট প্রজেক্ট থেকে সিনথেটিক অ্যামিনো অ্যাসিডের নিষ্ক্রমণ বন্ধ করা হয়েছে আগেই, ফলে নাইজার নদীর পানি নতুন করে দূষিত হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। ওয়েস্ট প্রজেক্টে বিরতিহীন কাজ চলছে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টোরেজ ভল্ট থেকে নিউক্লিয়ার বর্জ্য তুলে এনে পুড়িয়ে ফেলছেন বিজ্ঞানীরা।

ইতিমধ্যে মালির প্রেসিডেন্ট নিজে এসে দেখে গেছেন ওয়েস্ট প্রজেক্টের কাজকর্ম। এই সুযোগে রানাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি, বলেছেন মালির জনসাধারণ চিরকাল ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

কিটি ম্যানক, তাঁর প্লেন ও ডায়েরীর কথা ভোলেনি রানা। তিনি তাঁর ডায়েরীতে মরুভূমির মাঝখানে যে জাহাজটার কথা উল্লেখ করে গেছেন সেটা মার্কিন গৃহযুদ্ধের সময়কার কনফেডারেট আয়রনক্ল্যাড হলেও হতে পারে, এ-কথা ভেবে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে মরুভূমিতে তল্লাশী চালাবার একটা অনুমতি আগেভাগে নিয়ে রাখল ও। গোপন না করে এ-ও বলল যে ওই জাহাজে প্রচুর সোনা থাকতে পারে। কোন ভূমিকা না করে বা ব্যাখ্যা না দিয়ে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করলেন, 'যা পাওয়া যাবে তার অর্ধেক আপনার।' রানার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে কপ্টারে উঠে পড়লেন তিনি।

স্যাটেলাইটের মাধ্যমে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা হলো রানার। তিনিই খবরটা দিলেন, 'কিটি ম্যানক আর তার প্লেন আবিষ্কৃত হওয়ায় গোটা অস্ট্রেলিয়ায় মহা হৈ-চৈ পড়ে গেছে। তোমাকে আর মুরল্যাণ্ডকে জাতীয় বীর বলছে ওরা, অন্তত সিডনির দৈনিকগুলো সে খবরই ছেপেছে। শুধু তাই নয়, ওখানকার ধনী এক র‍্যাঞ্চার প্লেনটা সাহারা থেকে উদ্ধার করে আনার জন্যে সমস্ত খরচ দিতে রাজি হয়েছেন, ওটা রাখা হবে মেলবোর্ন মিউজিয়ামে। কিটির লাশ যেদিন পৌঁছুবে, অস্ট্রেলিয়ায় সেদিন সরকারী ছুটি থাকবে।'

'ছুটি থাকবে আপনার দেশেও, অ্যাডমিরাল,' মন্তব্য করল রানা।

কৌতূহলী অ্যাডমিরাল জানতে চাইলেন, 'কিটির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কি সম্পর্ক?'

'কিটি আমাদেরকে কনফেডারেট আয়রনক্ল্যাড টেক্সাসের কাছে নিয়ে যাবেন,'

বলল রানা। 'বিউ মরটনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, এ-ব্যাপারে বিস্তারিত বলতে পারবে সে– অন্তত আমার তাই ধারণা। ভাল কথা, তাকে বলুন, আমি তাকে মালিতে দেখতে চাই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'গুড লর্ড!' হেলিকপ্টারের উইণ্ডশীল্ড দিয়ে ধু-ধু মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল বিউ মরটন। 'এই জাহান্নাম তোমরা হেঁটে পার হয়েছ?'

'ঠিক হেঁটে নয়, নিজেদের তৈরি ল্যাণ্ড ইয়টে চড়ে,' জবাব দিল রানা। 'ফিরতি পথে উড়ে যাচ্ছি।'

একটা মিলিটারি জেটে চড়ে আলজিয়ার্সে পৌঁছায় মরটন, তারপর একটা কমার্শিয়াল এয়ারলাইনার ধরে দক্ষিণ আলজিরিয়ার মরুশহর আদরারে চলে আসে। ওখানে মাঝরাতের খানিক পর তার সঙ্গে দেখা করে রানা ও মুরল্যাণ্ড, ওয়েস্ট প্রজেক্টের ফ্রেঞ্চ ঠিকাদারদের একটা কপ্টারে তুলে নেয় তাকে।

নতুন করে ফুয়েল নেয়ার পর দক্ষিণ দিকে রওনা হয় ওরা, ভোরের ঠিক পরপর খুঁজে বের করে ল্যাণ্ড ইয়টটাকে। আরব ট্রাক ড্রাইভার যেখানে ওদেরকে আবিষ্কার করেছিল ঠিক সেখানেই পাওয়া যায় ওটা। ল্যাণ্ড করার পর ইয়টের উইং, কেবল আর হুইলগুলো বিচ্ছিন্ন করে ওরা, হেলিকপ্টারের ল্যাণ্ডিং স্কিডের সঙ্গে রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নেয়। এরপর আবার আকাশে ওঠে কপ্টার, কন্ট্রোলে রানা। কিটি ম্যানকের প্লেনের কাছে যাচ্ছে ওরা, সেই নালায়।

কিটির লগবুক বা ডায়েরী থেকে কিছু নোট করেছে রানা, পথে সেগুলো মন দিয়ে পড়ছে মরটন। 'কি সাহসী মহিলা,' প্রশংসা না করে পারল না সে। 'সঙ্গে মাত্র কয়েক ঢোক পানি ছিল, গোড়ালি ভেঙে গিয়েছিল, মচকে গিয়েছিল হাঁটু, তারপরও গরম মরুভূমির ওপর দিয়ে প্রায় ষোলো কিলোমিটার হেঁটে গিয়েছিলেন! ভাবা যায়?'

'শুধু যাননি,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'মরুভূমিতে জাহাজটা আবিষ্কার করার পর খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার নিজের প্লেনের কাছে ফিরেও এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ, তাই লিখেছিলেন তিনি,' বলল মরটন, তারপর সবাইকে শুনিয়ে পড়তে শুরু করল সে।

''অক্টোবর চোদ্দ, বুধবার। প্রচণ্ড গরম। সাঙ্ঘাতিক কষ্ট হচ্ছে আমার। নালা ধরে দক্ষিণ দিকে রওনা হই, এক পর্যায়ে দেখতে পাই নালাটা মিশেছে শুকনো ও চওড়া একটা রিভারবেডে। আমার হিসাবে প্লেন থেকে দশ মাইল দূরে। অসহ্য ঠাণ্ডায় একটা রাতও ঘুমাতে পারলাম না। আজ দুপুরে বালির ভেতর আধডোবা অবস্থায় দেখলাম অদ্ভুতদর্শন একটা জাহাজ। প্রথমে ভেবেছিলাম দৃষ্টিভ্রমের শিকার হয়েছি, কিন্তু ঢালু লোহার গা ছোঁয়ার পর বুঝলাম জিনিসটা বাস্তব সত্য। পুরানো কামান বেরিয়ে আছে একটা গর্ত থেকে, ওখানে আশ্রয় নিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

''অক্টোবর পনেরো, বৃহস্পতিবার। জাহাজের ভেতরটা সার্চ করলাম। অন্ধকারে বেশি কিছু দেখা গেল না। সাবেক ক্রুদের কিছু অবশিষ্ট দেখলাম।

তাদের ইউনিফর্ম দেখে বুঝতে পারলাম বহুকাল আগে মারা গেছে। ওপর দিয়ে একটা প্লেন উড়ে গেল, তবে জাহাজটাকে ওরা দেখতে পায়নি। বাইরে বেরিয়ে সঙ্কেত দেয়ার সময় পাওয়া গেল না। পাইলট উড়ে গেল আমার প্লেনের দিকে। এখানে কেউ আমাকে খুঁজে পাবে না, তাই সিদ্ধান্ত নিলাম নিজের প্লেনের কাছে ফিরে যাব। প্লেনের কাছে থাকলে তবু একটা আশা থাকবে উদ্ধার পাবার।''

থামল মরটন, মুখ তুলে তাকাল। 'এতে বোঝা যায় লগবুকটা ক্র্যাশ সাইটে কেন পেলে তুমি। উদ্ধার পাবার মিথ্যে আশায় ফিরে আসেন তিনি।'

'তাঁর শেষ কথাটা কি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

একটা পাতা উল্টে আবার পড়তে শুরু করল মরটন।

''অক্টোবর আঠারো, রোববার। প্লেনের কাছে ফিরে এসেছি, কিন্তু রেসকিউ পার্টির কোন চিহ্ন নেই। আমি খুব কাহিল হয়ে পড়েছি। আমি মারা যাবার পর যদি আমাকে পাওয়া যায়, যে ব্যথা ও শোকের কারণ হয়েছি তার জন্যে আমাকে যেন ক্ষমা করা হয়। মাম আর ড্যাডকে চুমো দিলাম। তাদেরকে বলবেন, মরার সময়ও আমি সাহস হারাইনি। আমি আর লিখতে পারছি না, হাতের ওপর মস্তিষ্কের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকছে না।''

সবাই ওরা বিষণ্ন হয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই কঠিন পাত্র, তা সত্ত্বেও পরস্পরের কাছ থেকে চোখ লুকাতে চেষ্টা করছে। এক সময় নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'সাহস বলতে কি বোঝায়, এই মহিলা অনেক মানুষকে তা শেখাতে পারতেন।'

'শুধু তাঁর সাহসের কারণেই ইতিহাসের একটা অদ্ভুত রহস্য আজ হয়তো মীমাংসা হতে যাচ্ছে,' বলল মরটন।

দু'ঘণ্টা পর, সকাল আটটা চল্লিশ মিনিটে নালার মেঝেতে নামল ওদের হেলিকপ্টার। অস্ট্রেলিয়ান রিকভারি টীম অভ্যর্থনা জানাল ওদেরকে। কিটি ম্যানকের পুরানো ফেয়ারচাইল্ড প্লেনটা, রানা ও মুরল্যাণ্ড অংশবিশেষ খুলে নেয়ার পর যে-টুকু অবশিষ্ট আছে, উদ্ধার করে ট্রাকে তুলছিল ওরা। বাকি অংশ ফেরত পেয়ে রানা ও মুরল্যাণ্ডকে বুকে জড়িয়ে ধরল ওদের লীডার সীন টার্ফ।

আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে কিটি ম্যানকের লগবুকটা পকেট থেকে বের করে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'কিটির পাইলট লগ। এটা আপনাদের মিউজিয়ামেই থাকা উচিত।'

'আপনার ও মি. মুরল্যাণ্ডের প্রতি অস্ট্রেলিয়ার মানুষ চিরঋণী হয়ে থাকবে,' টার্ফ বলল। 'শুধু যে একটা পুরানো রহস্যের সমাধান হলো তা নয়, কিটিকে আমরা ফিরেও পেয়েছি।'

একটা পোর্টেবল ক্রেন প্রাচীন প্লেনের এঞ্জিনটা ট্রাকে তুলছে, সেদিকে

*

লার ওপর দিয়ে সোজা একটা রেখা তৈরি করে ছুটে চলেছে ওদের লিকপ্টার। প্রাচীন রিভারবেডে পৌছুতে সময় লাগল মাত্র দু'মিনিট। 'ওয়েদ রিট,' বিড়বিড় করল মরটন। 'বিশ্বাস করা কঠিন এই জায়গা এক সময় নিতে থই থই করত।'

'ওয়েদ জারিট,' পুনরাবৃত্তি করল রানা। 'বুড়ো আমেরিকান প্রসপেক্টরও এই াম বলেছিলেন। তাঁর ধারণা, একশো ত্রিশ বছর আগে নদীটা শুকাতে শুরু রে।'

'তাঁর ধারণা ভুল নয়। এই এলাকার প্রাচীন ফ্রেঞ্চ সার্ভে সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করেছি আমি,' বলল মরটন। 'এই জায়গার কাছাকাছি কোথাও একটা পোর্ট ছিল, কাফেলার লোকজন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জিনিস-পত্র কেনাকাটা করত– ব্যবসায়ীদের নৌকা বহর ছিল। কে বলবে বন্দরটা এখন কোথায়। দীর্ঘ খরায় নদীর পানি শুষে নেয় বালি, বন্দরটাও হারিয়ে যায়।'

'তখনকার সেই নদী ধরে টেক্সাস এদিকে এসেছিল, এই হলো থিওরি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'নদী শুকিয়ে যাওয়ায় জাহাজটা বালির নিচে চাপা পড়েছে?'

'থিওরি নয়। বীচার নামে টেক্সাসের এক ক্রুর বিবৃতি পড়েছি আমি। মরার আগে দিয়ে গেছে। তার বক্তব্য, টেক্সাসের ক্রুদের মধ্যে একমাত্র সে-ই বেঁচে যায়। আটলান্টিক থেকে নাইজার নদীতে টেক্সাসের ঢুকে পড়া থেকে শুরু করে বালিতে আটকা পড়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে গেছে সে।'

'কি করে বুঝছ এ-সব মুমূর্ষু রোগীর প্রলাপ নয়?' প্রশ্ন করল মুরল্যাণ্ড।

'এমন বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে, বিশ্বাস না করা কঠিন।'

'প্রসপেক্টর আরও বলেছেন, টেক্সাস কনফেডারেসীর সোনা বহন করছিল।' হেলিকপ্টারের স্পীড কমিয়ে নালার চারদিকে চক্কর দিচ্ছে রানা।

রানার কথায় মাথা ঝাঁকাল মরটন। 'বীচার সোনার কথাও বলেছে। তার দেয়া একটা ক্লু পেয়ে সে-সময়কার যুদ্ধমন্ত্রী এডউইন স্ট্যানটন-এর গোপন কিছু ব্যাপার জানতে পেরেছি আমি, অপ্রকাশিত কিছু কাগজ পাওয়া গেছে ..'

'ওটা কি?' বাধা দিল মুরল্যাণ্ড, উইণ্ডশীল্ডের দিকে হাত তুলে নিচে তাকিয়ে আছে। 'দেখতে পাচ্ছ, বড় একটা বালিয়াড়ি? পশ্চিম ঢালটা দু'ভাগ হয়ে গেছে?'

'মাথায় পাথর রয়েছে একটা?' জিজ্ঞেস করল মরটন, তার গলায় উত্তেজনা।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ইন্সট্রুমেন্টটা বের করো, মরটন যেটা ওয়াশিংটন থেকে এনেছে,' নির্দেশ দিল রানা। 'ওটা তুমি রেডি করলেই বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে কপ্টার নিয়ে যাব আমি।'

আয়রন-ডিটেকটিং ইন্সট্রুমেন্টটা প্যাকেট থেকে বের করল মুরল্যাণ্ড, ব্যাটারি কানেকশন চেক করল, তারপর সেনসিটিভিটি রিডিং সেট করে বলল, 'সেনসর ড্রপ করার জন্যে আমি তৈরি।'

দশ নট গতিতে বালিয়াড়ির দিকে এগোল রানা।

কেবল সহ সেনসরটা নামিয়ে দিল রানা, ক্যাবলের অপর প্রান্তটা রয়েছে গ্রেডিয়োমিটারে। হেলিকপ্টারের পেট থেকে দশ মিটার নিচে ঝুলছে সেনসর। মুরল্যাণ্ড ও মরটন এবার ফ্রিকোয়েন্সী ডায়ালের কাঁটার ওপর চোখ রাখল। বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে ধীরগতিতে এগোচ্ছে কপ্টার, কাঁটাটা কাঁপছে, সাউণ্ড অ্যামপ্লিফায়ার থেকে মৃদু আওয়াজ বেরুচ্ছে। হঠাৎ করে কাঁটাটা ডায়ালের আরেক মাথার দিকে ছুটল, সেই সঙ্গে অ্যামপ্লিফায়ার থেকে তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'স্কেল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে কাঁটা!' উল্লাসে ফেটে পড়ল মুরল্যাণ্ড। 'নিচে বিশাল একটা লোহা আছে।'

'রিডিংটা গোলাকার ওই খয়েরি পাথরটা থেকেও আসতে পারে,' সাবধান করে দিয়ে বলল মরটন। 'এদিকের মরুতে আয়রন ওর প্রচুর।'

'পাথর নয়!' রানার উত্তেজিত গলা শোনা গেল। 'ওটা মরচে ঢাকা স্মোকস্ট্যাক।'

বালিয়াড়ির ওপর হেলিকপ্টার ঝুলিয়ে রাখল রানা। কারও মুখে আর কোন কথা নেই। এতদিন সবার মনেই সন্দেহ ছিল জাহাজটা সত্যি পাওয়া যাবে কিনা। এখন আর কোন সন্দেহ নেই।

টেক্সাস নতুন করে আরেকবার আবিষ্কৃত হতে যাচ্ছে।

আবিষ্কারের উল্লাস একটু পরই হতাশায় পরিণত হলো। স্মোকস্ট্যাকের দু'মিটার বাইরে বেরিয়ে থাকলেও, গোটা জাহাজ ডুবে আছে বালির ভেতর। ওই বিপুল বালি সরাতে কোদাল লাগবে, শ্রমিক লাগবে, সেই সঙ্গে লাগবে কয়েক দিন সময়। তারপর রানার মাথায় একটা বুদ্ধি এল, ও বলল, 'হাইপ্রেসার হোস আমাদের নেই বটে, তবে ঝড় তুলতে পারে এমন একটা হেলিকপ্টার তো রয়েছে। বালিয়াড়ির মাথাটা চূড়া আকৃতির, রোটর ব্লেডের বাতাস দিয়ে ওটাকে আমরা যদি তিন মিটার কমিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে সম্ভবত আয়রনক্ল্যাডের কেসমেট-এর মাথাটা দেখতে পাব।'

কপ্টার নিয়ে আবার আকাশে উঠল রানা, বালিয়াড়ির চূড়ার খানিক ওপর শূন্যে রাখল ওটাকে। নিচের বালিতে ঝড় তুলল রোটরের তীব্র বাতাস। দশ মিনিট পেরুল, তারপর বিশ মিনিট। বালি উড়তে থাকায় নিচের কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

'আর কতক্ষণ?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড। 'পাথরকুচি টারবাইনের বারোটা বাজাচ্ছে।'

'বাজাক,' বলে আরও দশ মিনিট বালিতে ঝড় তুলল রানা। তারপর কপ্টার নিয়ে সরে এল বাড়িয়াড়ি থেকে খানিক দূরে।

বালির মেঘ জমিনে ফিরে যেতে সময় নিল প্রচুর। তিনজনই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। এক সময় নিস্তব্ধতা ভাঙল মরটন, 'বেরিয়েছে! বেরিয়ে পড়েছে!' সত্যি তাই। আয়রন প্লেট আর রিভিট দেখে মনে হলো পাইলটহাউসের অংশ।

বালি আরও সরে যেতে আয়রনক্ল্যাডের দুই মিটার ডেকও এবার দেখা গেল।

দশ মিনিট পর তিনজনকে দেখা গেল টেক্সাসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কেসমেট-এর কাঠকে যে লোহা মুড়ে রেখেছে তাতে খুব সামান্যই মরচে ধরেছে। ইউনিয়ন নেভীর কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেল আর্মারপ্লেটে দাগ ও গর্ত দেখে। পিছনের এণ্ট্রি হ্যাচ বন্ধ, তবে তিনজন মিলে চেষ্টা করার পর খোলা সম্ভব হলো। একটা মই অন্ধকারে নেমে গেছে। মুখ তুলে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা।

কথা বলল মুরল্যাণ্ড, 'সম্মানটা তোমার পাওনা হয়েছে, রানা। তুমিই আমাদেরকে এখানে এনেছ।' কাঁধ থেকে একটা ব্যাকপ্যাক নামিয়ে ভেতরে হাত ভরল সে, বের করে আনল তিনটে ম্যাক্সিমাম অপটিক ফ্ল্যাশলাইট। একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে মই বেয়ে নামতে শুরু করল রানা।

নিচে নামার পর প্রথমেই চোখে পড়ল হুইল, যেন ভৌতিক একজন হেলসম্যানের জন্যে অপেক্ষা করছে। আর চোখে পড়ল এক সেট স্পীকিং টিউব। উঁচু একটা টুল দেখা গেল, বালি ভর্তি এককোণে উল্টে পড়ে রয়েছে। খোলা একটা হ্যাচের সামনে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। হ্যাচটা নেমে গেছে গান ডেকে। তারপর বড় করে শ্বাস টেনে নামতে শুরু করল ও।

নিচে নেমে এসে চারদিকে টর্চের আলো ফেলল রানা। একটা একশো পাউণ্ডার কামান দেখা গেল, বাকি দুটো চৌষট্টি পাউণ্ডার, সবগুলো অর্ধেক ডুবে আছে বালিতে। ওই তিনটে অস্ত্র ছাড়া আর কিছু নেই গানডেকে– না ফায়ার বাকেট, না র‍্যামরড, না শট বা কোন শেল। মুরল্যাণ্ড ও মরটনের দিকে তাকাল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'এখানে কিছু নেই কেন? কিটি লাশ দেখার কথা লিখে গেছেন, সেগুলোই বা কোথায়?'

'বোধহয় নিচে,' বলল মুরল্যাণ্ড।

প্রথমে ওরা ক্রুদের কোয়ার্টারে নামল। নেমেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। কমপার্টমেণ্টটাকে ক্রুদের কবরস্থান বললেই হয়। লাশের সংখ্যা পঞ্চাশটার কম হবে না। বেশিরভাগ মারা গেছে বাঙ্কে শোয়া অবস্থায়। নদীতে সুপেয় পানি থাকলেও, লাশগুলোর চ্যাপ্টা পেট দেখে বোঝা যায় খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবার পর দিনের পর দিন হপ্তার পর হপ্তা উপোস থাকতে হয়েছিল ওদেরকে। কেউ কেউ মেস টেবিলে ঢলে পড়েছে, ডেকেও হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে কয়েকজন। পরনের কাপড়চোপড় ছেঁড়া-ফাটা, পায়ে জুতো নেই। কারও কোন ব্যক্তিগত জিনিস-পত্রও চোখে পড়ছে না।

'টুয়ারেগরা সব লুঠ করে নিয়ে গেছে,' বিড়বিড় করল মুরল্যাণ্ড।

'হ্যাঁ,' সায় দিল মরটন। 'বীচার লিখেছে, বেদুইনরা জাহাজে হানা দিয়েছিল।'

'বর্শা আর তীর সম্বল করে একটা যুদ্ধজাহাজে হামলা চালাল কোন্ সাহসে?' প্রশ্ন করল মুরল্যাণ্ড।

'সোনার লোভে মৃত্যুকে পরোয়া করেনি,' বলল মরটন। 'বীচার লিখেছে,

সোনার বিনিময়ে বেদুইনদের কাছ থেকে পণ্য কেনেন ক্যাপটেন।'

'তাহলে সোনা পাবার কথা ভুলে যেতে পারি আমরা!' মুরল্যাণ্ডের গলায় হতাশার সুর।

সোনা পাওয়া গেলে বাংলাদেশের লাভ হত। না পাওয়া গেলেও কোন ক্ষতি নেই। রানা তাই কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল।

এরপর ওরা এঞ্জিন রূমে চলে এল। কয়লার স্তূপ দেখা গেল এক ধারে, দেয়ালে ঝুলছে কোদাল। ধুলো জমলেও এঞ্জিন আর বয়লার এখনও খুব ভাল অবস্থায় রয়েছে। ছোট একটা ডেস্ক দেখা গেল, সেটার ওপর ঝুঁকে বসে রয়েছে এক লোক। ডেস্কের ওপর একটা হাত, হাতের নিচে হলুদ একটা কাগজ; পাশেই একটা দোয়াত, উল্টে পড়ে আছে। ধীরে ধীরে হাতের নিচে থেকে কাগজটা টেনে নিল রানা, টর্চের আলোয় পড়ল।

"শরীরে যতক্ষণ একবিন্দু শক্তি ছিল ততক্ষণ আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। প্রিয় ও বিশ্বস্ত এঞ্জিনগুলোকে নিখুঁত অবস্থায় রেখে যাচ্ছি। ওরা সাগর পাড়ি দিয়ে নিরাপদে এখানে পৌঁছে দেয় আমাদের, কোন রকম ঝামেলা করেনি। আমি ওদেরকে পরবর্তী এঞ্জিনিয়ারের হাতে তুলে দিয়ে গেলাম, তারা যেন ঘৃণিত ইয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে কাজে লাগায়। ঈশ্বর কনফেডারেসীকে রক্ষা করুন। টেক্সাস-এর চীফ এঞ্জিনিয়ার, অ্যাঙ্গাস ও'হারে।"

'এখানে বসে আছেন একজন নিষ্ঠাবান মানুষ,' রানার গলায় প্রশংসা।

'আজকাল আর এরকম মানুষ দেখা যায় না,' সায় দিল মরটন।

জোড়া এঞ্জিন আর বয়লারগুলোকে পাশ কাটিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা, ঢুকে পড়ল অফিসার্স কোয়ার্টার আর মেসে। এখানে মোট চারটে কেবিন দেখা গেল, প্রতিটিতেই লাশ রয়েছে, সবাই যে যার বাঙ্কে শুয়ে মারা গেছে। সবশেষে মেহগনি কাঠের একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'এটাই বোধহয় ক্যাপটেনের কেবিন,' বলল ও।

মাথা ঝাঁকাল মরটন। 'কমাণ্ডার ম্যাসন টম্বস। খুব শক্ত মানুষ ছিলেন।'

নব ঘুরিয়ে দরজা খুলল রানা। হঠাৎ খপ করে রানার বাহু খামচে ধরল মরটন, 'দাঁড়াও!'

অবাক হয়ে ঘাড় ফেরাল রানা। 'কি হলো? কেন? এত ভয় পাচ্ছ কেন?'

এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে মরটন বলল, 'আমার সন্দেহ হচ্ছে ভেতরে এমন কিছু থাকতে পারে যা আমাদের না দেখাই ভাল।'

'কি যে বলো না!' প্রতিবাদ করল মুরল্যাণ্ড।

'তুমি যেন কি গোপন করে যাচ্ছ, মরটন,' অভিযোগ করল রানা।

'এডউইন স্ট্যানটনের গোপন নথিতে কি লেখা আছে তোমাকে আমি তা বলিনি।'

'পরে শুনব,' রানার গলায় বিরক্তি। নিজেকে ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

কেবিনটা ছোট, এখান থেকেও জাহাজের সঙ্গে জোড়া লাগানো নয় এমন সব জিনিস গায়েব হয়ে গেছে। তবে বুকশেলফ আর একটা ভাঙা ব্যারোমিটার আছে।

কি কারণে কে জানে, বেদুইনরা একটা রকিং চেয়ার নিয়ে যায়নি।

টর্চের আলোয় দুটো লাশ দেখা গেল, একটা বাঙ্কে শুয়ে আছে, অপরটা রকিং চেয়ারে বসে যেন ঢুলছে। বাঙ্কে কাত হয়ে শুয়ে আছে প্রথম লাশ, পরনে কোন কাপড় নেই। লাল চুলে মুখ আর মাথা খানিকটা ঢাকা। অন্যান্য লাশের মত এ-দুটোও মরুর শুকনো তাপে মমিতে পরিণত হয়েছে। রকিং চেয়ারে বসা লোকটার পরনে শুধু আণ্ডারওয়্যার।

বসে থাকা অবস্থায়ও অসম্ভব লম্বা লাগছে লোকটাকে। তার মুখে দাড়ি, কান দুটো খাড়া। চোখ বন্ধ, যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘন ভুরু, তবে আকারে খুব ছোট। চুল আর দাড়ি ঘন কালো, পাক ধরেছে সামান্য।

'এই ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে আব্রাহাম লিংকনের অদ্ভুত মিল দেখতে পাচ্ছি আমি,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'মিল আছে মনে হওয়াটা তোমার চোখের ভুল,' কথা বলছে মরটন। 'উনিই আব্রাহাম লিংকন।' সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে লাশটার দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখে উদ্বেগ, মরটনের দিকে ফিরল রানা। 'তোমার মত বিখ্যাত একজন হিস্টোরিয়ান ভুল করবে, এ আমি ভাবতে পারি না, মরটন।'

থরথর করে কাঁপছে মরটন, বাল্কহেডের পাশে বসে পড়ল সে। তাড়াতাড়ি তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল মুরল্যাণ্ড। ব্যাকপ্যাক থেকে পানির একটা বোতল বের করে বাড়িয়ে ধরল সে, বলল, 'গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছ, বুঝতে পারছি।'

হাত ঝাপটা দিয়ে বোতলটা সরিয়ে দিল মরটন। 'গড, ওহ্ গড! নিজেকেই আমি বিশ্বাস করাতে পারিনি। কিন্তু লিংকনের যুদ্ধমন্ত্রী, এডউইন স্ট্যানটন, তাঁর গোপন নথিতে সত্যি কথাটা প্রকাশ করে গেছেন।'

'সত্যি কথাটা মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মরটন এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর কাঁপা গলায় বলল, 'ফোর্ড থিয়েটারে জন বুথ লিংকনকে গুলি করেনি। রকিং চেয়ারে বসে আছেন উনি লিংকন।'

নয়

নিস্তব্ধতা ভেঙে রানা বলল, 'তোমাদের ইতিহাসে লিংকনের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। থিয়েটারে একশোর বেশি সাক্ষী ছিল। কিভাবে বলো ঘটনাটা ঘটেনি?'

'গোটা ব্যাপারটা ছিল স্ট্যানটনের সাজানো, লিংকনের মত দেখতে এক লোককে দিয়ে অভিনয় করানো। আসল লিংকনকে কনফেডারেটরা ধরে ফেলে, সাজানো হত্যাকাণ্ড ঘটার দু'দিন আগে। তাঁকে বন্দী করে রাখা হয় রিচমণ্ডে। কাহিনীর এই অংশটুকু আরেকজন মৃত্যুশয্যা থেকে সমর্থন করে গেছে, সে ছিল

কনফেডারেট অশ্বারোহী বাহিনীর একজন ক্যাপটেন, তার নেতৃত্বেই লিংকনকে গ্রেফতার করা হয়।'

প্রথমে মুরল্যাণ্ডের দিকে, তারপর আবার মরটনের দিকে তাকাল রানা। 'এই ক্যাপটেনের নাম কি নেভাইল ব্রাউন?'

মরটনের মুখ ঝুলে পড়ল। 'তুমি জানলে কিভাবে?'

'সাহারায় বৃদ্ধ এক প্রসপেক্টরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমাদের, টেক্সাস আর সোনা সম্পর্কে তার কাছ থেকেই শুনি আমরা। ব্রাউনের গল্পও বলেন তিনি।'

'আমরা ধরে নিয়েছিলাম রূপকথা,' বলল মুরল্যাণ্ড, হতচকিত ভাবটা এখনও সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

'আমার কথা বিশ্বাস করো, রূপকথা নয়।' ল্যাশটার দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না মরটন। 'কনফেডারেড প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিস-এর একজন এইড লিংকনকে কিডন্যাপের প্ল্যান করেছিল, উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণের যে-টুকু অবশিষ্ট আছে সে-টুকু রক্ষা করা। রিচমণ্ডের চারদিকে শক্ত গেরো এঁটে রেখেছিলেন গ্র্যান্ট, ভার্জিনিয়ায় জেনারেল লীর আর্মিকে পিছন থেকে আক্রমণ করার জন্যে মার্চ করে এগোচ্ছিলেন শেরম্যান, অর্থাৎ যুদ্ধে যে তাঁদের পরাজয় ঘটেছে এটা সবাই বুঝতে পারছিল। এইড পরামর্শ দেয় লিংকনকে আটক করা হোক, তারপর আত্মসমর্পণের শর্ত নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু গোল বাধান এডউইন স্ট্যানটন, তিনি ব্ল্যাকমেইলিঙের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি হননি। লিংকন স্ট্যানটনকে পছন্দ না করলেও যুদ্ধমন্ত্রীর পদটা দিয়েছিলেন শুধু এই কারণে যে তিনিই সবচেয়ে উপযুক্ত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছেন দেখে খুশি হলেন স্ট্যানটন...'

'লিংকনকে কিভাবে কিডন্যাপ করা হয়?' জানতে চাইল রানা।

'সবাই জানত ক্যারিজ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই ওয়াশিংটনের আশপাশে ঘুরতে বেরোন প্রেসিডেন্ট। ইউনিয়ন ক্যাভালরির ইউনিফর্ম পরে একটা কনফেডারেট ক্যাভালরি ট্রুপ ক্যাপটেন ব্রাউনের নেতৃত্বে আক্রমণ করে সেই ক্যারিজ; লিংকনের এসকর্টদের কাবু করে লিংকনকে নিয়ে পালিয়ে যায় কনফেডারেটদের দখল করা এলাকায়।'

কাহিনীর বিচ্ছিন্ন অংশগুলো জোড়া লাগাতে অসুবিধে হচ্ছে রানার। ঐতিহাসিক একটা ঘটনা, যা সবাই ধ্রুবসত্য বলে জানে, অথচ এত বছর পর বলা হচ্ছে সেটা ছিল ভুয়া। 'লিংকনকে বন্দী করা হয়েছে, এ-খবর শুনে স্ট্যানটনের কি প্রতিক্রিয়া হয়?'

'লিংকনের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, কিডন্যাপের খবর প্রথমে স্ট্যানটনই পান। লিংকনের বডিগার্ড যারা বেঁচে গিয়েছিল তারাই এসে খবরটা দেয় তাঁকে। প্রেসিডেন্টকে দুশমনরা বন্দী করেছে, এখবর প্রকাশ হয়ে পড়লে দেশের মানুষ খেপে যাবে, এটা তিনি উপলব্ধি করলেন। খবরটা গোপন করে যান তিনি, দ্রুত একটা কাভার স্টোরিও তৈরি করে ফেলেন। এমনকি মেরি টড লিংকনকে এ-কথাও বলেছিলেন যে তাঁর স্বামী গোপন একটা মিশনে জেনারেল গ্র্যান্টের

হেডকোয়ার্টারে গেছেন, কয়েক দিন পর ফিরবেন।'

'বিশ্বাস করা কঠিন যে খবরটা ফাঁস হয়নি,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'ওয়াশিংটনে সবাই স্ট্যানটনকে ভয় পেত, তিনি যদি কাউকে মুখ বন্ধ রাখার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেন, মুখ খোলার কোন উপায় ছিল না কারও।'

'কিন্তু ডেভিস আত্মসমর্পণের শর্ত জানালেন, তখনও ব্যাপারটা জানাজানি হলো না?'

'ডেভিসের কুরিয়ার সাদা পতাকা নিয়ে ব্যাটল লাইন পেরুল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্ট্যানটনের কাছে নিয়ে আসা হয়। কি ঘটছে সে সম্পর্কে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট জনসন বা সেক্রেটারি অভ স্টেট উইলিয়াম হেনরি সিয়ার্ড-এর কোন ধারণাই ছিল না। প্রেসিডেণ্ট ডেভিসের প্রস্তাব গোপনে প্রত্যাখ্যান করেন স্ট্যানটন, বলেন কনফেডারেসী লিংকনকে জেমস নদীতে ডুবিয়ে মারলে সবারই উপকার করবে।

'স্ট্যানটনের জবাব শুনে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন ডেভিস। অগত্যা বাধ্য হয়ে ট্রেজারির সোনার সঙ্গে টেক্সাসে লিংকনকে তোলেন তিনি। তাঁর আশা ছিল ইউনিয়ন নেভিকে ফাঁকি দিয়ে টেক্সাস বেরিয়ে যেতে পারবে। তিনি ভেবেছিলেন ভবিষ্যতে দর কষাকষি করার জন্যে লিংকনকে তাঁর দরকার হবে। কিন্তু ঘটনা সেভাবে ঘটেনি।'

'যুদ্ধের পর ডেভিস যখন বন্দী হলেন?'

'ইউনিয়ন নেতারা খেপে যাবে, এই ভয়ে লিংকন সম্পর্কে ভুলেও মুখ খোলেননি ডেভিস। দু'বছর কারাবন্দী ছিলেন তিনি।'

'হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটা স্ট্যানটন কিভাবে সাজান?' মুরল্যাণ্ড জানতে চাইল।

'এরচেয়ে অদ্ভুত ঘটনা আমেরিকান ইতিহাসে তুমি পাবে না,' জবাব দিল মরটন। 'পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে জন উইলকিস বুথকে ভাড়া করেন স্ট্যানটন। বুথ এমন এক অভিনেতাকে চিনত, যে লিংকনের মত দেখতে। নিজের গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে জেনারেল গ্র্যাণ্টকে সব খুলে বলেন স্ট্যানটন, দু'জন মিলে ঘোষণা দেন যে সেদিন বিকেলে লিংকনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিল, এবং ফোর্ড'স থিয়েটারে যাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন গ্র্যাণ্ট। মেরি টড লিংকনকে খুব ব্যস্ততা দেখিয়ে বাড়ি থেকে বের করে আনে স্ট্যানটনের এজেন্টরা, ফলে তিনি যে স্বামীর মত দেখতে অপর এক লোকের সঙ্গে ফোর্ড'স থিয়েটারে যাচ্ছেন তা বুঝতে পারেননি।

'থিয়েটারে পৌঁছে উপস্থিত দর্শকদের হাততালির উত্তরে হাসতে শুরু করে অভিনেতা, দর্শকরা প্রেসিডেনশিয়াল বক্স থেকে এত দূরে ছিল যে বোগাস প্রেসিডেণ্টকে চিনতে পারেনি। বুথ তার অভিনয় নিখুঁতভাবে সারে, স্টেজে লাফিয়ে পড়ার আগে অভিনেতাটির মাথার পিছনে গুলি করে। এরপর বেচারার লাশ রাস্তায় বের করে আনা হয়, মুখে রুমাল চাপা দিয়ে।'

'কিন্তু ডেথবেডে লোকজন ছিল,' প্রতিবাদ করল রানা। 'আর্মির ডাক্তার, কেবিনেট সদস্য, লিংকনের এইড।'

'ডাক্তাররা ছিল স্ট্যানটনের বন্ধু ও এজেন্ট,' বলল মরটন। 'বাকি সবাইকে কিভাবে ফাঁকি দেয়া হয় তা হয়তো কোনদিনই জানা যাবে না। স্ট্যানটন কিছু বলে যাননি।'

'তারপর স্ট্যানটন বুথকেও খুন করেন, সে যাতে মুখ খুলতে না পারে?'

মাথা নাড়ল মরটন। 'বুথের জায়গায় আরেক লোক মারা যায়। পোস্ট মর্টেম ও সনাক্তকরণ ছিল ভুয়া। বুথ পালিয়ে যায়, বেঁচেও ছিল কয়েক বছর। পরে সে আত্মহত্যা করে– ওকলাহোমায়, উনিশশো তিন সালে।'

'কোথায় যেন শুনেছি আমি যে বুথের ডায়েরী স্ট্যানটন পুড়িয়ে ফেলেন,' বলল রানা।

'রকিং চেয়ারের ওই মমি,' ফিসফিস করে বলল মুরল্যাণ্ড, 'সত্যি আব্রাহাম লিংকন?'

'আমার অন্তত কোন সন্দেহ নেই,' জবাব দিল মরটন। 'অ্যানাটমিক এগজামিনেশন করা হলে তাঁর পরিচয় নিঃসন্দেহে জানা যাবে।'

'এর তাৎপর্য কি বুঝতে পারছ তো, মরটন?' ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি বলো।'

'আমরা যুক্তরাষ্ট্রের অতীত বদলে দিতে যাচ্ছি,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'এখানে কি আবিষ্কার করেছি তা জানাজানি হয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে।'

মরটনের চোখে আতঙ্ক, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'কি বলছ নিজেও জানো না। মার্কিন সংস্কৃতিতে আব্রাহাম লিংকন একজন দেবতা। গীতিকাব্য, ইতিহাস, গল্প-কবিতা আর উপন্যাস তাঁকে মহান পুরুষ হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তাঁর হত্যাকাণ্ড তাঁকে শহীদের মর্যাদা এনে দিয়েছে। ব্যাপারটা জাল ছিল, ভুয়া ছিল, এ-কথা এখন বলা হলে তাঁর সেই মর্যাদা ভেঙে খান খান হয়ে যাবে।'

রানাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে, তবে চোখ দুটো অসম্ভব উজ্জ্বল। 'লিংকনের সততা ছিল প্রবাদতুল্য,' বলল ও। 'যে দুঃখজনক পরিস্থিতিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এ তাঁর পাওনা ছিল না। তাঁর দেহটা অন্তত সসম্মানে সমাধিস্থ করা দরকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চিরকাল তিনি সত্য প্রকাশ করার পক্ষে ছিলেন।'

'আমি তোমার দলে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'পর্দা তোলার সময় আমি তোমার পাশে থাকার প্রস্তাব দিচ্ছি।'

'গোটা দুনিয়ায় একটা নেগেটিভ আলোড়ন সৃষ্টি হবে,' যেন প্রবল আতঙ্কে নিজের গলাটা দু'হাতে চেপে ধরল মরটন। 'গুড গড, রানা, ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না? এ এমন একটা বিষয়, চিরকাল গোপন থাকাই সবদিক থেকে ভাল। আমেরিকানদের কোনভাবেই জানতে দেয়া চলে না।'

'আমরা তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না,' বলল রানা।

'তোমরা তাহলে প্রকাশ করবেই!' হতভম্ব দেখাল মরটনকে। 'সত্য প্রকাশের

নামে একটা বিশৃংখলা ডেকে আনবে!'

'সরি, দোস্ত।'

দু'হাতে মুখ ঢেকে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল মরটন। 'ঠিক আছে, গৃহযুদ্ধের শেষ পরিচ্ছেদটা নতুন করে লিখব আমরা, তারপর সবাই একলাইনে দাঁড়াব ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে।'

খবরটা শুনে গোটা বিশ্ব যেন ইলেকট্রিক শক খেলো। কয়েকশো কোটি মানুষ টিভির পর্দায় দেখল প্লেন থেকে ওয়াশিংটনে নামানো হচ্ছে আব্রাহাম লিংকনের রাষ্ট্রীয় পতাকায় মোড়া কফিন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা গেটিসবার্গ অ্যাড্রেস মুখস্থ ও আবৃত্তি করল, যেমন তাদের পিতামহরা করেছিলেন।

রাজধানীতে সমস্ত উৎসব ও অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। জীবিত পাঁচজন প্রেসিডেন্ট ক্যাপিটল হলে উপস্থিত হয়ে তাঁদের পূর্বসুরিকে যথাযোগ্য সম্মান জানালেন। বক্তৃতা দেয়ার কোন বিরাম থাকল না, রাজনীতিকরা একের পর এক উদ্ধৃতি দিচ্ছেন লিংকনের ভাষণ থেকে।

ষোলোতম প্রেসিডেন্টকে স্প্রিঙফিল্ডের সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হবে না। হোয়াইট হাউসের নির্দেশে তাঁর স্মৃতিস্তম্ভের মেঝেতে একটা কবর খোঁড়া হলো, তাঁর বিখ্যাত সাদা মার্বেল পাথরের স্ট্যাচুর ঠিক পাশেই। এই প্রথম ক্ষমতাসীন বা বিরোধী দলের কেউ কোন প্রতিবাদ করল না।

সরকারী ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে, টিভিতে লাশ দাফনের অনুষ্ঠান সরাসরি প্রচার করা হলো। কোটি কোটি মানুষ এত বছর পর তাদের প্রিয় প্রেসিডেন্টকে নিজের চোখে দেখতে পেল, হোক তা মমিফায়েড লাশ। আমেরিকানরা ভোলেনি, কোনদিন ভুলবে না, আব্রাহাম লিংকন ইতিহাসের কঠিনতম সময়ে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

কংগ্রেস সদস্যরা একটা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন, যে প্রস্তাবে বলা হয়েছে মালি থেকে তুলে ওয়াশিংটনে আনা হবে টেক্সাসকে, রাখা হবে ওয়াশিংটন মল-এ, দেশ-বিদেশের লোক যাতে সারা বছর ধরে দেখতে পায়। টেক্সাসের ক্রুদের কবর দেয়া হলো রিচমণ্ডের কনফেডারেট সমাধিক্ষেত্রে।

ইতিমধ্যে কিটি ম্যানক আর তাঁর প্লেনও অস্ট্রেলিয়ায় পৌচেছে। এত বছর পর তিনিও তার দেশবাসীর উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছেন। তাঁকে কবর দেয়া হলো ক্যানবেরার মিলিটারি মিউজিয়ামে। আর প্লেনটাকে রাখা হলো, জোড়া লাগাবার পর, স্যার চার্লস কিংসফোর্ড-স্মিথ-এর বিখ্যাত লং-ডিসট্যান্স এয়ারক্রাফট সাউদার্ন ক্রস-এর পাশে।

অল্প কয়েকজন ফটোগ্রাফার আর মাত্র দু'জন রিপোর্টারের উপস্থিতিতে বিশেষ অভ্যর্থনা জানানো হলো জাতিসংঘ মহাসচিব ও নুমার ডিরেক্টরকে, যদিও নিউজ মিডিয়ায় সে-খবর এমনভাবে ছাপা হলো যে খুব কম লোকেরই তা চোখে পড়ল। ওঁদেরকে দেয়া মানপত্রে বলা হলো, তাঁরা সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়াতেই রেড টাইড সারা দুনিয়ার জন্যে বিভীষিকা হয়ে ওঠেনি। এখানে একটা কথা উল্লেখ না

করলেই নয়, দু'জনেই তাঁরা ভাষণ দিতে উঠে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন মহাসচিবের পার্সোনাল সেক্রেটারি লায়লা লাজুলির, বললেন লাজুলি উদ্যোগ নিয়ে মহাসচিবকে সতর্ক না করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনেক দেরি হয়ে যেত। বলাই বাহুল্য, অনুষ্ঠানে লাজুলি উপস্থিত ছিল। ভাষণের পর প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ মহাসচিব ও নুমার ডিরেক্টরকে মেডেল পরিয়ে দিলেন। পরে নিউ ইয়র্কে ফিরে গেলেন মহাসচিব, যোগ দিলেন জাতিসংঘের জরুরী একটা মীটিঙে। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনও চুপচাপ ফিরে গেলেন নুমা হেডকোয়ার্টারে, ফিরেই নতুন একটা আণ্ডারসী প্রজেক্টের প্ল্যান নিয়ে নিজের অফিসে বসলেন, যেন প্রতিটি দিনই তাঁর কাছে সমান।

যদিও পাবেন না, তবু ড. অজিত রায় আর জর্জ রেডক্লিফকে যুগ্মভাবে নোবেল প্রাইজের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হলো। অর্থহীন ব্যাপারটাকে গ্রাহ্য না করে দু'জনেই তাঁরা দক্ষিণ আটলান্টিকে ফিরে এলেন, সী লাইফের ওপর রেড টাইডের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করবেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন ড.সুনারিল।

নুমা থেকে মোটা বোনাস পেল ল্যারি কিং, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত দশদিনের ছুটি। সে তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে চলে গেল ডিজনি ওয়ার্ল্ডে।

জেনারেল ইথার প্রশংসাসূচক মেডেল পেলেন, খ্যাতির শীর্ষে থাকার সময়ই ইউএন ট্যাকটিকাল টীম থেকে অবসর নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ভদ্রলোক।

কর্নেল মিরাক পদোন্নতি পেয়ে জেনারেল হলেন, জাতিসংঘের পীস-কিপিং পদকে ভূষিত করা হলো তাঁকে, জেনারেল ইথারের খালি পদটা পেয়ে গেলেন।

স্ট্যানটনের ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটনের কৃতিত্বস্বরূপ বিউ মরটনকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে এত বেশি পদক দেয়া হলো যে তার লাইব্রেরীর একদিকের দেয়ালে সবগুলোর জায়গা হবে কিনা সন্দেহ। সেই সঙ্গে বিভিন্ন হিস্টোরিক অর্গানাইজেশন থেকে গবেষণামূলক অনেক কাজের প্রস্তাবও তাকে দেয়া হলো।

স্যাভয় গাসকিলের হাউজবোটে যে সুন্দরী মেয়েটাকে পিয়ানো বাজাতে দেখা গিয়েছিল তাকে খুঁজে বের করল মুরল্যাণ্ড। ভাগ্যই বলতে হবে যে মেয়েটার বিয়ে হয়নি, এবং কি এক অজ্ঞাত কারণে, অন্তত রানার তাই মনে হলো, মুরল্যাণ্ডকে ভারি পছন্দ হয়েছে তার; মুরল্যাণ্ডের প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিয়ে ডাইভিং ট্রিপে চলে গেল লোহিত সাগরে।

আর রানা ও সিলভিয়া?

ক্লিনিক থেকে গত কাল ছাড়া পেয়েছে সিলভিয়া, আজ বাপের সঙ্গে গলফ কোর্সে এসেছে সময় কাটাতে। ক্যালিফোর্নিয়া, মণ্টেরি সী বীচের ধারেই ওটা, বাপকে খেলায় রেখে একা সৈকতে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছে সে। তার শরীর এখন পুরোপুরি সুস্থ, কিন্তু রানার কোন খবর না পাওয়ায় বিষণ্ন হয়ে আছে মনটা। এক হপ্তা আগে অ্যাডমিরাল ওকে ক্লিনিকে ফোন করেছিলেন, জানিয়েছেন যে রানা

এখনও সাহারা থেকে ফেরেনি। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার শুনে আকাশে তাকাল সিলভিয়া, দেখল মাথার ওপর দিয়ে একটা সী গাল উড়ে যাচ্ছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করল সেটাকে। এক সময় দূরে মিলিয়ে গেল পাখিটা। তারপর সিলভিয়া টের পেল সে তাকিয়ে আছে তার খানিকটা ডাইনে, একটা বেঞ্চের পাশে দাঁড়ানো মাসুদ রানার দিকে।

'তুমি, আমি আর সৈকত,' নরম সুরে বলল রানা।

চোখে অঢেল ভালবাসা, একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল সিলভিয়া। তারপর তার পাশে চলে এল রানা, ওর বাড়ানো হাতের ভেতর সেঁধিয়ে গেল সে। 'রানা, ওহ্ রানা! তুমি আসবে কিনা সন্দেহ ছিল আমার। ভেবেছিলাম সম্পর্কটা বোধহয় শেষ হয়ে গেছে।'

সিলভিয়ার কপালে চুমো খেলো রানা। 'উচিত ছিল যোগাযোগ করা,' বলল। 'কিন্তু দু'দিন আগে পর্যন্ত এমন সব ঝামেলার মধ্যে ছিলাম যে...'

'তোমাকে ক্ষমা করা হলো,' বলল সিলভিয়া। 'কিন্তু জানলে কিভাবে আমি এখানে?'

'তোমার জননী। দারুণ বিবেচক মহিলা। তোমার মন খারাপের কারণটা আমাকে দেখেই সম্ভবত আন্দাজ করে নিয়েছেন, পাঠিয়ে দিলেন এখানে। এসে দেখি কাতর নয়নে সাগরের ঢেউ গুণছ।'

'তুমি একটা পাগল,' বলল সিলভিয়া, দু'হাতে জড়িয়ে রাখল রানাকে।

'ঢেউ গোণার সময় পেলে মন্দ হত না,' বলল রানা। 'কিন্তু এখুনি রওনা হতে হবে যে।'

'এত ব্যস্ততা কিসের? কোথায় যাচ্ছ তুমি?' ম্লান হয়ে গেল সিলভিয়ার চেহারা।

'তুমিও যাচ্ছ।'

'কোথায়?'

'সেই যে, কথা ছিল, ডিনার...মনে নেই?'

হেসে উঠল সিলভিয়া। হাত ধরাধরি করে রওনা হয়ে গেল ওরা।

***